গদ্য সংগ্রহ

শঙ্খ ঘোষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফার্স্ট পার্সন

১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফার্স্ট পার্সন
১

ঋতুপর্ণ ঘোষ

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা
নীলা বন্দ্যোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিবেদন

দে'জ পাবলিশিং-এর সঙ্গে ঋতুপর্ণ ঘোষের সম্পর্ক অনেকদিনের। বই ক্রেতা হিসেবে দে'জ-এর কাউন্টারে দাঁড়িয়ে থাকতে ঋতুদাকে প্রথম দেখি। তার পর সম্পর্ক ধীরে ধীরে গভীর হল। তখন আমার কাকু (সুভাষচন্দ্র দে)-কে বলে সোজা চলে আসতেন দোকানের ভিতর। নিজেই চেয়ারে উঠে বা কাঠের সিঁড়ি বইয়ের তাকে লাগিয়ে নিজের পছন্দ মতো বই বের করে এক জায়গায় জড়ো করে রাখতেন। সেই থেকে কবে যে তিনি আমার আপনজন ঋতুদা হয়ে গিয়েছিলেন জানি না। সেই আপনজন ঋতুদার সঙ্গে বই নিয়ে, সিনেমা নিয়ে কত কথাই হয়েছে। সম্পর্কটা এমনই হয়ে গিয়েছিল যে সেখানে আবদার আর অধিকার দুটোই পাশাপাশি ছিল। ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে শুরু করে ছিলেন ফার্স্ট পার্সন লিখতে। ২০১০ সাল থেকে তাঁকে বলতে শুরু করেছিলাম, এবার এটা বই করে বের করি। কিছুতেই গুছিয়ে তুলতে পারছিলাম না। নানা কাজে ব্যস্ত ঋতুদাও সময় দিতে পারছিলেন না।

একদিন ঋতুদা ফোন করে বললেন, আমার এই ফার্স্ট পার্সন-এর লেখাগুলো নীলা বিষয়ভিত্তিক ভাবে সাজিয়ে দেবে। নীলা বন্দ্যোপাধ্যায় তখনই এই বইটির সম্পাদনার দায়িত্ব নিলেন। যে আন্তরিকতার সঙ্গে এই কাজটি তিনি করেছেন তা অসাধারণ। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

হঠাৎ চলে গেলেন ঋতুদা। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় যেভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন তা অকল্পনীয়। ধন্যবাদ তাঁকেও। যার ওপর সবচেয়ে বেশি অত্যাচার করেছি এক্ষুনি এটা দাও ওটা দাও করে, সে ভাস্কর লেট। স্মিত হাসি ধরে রেখে আমার সব অত্যাচার সে মুখ বুজে সহ্য করেছে। ধন্যবাদ ভাস্কর। ধন্যবাদ জানাই সংবাদ প্রতিদিনের টিম রোববার-কে। ধন্যবাদ জানাই সংবাদ প্রতিদিন সম্পাদক শ্রী সৃঞ্জয় বোস-কে। নানা মুহূর্তের ছবি দিয়ে সাহায্য করেছেন ঋতুদার ভাই ইন্দ্রনীল ঘোষ, দীপান্বিতা ঘোষ মুখোপাধ্যায়, তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শান্তনু দে।

শুভঙ্কর দে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ কথা কে বলবে

নিজেকে 'লেখক' বলতে প্রবল অনীহা বরাবরই। যখনই বলতাম, এইবার 'ফার্স্ট পার্সন'গুলো জড়ো করে একটা বই করো, উৎসাহের আঁচে জল ঢেলে তাঁর নিরাসক্ত জবাব ছিল, 'আমি আবার লেখক না কি!' বই বার করা তো লেখকদের কাজ। ঋতুপর্ণ ঘোষ সত্যিই হয়তো লেখক ছিলেন না, বরং তিনি জীবনের এক অনর্গল কথক। নিজের দৈনন্দিন যাপনকে ঘিরে বেড়ে-ওঠা খুঁটিনাটি, খড়কুটো, অকিঞ্চিৎ টুকরো বড় পরম মমতায় তিনি জড়ো করে গিয়েছেন তাঁর 'ফার্স্ট পার্সন'-এ। গেরস্থালির মধ্যে দিয়েও যে সারা পৃথিবীকে দেখতে পাওয়া যায়—এমন আত্ম-অনুসন্ধানী দৃষ্টির অব্যর্থ ছায়াপাত, তাঁর প্রতিটি লেখায়। হস্তাক্ষরের মতোই বড় বর্ণাঢ্য, অভিজাত, ঋতুপর্ণর লেখনী, ভাষা ব্যবহারে সাবেকি গ্র্যান্ডপিয়ানোর মাধুর্য, প্রতিটি বিচ্ছিন্ন লেখার শেষে চিত্রনাট্যের অনিবার্য আমোঘ মোচড়। 'রোববার' পত্রিকা সম্পাদনার আগে নামজাদা ফিল্মি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন প্রবল মুনশিয়ানায়, সেখানকার সম্পাদকীয়তে তিনি এক স্বকীয় চিত্র পরিচালক, কিন্তু 'ফার্স্ট পার্সন'-এ ঋতুপর্ণ নিজেকে মুক্তি দিয়েছেন আপন আকাশে। ঋতুপর্ণ হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন, প্রথা ভেঙে বেরিয়েছেন নিজস্বনির্জন ভঙ্গিমায়—"এই 'ফার্স্ট পার্সন'-এর পাতাটা আমার সত্যি কথা লেখার পাতা, আমার জীবনধারণের সমস্ত সত্যি বিশ্বাসকে মেলে ধরার পাতা। তাই আজ 'একা' মানুষদের অভিজ্ঞতা দিয়ে একটা সংখ্যা গাঁথতে গিয়ে যদি নিজের একাকী জীবনের প্রায় স্বতঃসিদ্ধ কারণটাকেই সযত্নে এড়িয়ে যাই তা হলে সে তো সত্যগোপন হল। আমার কাছে তা মিথ্যাচারণেরই নামান্তর।" এই বাক্যবন্ধগুলোর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে ফার্স্ট পার্সন-এর আত্মা, যা মুহূর্তের জন্য ভ্রষ্ট হয়নি তাঁর সত্যবদ্ধ অঙ্গীকার থেকে।

ঋতুপর্ণর সংসার-জীবন ঘিরে আমবাঙালির কৌতূহল ছিল অনিঃশেষ, সকলেই কোনও-না-কোনও অছিলায় তাঁর খড়খড়িতে চোখ রাখতে চেয়েছেন অবরেসবরে —এই লেখাসকল কৌতূহলী, অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সবিশেষ খোরাক জোগাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশ্চিত। তাঁর বাহুল্যঅর্জিত জীবন, নিঃসঙ্গ জীবনচর্যা, অনন্তের সাধনা বারবার প্রকাশ পেয়েছে সাপ্তাহিক কলমকারিতে, আমাদের পরিচিত গণ্ডির বাইরে অনমনীয় এক দৃপ্ত মানুষের মুখ সর্বদা মাথা উঁচু করে জাগ্রত, সকল সাহসী অক্ষরবৃত্তে।

মাতৃবিয়োগ ঋতুপর্ণর জীবনে যোগ করেছিল এক চরম নির্লিপ্তি ও একান্ত নিঃসঙ্গতা, তাঁর লেখায় কারণে-অকারণে উঠে আসত মায়ের প্রসঙ্গ, যে কোনও জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ইস্যুর চুলচেরা বিশ্লেষণেও মা'কে অন্যতম এক চরিত্র হিসেবে হাজির করিয়েছেন তিনি, যেন মায়ের কাছেই তিনি নতজানু আজীবন। যখন ঋতুপর্ণ লেখেন—'মাইকেল জ্যাকসন-এর শেষকৃত্য হয়ে গেল। ৩৭৭ ধারা নিয়ে মিডিয়ার মাতামাতি অনেক স্তিমিত হয়ে এসেছে। তাঁরা এখন অন্য জিনিস নিয়ে ব্যস্ত। তাঁদের ক্যামেরায় তাই হয়তো ধরাই পড়ল না আরেকজন প্রৌঢ়ার ছবি—আমার মা। কিন্তু, আমি মনে মনে জানি, অন্তরীক্ষ বলে যদি কোনও নিঃসীমা পথ থেকে থাকে, সেখানে ক্লিষ্ট পায়ে অশক্ত শরীরে দুর্বল হাতে 'প্রাউড মাদার' প্ল্যাকার্ড নিয়ে হেঁটে চলেছে আমার মা। আমার সব নিভৃত নিঃসঙ্গ বিজয়মিছিলের সঙ্গী।' মা তাঁর একান্ত আশ্রয়, যেন আদরের সৌরনীলের ছায়া সেই আঁচলে চাবির গোছার মতোই পোক্ত ও সদা আশ্বস্ত।

এই নিভৃত, নিঃসঙ্গ বিজয়মিছিলের একনিষ্ঠ ধারাবিবরণী লিপিবদ্ধ রয়েছে 'ফার্স্ট পার্সন'-এর ছত্রে-ছত্রে। কোথাও হয়তো-বা উঁকি দিচ্ছে অলিখিত আত্মজীবনীর খসড়া, কোথাও বিষাদের অভিমানী মুখ। হরেক বেড়াতে যাওয়ার কাহিনি লিখেছেন দুরন্ত স্টাইলে, রয়েছে নির্মীয়মান চলচ্চিত্রের অন্দরের খবর, তুমুল ব্যস্ততায় গা-বাঁচানো কিছু প্রথম পুরুষও হয়তো মিশে রয়েছে এই ব্যক্তিগত ধারাপাতে, প্রাথমিকভাবে খোদ সম্পাদকেরও ইচ্ছে ছিল এর মধ্যে থেকে ঝেড়েবেছে একটি পুস্তক তৈরি হোক, কিন্তু সে ইচ্ছের মর্যাদা না-দিয়ে 'ফার্স্ট পার্সন' সমগ্র প্রকাশ করা হল, কারণ এমন প্রতিভাপুরুষের কোনও কিছুই বর্জনীয় নয়, যাঁর শব্দে-শব্দে মিশে আছে শেষ পাঁচ বছরের ধূসর দিনলিপি।

এমন অনেক সময় গিয়েছে, যখন শুটিংয়ের তুমুল হাঙ্গামে ঋতুপর্ণ জর্জরিত, ফোন করে জানিয়েছেন, 'এডিট' লেখা অসম্ভব, আমিও স্বার্থপর নেইআঁকড়া বাচ্চার মতো আবদার করে গিয়েছি বারংবার—শেষমেশ 'রোববার' জিতেছে। ঋতুপর্ণ 'ফার্স্ট পার্সন' লিখে ফেলেছেন। একটা অদ্ভুত স্বভাব ছিল, লেখা শেষ হওয়ামাত্র ফোন করতেন শোনানোর অভিপ্রায়ে। স্মরণীয় বহু সম্পাদকীয় প্রথম শ্রোতা আমি বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রোববার'-এর সতীর্থ বন্ধুরা—এই সুরেলা পাঠটুকু কানে বাজবে সর্বদা, এই বইয়ের পাতা ওল্টালে।

জীবনের শেষ ফার্স্ট-পার্সন মাদুর নিয়ে লেখা। সেখানে মাদুরের কাছে নম্রতা শেখার কথা লিখেছিলেন ঋতুপর্ণ। এই নম্রতার শিক্ষা, মাধুর্যের অনুশীলন তাঁর সারা জীবনের সাধনা। নিজের শিল্পে বারবার করে এই মধুরতার স্রোত তিনি বইয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর চালচিত্র ধারণ করেছেন আমৃত্যু, ঋতুপর্ণ সে অমৃতের শেষ খুঁজে বেড়িয়েছেন নগরীর দ্বারে-দ্বারে।

'রোববার' পত্রিকায় ঋতুপর্ণ যদি কোনও বিশেষ ধারার প্রবর্তন করে থাকেন, তবে তা ব্যক্তিগত-কথন। প্রথমপুরুষে কত নিজস্ব গল্প, স্মৃতি উসকে দিয়ে যেত তামাম পাঠকের। সম্পাদক নিজে ছিলেন এর মূল প্রবক্তা। শুধুই মনন নয়, মন মিশে থাকা চাই রচনায়। লেখক নিজে বিশ্বাস করতেন এমন ধারণায়। ফলে ভাষার শিষ্টতা পেরিয়ে, বিষয়ের নিগড় ভেঙে, আবেগ এবং আবেগ হয়ে উঠেছে এই লেখাগুলোর প্রকৃত হৃদয়।

হৃদয়খানির সেই অকপট উন্মোচন 'ফার্স্ট পার্সন'। বহুরূপী এক চলমান আপোসহীন জীবনের চলচ্চিত্র বইটির পাতায়-পাতায়। কোনও কিছু মিথ্যে লেখেননি তিনি। কোথাও কোনও কান্না গোপন করেননি একবিন্দু। তাঁর মৃত্যু হয়তো-বা জন্ম দিল আজ, এক মৃত্যুহীন লেখকের।

পাঠক, আপনার কান্না অবসরের সঙ্গী হোক এই লোনাজলের একলা অমনিবাস।

অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়

পুনশ্চ : ঋতুপর্ণর ভ্রাতৃপ্রতিম দুই ব্যক্তিত্ব 'ফার্স্ট পার্সন'-এর দু'দিকে দাঁড়িয়ে। সংবাদ প্রতিদিন সম্পাদক সৃঞ্জয় বোসের সহযোগিতা ছাড়া পূর্ণাঙ্গ বইটি প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। দে'জ পাবলিশিং-এর অপু এমন আন্তরিকভাবে ঝাঁপ না-দিলে, বইটি হত না। আর আপনারা, যাঁদের ঐকান্তিক আগ্রহ তাঁকে অপরিসীম শক্তি যুগিয়েছিল, সিংহাসন দিয়েছিল এক ধ্রুপদী কথাকারের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পাদকের কথা

২০০৬-এর ২৪ ডিসেম্বর থেকে ২০১৩-র দোসরা জুন, প্রতি রবিবার, সংবাদ প্রতিদিনের রোববার পত্রিকার প্রথম লেখাটি ছিল 'ফার্স্ট-পার্সন'। কোনো-কোনো রবিবার তলায় নাম সই করা থাকত, ঋতুপর্ণ ঘোষ। বিষয় নির্বাচন, তথ্য, তত্ত্ব বিশ্লেষণ সবই ঋতুপর্ণর নিজস্ব। বেশির ভাগ লেখাই ছুঁয়ে আছে দেশকালের কোনো আলোড়ন বা ঋতুপর্ণের আত্মবৃত্তের কোনো কম্পন-রেখাকে। এ প্রসঙ্গে ঋতুপর্ণ নিজেই তাঁর লেখা বাহান্নতম ফার্স্ট পার্সনে বলেছেন 'ফার্স্ট পার্সন-এ অধিকাংশ সময়ই যে লেখাগুলি আমি লিখেছি তার সঙ্গে সে সংখ্যার রোববারের বিষয়গত বা আঙ্গিকগত কোনো সম্পর্কই নেই, লেখাগুলি একান্তই আমার নিজের কথা, আমার আত্মালাপ।' বিস্মিত, বিপন্ন, প্রতিবাদী, আনন্দিত, বাউন্ডুলে, গৃহস্থ এবং আন্তরিক ঋতুপর্ণের ব্যক্তিগত ভালো-লাগা মন্দ-লাগা দিয়ে রচিত সম্পাদকীয়, কিংবা সাহিত্যই হল ফার্স্ট পার্সন।

ফার্স্ট পার্সন প্রথম যখন ছেপে বেরোনোর কথা হয়, কথা ছিল আনুপূর্বিক ছেপে দেওয়া হবে। ঋতুপর্ণই একদিন বললেন, ওঁর ইচ্ছে ভ্রমণ সংক্রান্ত লেখাগুলির যেন একটি আলাদা ভাগ হয়। তাঁর নির্দেশমত ভ্রমণ সংক্রান্ত লেখাগুলি আলাদা করতে গিয়ে, খানিকটা অলস কৌতূহলেই লেখাগুলিকে আমি আরও চারটি ভাগে ভাগ করি। তা দেখে উৎসাহিত ঋতুপর্ণ বললেন, ভালো করে খুঁজে দেখ আরও কয়েকটি ভাগ পাবি। এইভাবেই বারোটি শিরোনামে বিভক্ত হয়ে লেখাগুলি এখন প্রকাশিত হচ্ছে। বইয়ের আয়তনের স্ফীতি দেখে সন্ত্রস্ত অপুদা (শুভঙ্কর দে) অগত্যা বইটিকে দুটি খণ্ডে ভাগ করে নিয়েছেন। দুটি খণ্ডে যে শিরোনামগুলি আছে তা অবশ্যই দেওয়া হয়েছে যথাসম্ভব বিষয়ভিত্তিক। যেমন তাঁর ভ্রমণ সংক্রান্ত লেখাগুলি নিয়ে পথিক, সিনেমা সম্বন্ধীয় লেখা নিয়ে ছায়াছবি, দেশকালের কোনো আলোড়ন নিয়ে এলোমেলো দেশ-কাল অথবা এমন কোনো কিছু যা ঋতুপর্ণকে ব্যথিত করেছে, বিস্মিত করেছে কিন্তু লেখার শেষ অব্দি যা মীমাংসিত হয়নি তেমন লেখাগুলি নিয়ে বিস্মিত অন্বেষণ ইত্যাদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে মোট বারোটি ভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লেখাগুলির যে সর্বাঙ্গীণ আত্মিক ঐক্য আছে এমন ভাবাটা ভুল। অনেক ক্ষেত্রেই পাঠক সন্দিহান বা জিজ্ঞাসু হতে পারেন। আসলে এরকম নিপুণ নির্বাচন করতে গেলে এমনও কোনো কোনো ভাগ তৈরি হত যেখানে হয়ত পড়ত একটি বা দুটি মাত্র লেখা। এমনও কিছু কিছু লেখা আছে যা পড়তে পড়তে হয়ত পাঠকের মনে হবে একভাগের লেখা অন্যভাগে যাবার উপযোগী। এক্ষত্রে বলবার কথা কেবল এই যে, ঋতুপর্ণের সমস্ত ব্যক্তিসত্তা এবং মনোবিক্ষণেই এমন একটা চঞ্চলতা, চলিষ্ণুতা এবং প্রসারণশীলতা ছিল যে অনেক সময়ই একটি নামের পরিসরে তা এঁটে উঠত না। তাঁর নিজের মাকে নিয়ে কোনো লেখায় হয়ত চলে এসেছে দেশ-কালের কথা। আবার দোলোৎসব নিয়ে কোনো লেখার শেষ হচ্ছে শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে তাঁর পরিকল্পিত ছবির চিত্রনাট্যে।

ঋতুপর্ণকে যাঁরা কাছ থেকে দেখেছেন অথবা আমাদের মত নিছকই আড্ডা দিয়েছেন তাঁর সাথে তাঁরা অনেকেই জানেন তিনি প্রায়শই মগ্ন হয়ে থাকতেন কোনো শোকে, সুখে বা সাধনায়। প্রায় সাত বছর ধরে লেখা তাঁর এই সম্পাদকীয়গুলি পড়লেই তাঁর সে সময়ের মনের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠে আমাদের কাছে। লেখাগুলি ভাগ করতে গিয়ে আমরা লক্ষ করি, পরপর কিছু লেখায় তিনি হয়ত মুখর সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের প্রতিবাদে, আবার কখনও ডুবে আছেন কবিতায় বা ব্যক্তিগত শোকে, স্মৃতিতে। লেখার তারিখ মিলিয়ে পড়লে অনেকেই হয়ত এক একটি লেখাকে মিলিয়ে নিতে পারবেন তাঁর সাথে আড্ডার এক একটি দিনের সাথে।

তবে তাঁর মনের চলন বা গড়ন যেমনই হোক না কেন, তাঁর মত স্বাদু এবং সচ্ছল গদ্যকার বাংলা ভাষায় খুব বেশি আসেননি এবং আমাদের বিশ্বাস মূলত সেটাই এই বইটির প্রধান সম্পদ।

আমার ওপর বইটি গুছিয়ে তোলার ভার দিয়েছিলেন ঋতুপর্ণ ঘোষ। বইটির শেষ অব্দি সবটা দেখে যেতে পারলেন না তিনি, এটি আমাদের মস্ত বড় অপ্রাপ্তি। কাজটি করতে গিয়ে দে'জ পাবলিশিং-এর অপুদার কাছে যখন যেমন সাহায্য চেয়েছি পেয়েছি, সে জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সুধাংশুশেখর দে এবং দে'জ পাবলিশিং-কে, সম্পাদকের গুরুদায়িত্বটি আমার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। অনুপমদা যথাসম্ভব বইটিকে নির্ভুল করতে সাহায্য করেছেন, ধন্যবাদ তাঁকেও। আর একজনের নাম না করলেই নয়, তিনি আমার ছোটোমামা কালীকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়। যখনই প্রয়োজন পড়েছে তাঁর সংগ্রহ থেকে তারিখ মিলিয়ে বের করে দিয়েছেন ফার্স্ট পার্সনের পাতাটি। যখনই কোনো সংশয় হয়েছে ছুটে গেছি বাবার কাছে। কিন্তু সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য তাঁকে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা কোনোটাই জানালাম না। কারণ তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক এসবের ঊর্ধ্বে। সবচেয়ে বেশি যাঁর কাছে কৃতজ্ঞ তিনি ঋতুপর্ণ ঘোষ। ধন্যবাদ ঋতুদা। আমাকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য, ভরসা করার জন্য। যেখানেই থাকো প্রথম পুরুষ হয়েই থেকো।

নীলা বন্দ্যোপাধ্যায়
৩১.০৮.২০১৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচি

এলোমেলো দেশ-কাল ১
বিস্মিত অন্বেষণ ৩৭
মনে এল ১১৩
অন্তরমহল ১৪৫
চরিতগাথা ২০৫
এলিজি ২৪৩

দ্বিতীয় খণ্ডে আছে

ছায়াছবি ২৭৩
কথা ও কবিতা ৪০৫
পথিক ৪৩৭
উৎসব ৫৭১
প্রসঙ্গ রোববার ৫৯৩
বিচিত্রিতা ৬১৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড় কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি আমরা। একটার পর একটা দিন নতুন করে তীব্র হতে তীব্রতর কশাঘাতের চিহ্ন রেখে বিদায় নিচ্ছে।

কে পথ দেখাবে? কে দেবে আলো? কে অভয় দিয়ে বলবে—পাশে আছি? সবাই এমন চুপ মেরে গেছে কেন? অগ্রজরা, যাঁরা আদর্শ হয়ে ছিলেন চোখের সামনে;যাঁদের বাক্য-কর্ম-যুক্তি চিরকাল ঈর্ষণীয়ভাবে অনুকরণযোগ্য ছিল, তাঁরা কোথায়? যাঁদের জীবনচর্যা শিখিয়েছে কী করে মাথা উঁচু করে বাঁচতে হয়, পাড়ি দিতে হয় নৃশংসতম মারের সাগর, তারা চুপ কেন?

বাবা-মাকে বেছে নেবার অধিকার আমাদের নেই। কিন্তু জীবনের পথে চেতনে অবচেতনে আমরা সবাই তো বেছে নিই কোনও না কোনও অভিভাবক। তাঁরা কোথায়? না কি, তাঁরা সব আছেন পাশেই— আমারই চিনতে ভুল হচ্ছে কেবল?

ঠিক যেন দ্যূতসভায় মৌনী নতমস্তক ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ। ধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম। ধর্ম মানে কী? বিশ্বাস, হৃদয়ের ইষ্টমন্ত্র, রাজরোষ, না সাবধানভাইভাল কৌশল?

মৃণালদা, সুনীলদা, শঙ্খদা, সৌমিত্রদা—তোমরা কি প্রবাসে? রীনাদি, গৌতমদা, জয়—তোমরা কথা বলছ না কেন? কোনও কিছুই যেন কোনও কিছুর সঙ্গে মিলছে না।

সিঙ্গুর নিয়ে যে বিতর্কটা শুরু হয়েছিল, আমি বিশ্বাস করি, তার গূঢ় এবং মূল প্রশ্নটি মানবসভ্যতার। কোনও রাজনৈতিক দলের নয়। 'কৃষিজমিতে শিল্প' বা 'ভূমিপুত্র সমস্যা' থেকে আমরা স্বচ্ছন্দে সরে এসেছি মমতা-বুদ্ধদেবের দ্বৈরথে। কেন?

আমরা কি বিস্মৃত হচ্ছি যে এই বিনোদিনী চাপান-উতোর আসলে বার-বার করে আড়াল করছে এই গ্রহের এই মুহূর্তের এক গভীরতম বিপর্যয়কে? তবু কেন প্রতিনিয়ত পা দিচ্ছি ঘটনা আর প্রতিঘটনার ফাঁদে?

মহাশ্বেতা দেবী আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধার মানুষ। তিনি যে ভাষায় কথা বলেন, লেখেন, প্রতিবাদ করেন আমিও যে আদতে সেই ভাষার বাতাবরণে বড় হয়েছি, কেবল এটুকু ভাবলেই বুক ভরে নিতে পারি গর্বের নিশ্বাস। তিনিও কেন এই আন্দোলনকে মমতা-মুক্ত করতে পারলেন না? একবার বললেন না—'না, কোনও ব্যক্তি নয়, সমস্যাটা এই। সেটাকে চেনো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেধা পাটেকর নিশ্চয়ই এই অন্ধকারের মধ্যে এক জ্যোতির্ময়ী আলোকবর্তিনী। নর্মদার সমস্ত স্রোতের শক্তি তাঁর ধমনীতে। বড় ব্যথা লাগে, যখন দেখি তিনিও আফজলের ফাঁসি রদ করার জন্য তার সাত বছরের শিশুপুত্রের টোপ দেন। আমিই যদি জানি, তবে মেধা কি জানেন না যে ক্যাপিটাল পানিশমেন্টে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানবিক প্রশ্ন? অনাথ শিশুর বৈজ্ঞাপনিক প্রয়োগ তার গুরুত্বকে বাড়ায় না, বরং অসম্মান করে।

কমোডিফিকেশন নিয়ে যাঁরা এত সোচ্চার, এত বিদ্রোহী—তাঁরা তো কই একবারও বললেন না যে আবেগের কমোডিফিকেশনও সমান বিভ্রান্তিকর, সামাজিক অনৃতচারণ?

পক্ষে হয়, বিপক্ষে হয়—দয়া করে কিছু বলুন। আমরা সেটাই শুনব। পশ্চিমবঙ্গের জ্যোতিষ্করা নির্বাক হয়ে থাকবেন না, মিনতি করি।

আমরা সাধারণ মানুষ। আবেগ আমাদের যথেষ্ট আছে। এবার আমরা যুক্তি চাই।

সৌরভের প্রত্যাবর্তন আমাদের বাড়ির উৎসব। আমরা ভোট দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন করিনি, বেছে নিয়েছি গৃহকর্তা।

বিনীত প্রার্থনা, আমাদের নিরাশ করবেন না।

২৪ ডিসেম্বর ২০০৬

AMARBOI.COM

আমরা, বাংলার মানুষ, অহিংস আন্দোলন বড় একটা দেখিনি। আমাদের নায়ক ক্ষুদিরাম বসু, বিনয়-বাদল-দীনেশ, চট্টগ্রামের মাস্টারদা। আমরা ছোট্টবেলা থেকে, কিচ্ছু না জেনে না বুঝে, গলা ফাটিয়ে বলে এসেছি—'না গান্ধী নয়। সুভাষচন্দ্র।' ভেবে দেখেছেন কখনও, কেন?

আপাত একটা কারণ অনুমান করতে পারি। সুভাষচন্দ্র বীর যোদ্ধা। তিনি সামরিক পোশাক পরেন। আর, গান্ধী বৃদ্ধ, অশক্ত— তাঁকে নায়কোচিত ভাবা মুশকিল।

অবলীলায় স্বীকার করতে পারি, আমি নিজেও বহুদিন তাই ভাবতাম। মনে হত মহাভারতের দ্রৌপদী আর গান্ধী যেন এক। কথায় কথায় প্রায়োপবেশন। 'এ আবার কী আহ্লাদেপনা। খাবি না, খাবি না—নিজে বোঝগে যা! আর লোকগুলোই বা কী? সাধতেই বা যায় কেন?'

পরে বুঝেছি, এই সত্যাগ্রহ অন্তরের শক্তি। প্রতিবাদের এক চূড়ান্ত প্রতিমা। যার সামনে গিয়ে সমস্ত অত্যাচার কুঁকড়ে, গুটিয়ে ফিরে আসে।

মেদিনীপুরের জুনপুট অঞ্চলে একটা গ্রাম আছে—নাম পিছাবনি। শুনেছি, আদিতে নাকি নাম ছিল কমলাপুর (বোধহয় ভুল বলছি না)। লবণ আইন অমান্যর সময় স্থানীয় মহিলারা মাটি আঁকড়ে বসে পড়েছিলেন সেখানে। পুলিশের লাঠির গুঁতোর মুখে একটাই কথা বলেছিলেন—পিছাব নি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(অর্থাৎ, পিছোব না)।

সেই সমবেত স্বর আজ সেই গ্রামের পরিচয়। তার ইতিহাস, তার পুরাণ।

যতদূর জানি, কম্যুনিজম বলে—শেষ অবধি নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করার জন্য মধ্যপথে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমাজ বা রাষ্ট্রশাসনের অধীন হতে হবে।

সত্যাগ্রহ বলে—অহিংসার পথে কোনওদিনই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে সমাজের শাসনের কাছে পদানত করবার প্রয়োজন নেই।

সত্যিই, প্রয়োজন নেই। মারের মুখে প্রশান্তি অনেক বড় পাল্টা মার। তার আর কোনও মার নেই।

সিঙ্গুর জমিরক্ষা কমিটির বহু মানুষ, বহু পর্যায়ে নিশ্চুপে নির্বিরোধে অনশন করে বহুদিন পরে আবার নতুন করে বুঝিয়ে দিলেন সেই অন্তরতম শক্তির বিস্তার। তাঁদের কোনও ছবি উঠল না। তাঁদের নাম আমরা জানলাম না। তাঁরা দিব্যি বুঝতে পারলেন যে এই মানচিত্রেরই অন্য কোথাও তাঁরা কখনও রাজনৈতিক ফায়দার হাতিয়ার, বা মিডিয়ার লোভনীয় স্টোরি— তবু কিছু বললেন না।

এক চিত্রসাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। সে বলল, 'কোনও সময় পাচ্ছি না, জানো। সকাল থেকে সিঙ্গুরে গিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে তো।' জিজ্ঞেস করলাম 'তোরা তো সিঙ্গুর নিয়ে কিছু লিখছিস না। তবে যাচ্ছিস কেন?' বলল 'না, না। বুঝতে পারছ না, যদি কিছু ঘটে যায়?'

ঘটে যায় মানে? প্রতিনিয়ত যেটা ঘটছে, এতগুলো মানুষের এতদিনের অস্তিত্বের সংকট—সেটা ঘটনা নয় যথেষ্ট?

সিঙ্গুরে পাঁচশো বাচ্চা একদিন অনশন করেছে—সেটা ঘটনা নয়? আর বিধানসভার ভগ্নদশা দেখতে এসেছে ক'টা বাচ্চা, সেটা ঘটনা? চৌরঙ্গির ধরনামঞ্চে কে এলেন, কে এলেন না; তাপসীকে পুড়িয়ে মারার আগে ধর্ষণ করা হয়েছিল কি হয়নি; চব্বিশ ঘণ্টার বন্‌ধ হবে না আটচল্লিশ ঘণ্টার,—এগুলোই তাহ'লে ঘটনা কেবল? চমৎকার!

মিডিয়া বড় চতুরভাবে, কখন যে সবার অজান্তে, কোনও একটা আন্দোলনের গায়ে একটা বিশেষ মানুষের পোস্টার সেঁটে দেয় সেটা বুঝতেও দেয় না। এমনভাবে দেয়, যাতে সেই মানুষটার ব্যক্তিগত ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিই আন্দোলনটার স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

বন্‌ধ হয়েছে কি হয়নি, তাতে কার জয় হয়েছে, কে পরাজিত-সেটা কি সত্যিই বিবেচ্য?

আমরা প্রশাসনের ঔদ্ধত্য নিয়ে অনেক কথা বলছি। কিন্তু যখন আচমকা একটা রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে হঠাৎ একটা বন্‌ধের ডাক ছুড়ে দেওয়া যায়, সেটা কি কম উদ্ধত?

কাদের জন্য বন্‌ধ? তাঁরা কি চেয়েছেন বন্‌ধ? সিঙ্গুরের মানুষকে একবার জিজ্ঞেস করেছি আমরা? তাঁদের না জানিয়ে তাঁদের হয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া—তাঁদের অবমাননা নয়?

এই কথাটা তো কেউ বললেন না। সাধারণ মানুষের অসুবিধের কথা বললেন, হাইকোর্টের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্ডারের কথা উঠল। কেউ তো বললেন না, যে সত্যাগ্রহে অনমনীয়তার কোনও স্থান নেই।

সিঙ্গুর আজ কেবল একটা স্থাননাম নয়। বাংলার মানুষের ইতিহাসে হয়তো সিঙ্গুর কথাটা এখন থেকে 'আন্দোলন' এর সমার্থক হয়ে দাঁড়াল। যে আন্দোলন সাধারণ মানুষের। যেখানে নেতৃত্ব দেবার আমরা কেউ নই। তৃণমূল নয়, সি পি এম নয়, বুদ্ধিজীবীরাও নন...

আমাদের মধ্যে একটা প্রচলিত সৌখিন বুলি আছে, 'চল, আমরা গ্রামে গিয়ে কাজ করি। ওদের শেখাই।' এই নাগরিক উন্নাসিকতা একটু দূরে সরিয়ে রেখে তাকালেই দেখতে পাব, যে আমরা গ্রামকে শেখাব কয়েকটা ইংরিজিতে লেখা অক্ষর। আর, গ্রাম আমাদের শেখাবে হাজার হাজার বছরের ইতিহাস। যার কাছে আমরা সকলেই নতজানু। যার চোখে চোখ রাখবার মতো ক্ষণজন্মা বড় কম। কালেভদ্রে, একটা কার্ল মার্ক্স ... একটা রবীন্দ্রনাথ ... ব্যস্।

এই আন্দোলনে কোনও নায়ক নেই, কোনও খলনায়ক নেই। আছে এক প্রবহমান সভ্যতা। আর তার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা সকলে। আমাদের সীমিত বোধ আর অসীম অর্বাচীনতা নিয়ে।

আসুন, একবার অন্তত সবাই মিলে সেই সভ্যতার শরিক হই। তার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালে আপনিই বুঝতে পারব—সত্যিকারের উন্নয়ন কাকে বলে।

আশা করতে বড় ভয় হয়, তবু কামনা তো করতে পারি—দু হাজার সাত সকলের জন্য শুভ হোক। সর্বজনীন কল্যাণের হোক।

মমতা, আপনাকে বলছি। মহাশ্বেতাদি আপনাকে অনেক অনুরোধ করেছেন—অনশন ভাঙতে, নতুন করে নেতৃত্ব দিতে, ইত্যাদি, ইত্যাদি...।

আমি কেবল একটা ছোট্ট অনুরোধ করব?

দয়া করে কয়েকদিনের জন্য অন্তত মিডিয়ার ক্যামেরাকে প্রত্যাখ্যান করুন।

যদি সত্যিই সত্যাগ্রহে বিশ্বাস করে থাকেন, তার এই অপরিসীম শক্তিকে লঘু করে দেবেন না।

ভাল থাকুন সবাই।

৩১ ডিসেম্বর ২০০৬

'কি, একা ঘুমাইতে ভয় করে নাকি? তুমি না বড় হইছ।'

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি আমি। কী উত্তর দেব?

১৯৭২ সাল। সদ্যবিবাহিতা পিসিমণির সঙ্গে শ্বশুরবাড়িতে এসেছি আমরা দু'জন। আমি আর জ্যাঠতুতো দিদি।

আজ কালরাত্রি। নতুন বউ আলাদা ঘরে শোবে। সঙ্গে আমার দিদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ন-বছরের তখন, তবু কুটুম তো বটে। আমার তাই বিশেষ খাতির। শোবার ব্যবস্থা আলাদা ঘরে।

হালিশহরের ছড়ানো বিশাল চকমেলানো বাড়িটা তখনও আমার কাছে ভুলভুলাইয়া। বিশেষ করে অন্ধকার উঠোনটা।

'ভয় পাও ক্যান, ভয় পায় কেডা? যে ভিতু। তুমি না লেখাপড়ি শিখছ।'

ধীর শান্ত গলায় বিছানা করতে করতে আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন পিসিমণির শাশুড়ি। ছোটখাটো শীর্ণ চেহারা, ভাঙা গাল, একমাথা পাকা চুল।

'নাও, শুইয়া পড়। ঘুমাও।'

বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ঘুরে এসে বললেন,

'যদি ভয় করে, শোবার আগে বালিশের উপর আঙুল দিয়া লিখবা শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী। আর ভয় করব না।'

আলো নিভিয়ে চলে গেলেন পিসিমণির শাশুড়ি। ঘন অন্ধকার ভেদ করে উঠোন পার হয়ে মিলিয়ে গেল শুভ্র থান।

আর আমি বসে রইলাম আমার ন'বছরের জীবনের শব্দকোষে সদ্য-শেখা একটা নতুন শব্দ নিয়ে। লোকনাথ ব্রহ্মচারী।

সে রাতটা কী হয়েছিল আমার মনে নেই।

পিসিমণির শাশুড়ির সঙ্গে তারপর আর দেখা হয়নি।

কিন্তু এক নিশ্চিত নিরাপত্তার গূঢ় সন্ধানের হদিশ দিয়েছিলেন যে মহিলা, তিনি যেন আমার সঙ্গেই রয়ে গেলেন আশৈশব।

অনেক সময় এমন হয়েছে—পরীক্ষার আগের রাত, পড়া হয়নি কিচ্ছু, ঘুম আসছে না ভয়ে। কখন যে অজান্তে আঙুল চলে গেছে বালিশের ওপর। ব্রহ্মচারীর হ আর ম- এর যুক্তাক্ষর গুলিয়ে গিয়ে ক্ষ লিখেছি কতবার।

তাপসী মালিকের মৃত্যুর খবরটা পড়ে বারবার মনে হচ্ছিল একটা কথা। সিঙ্গুরের মানুষদের মনে এখন কোনটা বেশি তীব্র—রাগ না ভয়? কেমন দেখাচ্ছে তাঁদের মুখগুলো—রক্তিম না পাংশু?

হঠাৎ যেন সব মুখ কেমন এক হয়ে গেল। শীর্ণ শরীর, ভাঙা গাল, কোটরে বসা চোখ। সবাই যেন সমস্বরে ফিসফিস করে উঠল, 'যখন ভয় পাবা...'

লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ঐতিহাসিক সময় আজ থেকে একশো বছরেরও আগে। কিন্তু তাহলে হঠাৎ সম্প্রতি, বিগত পনের বছরে, কেন তিনি হয়ে উঠলেন বাঙালির নব অবতার?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা কথা জানা যায়, যে ওঁর মূল কাজটা ছিল বারদীতে। ফলে এপার বাংলার মানুষ হয়তো ওঁর মহিমার সম্যক সাক্ষাৎ পায়নি। সেটাই কারণ?

বাবার ছেলেবেলা কেটেছে পূর্ববঙ্গে। তাই বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম। বাবার ছাত্রাবস্থায়, বারদী নাকি বেশি বিখ্যাত ছিল ব্রহ্মপুত্রের তীরে নাঙরবন্ধের বারুণী স্নানযাত্রার জন্য। তখন লোকনাথ ওপার বাংলাতেও সেভাবে জনপ্রিয় হননি। তাহলে?

একটা সহজ ধারণা করা যায়। একাত্তরের মুক্তি যুদ্ধের পর যে ছিন্নমূল গৃহহারা মানুষ দলে দলে চলে এসেছেন এপার বাংলায়, তাঁদের সঙ্গেই কি এলেন লোকনাথ? সমস্যাটার আধার কি তাহলে সেই মানবসভ্যতার মূলে? উচ্ছিন্ন মানুষের অস্তিত্ব সংকট—তেভাগা ... সিঙ্গুর ...ভাঙড়!

রাষ্ট্র যখন সব সহায়সম্বল কেড়ে নেয়, তখন বাকি পড়ে থাকেন কেবল অন্তরের দেবতা। সর্বহারা-দের একমাত্র সম্পদ। ত্রাণের ইষ্টমন্ত্র।

আর, আমরা এমনই দুর্ভাগা, মানুষের সে অসহায়তাটুকুও বুঝি না। শুধু তাই না, বুঝতে চাওয়াটাও অবৈজ্ঞানিক বলে ধরে নিই।

কারণ আমাদের পকেটে তো যুক্তি আছে। আমরা তো জানি মার্কস-এর সেই আর্ষবাণী Religion is an opium of the masses ... । এবং সুবিধেমতো ভুলে গিয়েছি অসমাপ্ত বাক্যাংশটুকু ... sigh of the oppressed.

যাদের ওপর নির্ভর করেই বেঁচে থাকবার কথা ছিল, তারাই যদি স্বেচ্ছায় ঠেলে দেয় গভীর অনিশ্চয়তার দিকে, তবে মরতে মরতেও তো আঁকড়ে ধরতে হবে কোনও না কোনও সম্বল।

আজীবনের ভিটেমাটি পেছনে ফেলে, ধানমাঠ, প্রান্তর, মজা নদী পার হয়ে যখন রাতের অন্ধকারে এক গভীর নিরুদ্দেশের দিকে কাতারে কাতারে পাড়ি দিয়েছিলেন একাত্তরের সেই ছিন্নমূল মানুষগুলো—তখন হয়তো 'রণে বনে জলে জঙ্গলে'র এই পরিত্রাতাই ছিলেন তাঁদের অন্তরের শক্তি। তাঁদের আইডেনটিটি।

কোনও সময়ে মাইলের পর মাইল চলবার পর শরীর যখন আর দিচ্ছে না, চোখের পাতার লোহার মতো ভারি—বুঝিবা কোনও চষা ধানখেতে, কোনও ভাঙা গোয়ালঘরের কোনায় লুকিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রামের আগে ভূমি উপাধানে কত কত আঙুল লিখেছে এই অদৃশ্য নাম। আর তার সঙ্গে লিখেছে অন্ত্যজপাঠের এক নতুন ইতিহাস।

ঐতিহাসিক নথিপত্রে লোকনাথের অবস্থান কোথায়, সেটা গবেষণাসাপেক্ষ। কিন্তু, চোখের সামনে আমাদের আয়ুষ্কালে নতুন এক মানবধর্মের জন্মক্ষণ আমরা প্রত্যক্ষ করলাম। অভিজ্ঞতা হিসেবে সেটা নিশ্চয়ই অতুলনীয়।

ছোটবেলায় মনে আছে, সন্তোষপুর, যাদবপুর, বাঁশদ্রোণী অঞ্চলে যখন প্রথম লোকনাথ সংকীর্তন প্রচলিত হচ্ছে—উদ্বাস্তু কলোনির বাড়িগুলোর একদিকের দরমা দেয়াল খুলে উঠোনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে মিলিয়ে এক করে নেওয়া হত ঘর। তার পর সেই অপরিসর প্রশস্ততায় সবাই জমায়েত হতেন অখণ্ড সংকীর্তনে। সেই কীর্তনে কোনও প্রশান্তি ছিল না—ছিল অনেকগুলো সর্বহারা মানুষের প্রতিবাদী ক্রোধস্বর।

লোকনাথ ব্রহ্মচারীর একটাই ছবি দেখতে পাই আমরা। ঋজু, শীর্ণ একটি মানুষ। কোনও বরাভয় নেই, কোনও কৃপামুদ্রা নেই। জটাজুট, গোঁফদাড়ি সরিয়ে ফেললেই আমাদের রোজকার দেখা জ্যাঠা, বাবা, কাকার আদল।

কালের দূরত্ব তাঁর মাথার পেছনে একটি জ্যোতির্বলয় জুড়তে পেরেছে মাত্র। তাঁর স্বকীয় ভঙ্গি কোনও দেবোপম লালিত্যে নধর, পেলব হয়নি।

যে কোনও ত্রাতাই শেষপর্যন্ত কমোডিটি। রবীন্দ্রনাথ, কার্ল মার্কস, বিবেকানন্দ, মাও সে তুঙ—কেউ বাদ পড়েন না তার থেকে। লোকনাথও পড়েন নি।

বোধহয়, সেটা ইতিহাসের নিয়ম।

কারণ সব ইতিহাসসূত্র আমাদের সচেতন মানসপটে সমান সটান থাকে না। কেবল চলমান মানবস্মৃতি যতটুকু ধারণ করতে পারে, সে-টুকুই ব্যবহার করে চোখের সামনে বাঁচিয়ে রাখা হয় একটা আপাত সত্য।

বছর বিদায় নিল। পাতা ওল্টাচ্ছে মহাকাল।

সরে যাক এই ক্ষণ সত্যের আবরণ। ইতিহাস তার বিশ্বরূপ নিয়ে এসে দাঁড়াক আমাদের সামনে।

দু'হাজার-সাত নির্ভয় হোক।

৭ জানুয়ারি ২০০৭

'সমাজচেতনাটা কিন্তু কাটছে ভাল, চালিয়ে যাও।'

প্রথম রোববার সম্পাদকীয় বেরোবার পর একজন বললেন। আমি হাসলাম।

দপ্তরের বাচ্চা-বন্ধুরা বলল, 'তৃণমূল এবার ঋতুদাকে টিকিট দেবে।' আমি খুব হাসলাম। ওরাও হাসল।

দ্বিতীয় সম্পাদকীয়টা বেরোলো।

ওরা বলল 'এবার তোমাকে তৃণমূলও মারবে। সিপিএমও মারবে।'

আমি হাসলাম। ওরা হাসল না।

সে কী! হাসবার কথা ছিল না বুঝি আমার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েকদিন আগে অবধি আমার কাজ সম্পর্কে যাদের প্রধান সমালোচনা ছিল, —কেন, মেয়েদের নিয়ে সিনেমা কেন? পৃথিবীতে কী আর কোনও সমস্যা নেই? আর মেয়েদের নিয়ে কাজ মানেই কী অবদমিত যৌনতাবোধ-তাছাড়া আর কোনও বিষয় নেই?

উপহাসোক্তি শুনেছি—ঋতুপর্ণ! ওরে বাবা! ও মেয়েদের থেকেও বেশি ফেমিনিস্ট!

তাঁরাই দেখলাম লেখা দুটো পড়ে বলছেন...'কী দরকার এসব? কেন শুধু শুধু পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করছ? বেশ তো ছিলে—কেমন মিষ্টি মিষ্টি ছবি বানাতে। কী সেনসিটিভ! মহিলা চরিত্র পেরেছে কেউ তোমার মতো করে হ্যান্ডেল করতে: আমরা কত বলতাম— দ্যাখো তো। ঋতুপর্ণ কেমন মধ্যবিত্তকে আবার সিনেমা হলে ফিরিয়ে এনেছে...। আর গভর্মেন্টকে কেউ ক্ষ্যাপায়? সামনে পদ্মশ্রী উর্বশী আসছে...'

আর বুঝতে পারছি না, আমি হাসব কি না?

আমি কি তাহলে অবস্থান বদলালাম? চালু কথায়, পাল্টি খেলাম?

কেন? দহনের ঝিনুক কি সিঙ্গুরের তাপসী নয়? গ্রাম থেকে শহরে আসা রেনকোট-এর দুই অসহায় ভাগ্যবিড়ম্বিত বিচ্ছিন্ন প্রণয়ীযুগল—তাদের মধ্যে কোথাও কখনও কি এসে দাঁড়ায়নি ছিন্নমূল সমস্যা?

ফেমিনিজম কথাটা পাল্টাতে পাল্টাতে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে—সেটার অতিসরলীকৃত ব্যাখ্যা আজ মানুষের কাছে কেবল কতগুলি ঝলসানো বক্ষবন্ধনীর অনুষঙ্গ। ঠিক যেমন দ্যূতসভায় পাঞ্চালীর পণ্যীকরণের অপমান যুগে যুগে শরীরায়িত হতে হতে পর্যবসিত হয়েছে কেবল বস্ত্রহরণের রোমাঞ্চকর যৌনকল্পনায়।

ফেমিনিজম বা নারীবাদ মানে পুরুষবৈরিতা নয়, পুরুষতন্ত্রের বিরোধিতা।

দিল্লির বস্তির পর বস্তি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন যে কিংবদন্তি নেত্রী, আমার কাছে তিনিই পুরুষতন্ত্রের নিষ্ঠুরতম এবং সুন্দরীতম প্রতিভূ।

অথচ আজও ভারতজুড়ে 'সেরা নারী'র ওপিনিয়ন পোলে সেই ভদ্রমহিলার স্থান প্রথম তিন থেকে পাঁচের মধ্যেই থাকে। অবধারিতভাবে।

হ্যাঁ, আমি 'প্রিটি' 'প্রিটি' ছবি করি। আমার প্রতিটি চরিত্র সুবেশ, প্রতিটি কক্ষ সুরম্য, প্রতিটি দৃশ্য মনোহর। আমার নিকটতম হিতৈষীরাও বলেন— সব ছবি এত সুন্দর দেখতে হওয়ার দরকার কী?

আছে। আমি সুন্দর ভালবাসি। সর্বতোভাবে। কুৎসিত এবং অসুন্দর সর্বার্থে পরিত্যাজ্য আমার কাছে। আর সুন্দর অসুন্দর কি কেবলমাত্র নান্দনিক প্রশ্ন?

যে শাশুড়ি আগুন দিয়ে নিরীহ বৌটিকে পুড়িয়ে মারেন, আর যাঁরা নন্দীগ্রামের মাটিকে রক্তাক্ত করেন তাঁরা সকলেই সেই পুরুষতন্ত্রের (পাঠান্তরে নায়কতন্ত্রের) মাফিয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইরে থেকে তৈরি করে দেওয়া নিয়মের কাছে বারবার অন্দরকে নতিস্বীকার করতে বলা আর বাইরে থেকে উন্নয়নের ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করে এনে সনাতন সভ্যতার ওপরে সেটা চাপিয়ে দেওয়া একই রকম হঠকারিভাবে ফ্যাসিস্ট। এবং অসুন্দর।

বড় মধুর, বড় চমৎকার, একটা বাংলা শব্দ ছিল অভিধানে—ঝি। মানে মেয়ে। অন্দরমহলের পুরুষতন্ত্র সেই একমাথা চুল বড় বড় চোখের শব্দটার হাতে কবে যেন ন্যাতা বালতি ধরিয়ে দিয়েছে।

খুব বেশিদিন হয়তো লাগবে না। আগামী যুগের বাংলা অভিধানে কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো 'উন্নয়ন' মানে লেখা হবে 'উৎখাত'।

সৌমিত্রদাকে নিয়ে কিছু আর লিখলাম না।
আমি জানি, লিখতে শুরু করলে বছরের সবকটা রোববার-ও যথেষ্ট নয়।
সৌমিত্রদার নীরোগ, উজ্জ্বল কর্মজীবন কামনা তো যে কোনও বাঙালির ব্রত।
আমি কেবল বলতে পারি—ভালো থাকো সৌমিত্রদা। আরও অনেকদিন ভালো থাকো।
ঠিক যেমন করে তোমার নিজেরও অজান্তে আমাদেরও ভাল থাকতে শিখিয়েছ তুমি।

২১ জানুয়ারি, ২০০৭

AMARBOI.COM

পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে নিরাপদ জায়গা আমার মায়ের বাড়ি—লীলা মজুমদারের 'অন্য কোনখানে' বইটা শুরু হয় এই লাইনটা দিয়ে।

কলকাতা শহরে আমারও এরকম তিনটে বড় নিরাপদ জায়গা আছে।

আমাদের টালিগঞ্জের বাড়ি, যেখানে আমি জন্মেছি, বড় হয়েছি। আমার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়—যেখানে প্রথম ডানা মেলেছে অনেকগুলো নতুন ভাবনা। আর আমার রবীন্দ্রসদন—নন্দন চত্বর, যেখানে দাঁড়িয়ে বারবার করে মনে হয়েছে সেই সব ভাবনার পুণ্য সঙ্গমস্থল যদি কিছু থাকে—তা হ'ল এই জায়গাটাই।

নন্দন-রবীন্দ্রসদন-বাংলা অ্যাকাডেমির এই ছায়াচ্ছন্ন চত্বরটা আমার মত অনেকের কাছেই বড় স্নিগ্ধ আদরের জায়গা। যতবার নন্দন, রবীন্দ্রসদনের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকি নতুন করে মনে হয় বড় একটা শান্তির, নির্ভরতার, আনন্দের আশ্রয়ে এসে পৌঁছোলাম।

এই চত্বরে প্রথম স্কুল পাশ করে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আমরা সদ্যোপ্রয়াত ঋত্বিক ঘটকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেট্রোস্পেকটিভ দেখেছি। কথাটার মানেও বোধ হয় শিখেছি ওই প্রথম।

এই নন্দনে কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের আবেগ, আমাকে ব্যক্তিগতভাবে পৃথিবীর সমস্ত চলচ্চিত্র উৎসবের হাতছানিকে অবলীলায় অগ্রাহ্য করতে শিখিয়েছে। ভিন শহরের বা বিদেশের বন্ধুরা যখন তাদের নিজেদের ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের নানা প্রযুক্তির নানা আধুনিকতার, নানা ফিরিস্তি দিয়ে বড়াই করেছে, প্রায় দীওয়ার-এর অমিতাভ বচ্চনের সামনে নম্র প্রতিস্পর্ধী শশী কাপুরের মতো আমরাও শেষ হাসি হেসেছি—"মেরা পাস 'নন্দন' হ্যায়।" তোমরা বড় অডিটোরিয়াম দিতে পার। দামী গাড়ি করে ফেস্টিভ্যাল কক্ষে নিয়ে যেতে পার—আমাদের নন্দন, রবীন্দ্রসদন তো দিতে পারবে না।

এ কথা যখন বলেছি তখন নিশ্চয়ই বাড়ি দুটোর কথা বলিনি। তার স্থাপত্যের কথা বলিনি। বলেছি এমন এক নিরাপদ স্বাধীন সাংস্কৃতিক পরিবেশের কথা যা সত্যজিৎ রায়ের মত মানুষের মরদেহ ধারণ করার মতই পবিত্র।

সেই রবীন্দ্রসদন—নন্দন চত্বর থেকে গতমাসে সিঙ্গুর বিষয়ক পোস্টার প্রদর্শনীর বিজ্ঞপ্তি সাঁটবার অপরাধে তিনটি ছেলেকে গ্রেফতার করলেন পুলিশ। ঠিক পাশে, রবীন্দ্রসদন মঞ্চে তখন আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসব চলছে।

পুলিশ বোকা নন। তাঁরা জানেন বিজ্ঞপ্তি সাঁটার জন্য গণতান্ত্রিক (?) দেশে কাউকে গ্রেফতার করা যায় না। ফলে, তাঁরা অন্য অভিযোগ আনলেন, ওঁদের পরিভাষায় অন্য 'কেস' দিলেন।

গত ২৪ জানুয়ারি থেকে ঐ নন্দন-রবীন্দ্রসদন-বাংলা একাডেমি চত্বরে লিটল ম্যাগাজিন মেলা শুরু হয়েছে।

প্রথাবিরোধী এই যে পত্রিকাসাহিত্য, তা স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীন এবং বহুস্বর। লিটল ম্যাগাজিন বাজারের দাক্ষিণ্যের জন্য জন্মায়নি। জন্মেছে তার নিজের বিশ্বাস এবং স্বাধীনতার জায়গা থেকে। প্রতিটি লিটল ম্যাগাজিন-ই কোনও না কোনও স্বাধীন চিন্তার বাহক। সেইজন্যই তারা স্বতন্ত্র এবং শুদ্ধ মননশীলতার সঙ্গে কোথাও কোনও আপোষ নেই।

আজ, আমাদের রোববার-এর দপ্তরে প্রতিটি সংখ্যা নিয়ে আমাদের ভাবতে হয়— এটা সবাই পড়বে তো? ভাল লাগবে তো পাঠকের? কারণ আমাদের পাঠক বাঁধা। আমাদের তাঁদের কাছেই পৌঁছতে হবে, ফলে তাঁদের দৈনন্দিনতা, তাঁদের পছন্দ-অপছন্দ ভুলে গেল আমাদের চলবে না।

লিটল ম্যাগাজিন-এর তো সে দায় নেই। তার পাঠক তাকে ঠিক খুঁজে নেবেন। সেকথা পাঠকও জানেন, লেখক জানেন সম্পাদক-প্রকাশকও জানেন।

স্বাধীন মনের স্বাধীন কতগুলো কাগজ তাঁদের প্রদর্শনীক্ষেত্র হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই বেছে নেবে স্বাধীন কোনও পরিসর—এটাই তো রীতি। আর কলকাতা শহরে, স্বাধীন সংস্কৃতির জায়গা হিসেবে নন্দন রবীন্দ্রসদন চত্বরের তাৎপর্য সত্যিই তো ঐতিহ্যগতভাবে প্রতীকী!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই লিটল ম্যাগাজিন মেলায় গণতন্ত্র দিবসের দিন পুলিশ এসে হুমকি দিয়ে গেলেন। প্রথমে সাদা পোশাকে কয়েকজন ঘোরাঘুরি করছিলেন, তারপর ইউনিফর্মে পুলিশ এসে সম্পূর্ণ বাজে অজুহাতে ভয় দেখিয়ে গেলেন—'এমন কেস দেব, যে সারাজীবন কোর্টে দৌড়োবেন। এসব লিটল ম্যাগাজিন করা-টরা উঠে যাবে?' বিশ্বাস হয়!

এই আমাদের সেই নন্দন—রবীন্দ্রসদন? এইখানে আমরা অ্যাঞ্জেলোপুলস দেখেছি? জাফর পানহাই দেখেছি? এখানেই আমাদের অনেকের প্রথম পরিচয় হয়েছে কুস্তরিকার সঙ্গে?

অমরা গ্রীক মার্কেটপ্লেস-এর কথা শুনেছি। পৃথিবীর প্রাচীনতম গণতন্ত্রের মুক্ত চিন্তা বিনিময়ের উন্মুক্ত ক্ষেত্রে। গ্রীক ভাষায় তার নাম ছিল অ্যাগোরা। ইংরিজীতে Open Space। সেই গ্রীক মার্কেটপ্লেস সর্বার্থেই ছিল মানসভূমির উন্মুক্ত দিগন্ত।

বড় আদর করে রবীন্দ্রসদন-নন্দন চত্বরকে আমরা নিজেদের মধ্যে আমাদের 'কলকাতার অ্যাগোরা' বলতাম। অভিধানে কেমন করে শব্দ বদলায়, সে আলোচনা একদিন হল। মার্কেট অর্থে বিনিময় স্থল—আজ বাংলা ভাষার 'বাজার'। কদর্থে 'বাজারি।'

আমাদের এত সাধের 'কলকাতার অ্যাগারো' কি শেষ পর্যন্ত বিক্রি হতে এমন বাজারে এসে দাঁড়াবে, যেখানে একদিন সত্যজিৎকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে গেছিলাম ভেবে অপরিসীম গ্লানিতে ভরে যাবে মন?

৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৭

AMARBOI.COM

ফার্স্ট পার্সন লিখতে বসেছি। এস এম এস এলো—অমলেন্দু চক্রবর্তী বিদ্যাসাগর পুরস্কার প্রত্যর্পণ করেছেন।

রাজ্য সরকারের পুরস্কার ফিরিয়ে দিয়েছেন সুমিত সরকার, তনিকা সরকার।

রাজ্য সরকারের নাট্য অ্যাকাডেমি থেকে ঝেঁটিয়ে পদত্যাগ করেছেন এই বাংলার সব উজ্জ্বল নাট্য জ্যোতিষ্ক।

এই সর্বব্যাপী ঘন তমসার মধ্যেও এক চিলতে আলো।

অবশেষে নন্দীগ্রামে নৃশংসতা স্থৈর্য দিয়েছে অনেক দোলাচলকে। তীব্র ঘৃণা প্লাবিত করে দিয়েছে সমস্ত টানাপোড়েন।

সিঙ্গুরের সময়ও যাঁদের নীরব থাকতে দেখে অভিমান করেছিলাম, তাঁদের অনেকেই এক এক করে চোখ মেলেছেন, মুখ খুলেছেন, পথে নেমেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নন্দীগ্রামের গুলিবিদ্ধ নিরীহ গ্রামবাসীরা কি তাহলে শহিদ হলেন কোনও বড় এক নবজাগরণের জন্য?

তাহলে কি এখনও আশা আছে?

অকারণ অবারণ গুলিবর্ষণ, কাটা ফসলের মত 'রাশি রাশি মৃতদেহ' পার হয়েও তাহলে 'আশা' আছে?

রীণাদির (অপর্ণা সেন) ছবি দেখলাম একটা প্রতিবাদ মিছিলে। পল্লব (কীর্তনীয়া) এবং প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

খুব ভাল লাগল।

পর পর কয়েকটা এস এম এস এলো রীণাদির কাছ থেকে—ধিক্কারে এবং রক্তদানে ব্রতী হওয়ার জন্য।

শঙ্খদা বাংলা অ্যাকাডেমি থেকে পদত্যাগ করেছেন। জয়, শ্রীজাত নতুন কবিতা লিখেছে।

এবারের 'ভালো-বাসার বারান্দা' থেকে ঝরে পড়েছে নবনীতার সেই চিরচেনা অলৌকিক গদ্য। বিশ্বাস করো নবনীতাদি, তোমার এইরকম একটা লেখার জন্য কতদিন ধরে অপেক্ষা করে ছিলাম।

অনেক সংবাদপত্র তাঁদের ভঙ্গি পাল্টেছেন। সিঙ্গুরের সময় মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি তাঁদেরও যে ঔদ্ধত্য দেখেছি আজ নন্দীগ্রামের মারণভূমিতে দাঁড়িয়ে তাঁরাও অনেক বিনম্র নমনীয় ও মানবিক।

গোপালকৃষ্ণ গান্ধিকে কিছু সিপিএম নেতা প্রায় গ্রেগ চ্যাপেলের চেহারা দিয়েছেন। তাঁর অপরাধ—তিনি স্বাভাবিক, মানবিক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। যে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর ইচ্ছায় (সুপারিশে?) তিনি রাজ্যপাল হয়ে এসেছেন এই বাংলায়, সেই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য'র সমালোচনা করেছেন বলে তিনি অসাংবিধানিক! আর অ-পুলিশকে পুলিশের পোশাক পরানো অসাংবিধানিক নয়? চমৎকার!

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম বিভিন্নভাবে ঘটনা, পরিঘটনাকে বিবৃত করছে। মুখ্যমন্ত্রী এই মারণযজ্ঞের দায়িত্ব নিচ্ছেন, সেই কৃতকর্মের দায়ভাগ নিচ্ছেন না। এমনটাও পড়লাম। একটু পিছিয়ে তাকালে মনে হয়ে এই জন্যই কি ফাঁসুড়ের জীবন নিয়ে বানানো ছবিটি নন্দনে নিষিদ্ধ হয়েছিল? নন্দনের অমলিন চিত্রক্ষেপণে অত বড় পর্দাগুলো আয়না হয়ে যাবে বলে?

বুদ্ধদেববাবু, আপনার কবিতার বই, পাণ্ডুলিপি আমাদের দিয়ে দিন। আমরা সযত্নে সেই সৃষ্টি রেখে দেব। আজকের মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে কোনও কবিতার কোনও ঠাঁই নেই।

সেদিন পড়লাম জ্যোতিবাবু বামফ্রন্টের শরিকদলগুলিকে অনুরোধ করেছেন —'যতদিন আমি বেঁচে আছি, নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি কোরো না।'

পিতৃতান্ত্রিকতায় এই চূড়ান্ত করুণ পরিণতি মহাকাব্যের কুরুসভার অশক্ত ধৃতরাষ্ট্রকে মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়িয়ে দিল। 'বাপধন সব, মিলেমিশে একটু মানিয়ে টানিয়ে নাও না কেন?'

কেন না, তাঁরই কোনও এক বেয়াড়া ছেলে বারবার ঘাড় ব্যাঁকা করে বলে চলেছেন, 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী' (পুর?)

মাটি নিয়ে এই নিরন্তর বিবাদসূত্রের অন্তিম পরিণতি যে কুরুক্ষেত্রের ঘোর প্রলয়যুদ্ধ, সে কথা কি আমরা ভুলে গেছি তাহলে?

২৫ মার্চ, ২০০৭

শুটিং-এর একটা বড় পাট চুকে গেল। এবার ক'দিনের আউটডোর। ব্যাস!

এই ক'দিন স্টুডিওতে সকাল থেকে রাত অবধি টানা। অল্পদিনে অনেকটা কাজ তুলতে হবে, তাই কোনওরকমে সাতসকালে পৌঁছে যাওয়া—বাড়ি ফিরতে ফিরতে গভীর রাত। মানুষজন বলতে ইউনিটের সহকর্মীরা। আর স্টুডিওতে ঢোকার সময় সারিবদ্ধ উৎসাহী জনতা—অমিতাভ বচ্চনকে দেখবেন বলে কাতারে কাতারে মানুষ।

স্টুডিওর ভিতরে একবার ঢুকলে যেন যক্ষপুরী, সেখানে বাইরের আলো, বাতাস, শব্দ, চিৎকার কোনও কিছুই পৌঁছায় না।

এতকিছু হয়ে গেল—নন্দীগ্রাম, বব উলমার, ভারত-শ্রীলঙ্কা বিপর্যয়—সবই কাগজ বা টেলিভিশন হয়ে পৌঁছল আমাদের কাছে।

আমরা শুনলাম, জানলাম, তাৎক্ষণিকভাবে হইহই, চেঁচামেচি করলাম—তারপর আবার মনোনিবেশ করলাম কাজের মধ্যে—শট নিতে হবে।

অনেক প্রতিবাদ মিছিল হ'ল, শিল্পী সমাবেশ হল—আমি শুটিং করে গেলাম।

একবার কোনও মিছিলে মনে হল সময় করে যাই। কী আর হবে? ততক্ষণে অলো তৈরি করে রাখবে—আমি ফিরে এসে শটটা নেব।

হইহই করে উঠল অনেকে।

—তুমি কি পাগল? তুমি প্রতিবাদ মিছিলে যাবে! আর কালকে থেকে অমিতাভের পাইলট পুলিশ যদি ফিরিয়ে নেয় রাজ্য সরকার—শুটিং শেষ করতে পারবে?

অতএব যাওয়া হল না। সত্যিই, কত ঠুনকো সব শেকল আমাদের!

বারবার মনে হচ্ছে—যাকে পারিবারিকভাবে বিশ্বাস করে এসেছি এতদিন ধরে, গত তিরিশ বছর, বাবা মা'র 'প্রগতিশীলতা'য় কলেজের অর্থনীতি পড়ায় তারপর নন্দন-রবীন্দ্রনাথ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিশিরমঞ্চের সাংস্কৃতিকতায়, তার উপর থেকে চট করে বিশ্বাস তুলে নেওয়া বড় বেদনার, বড় দুষ্কর।

মনে আছে 'চোখের বালি'র সময় বেনারসে শুটিং করা নিয়ে বড় দুর্ভাবনায় ছিলাম। বিধবার প্রেমের গল্প—তার আগেই দীপা মেহতার 'ওয়াটার' নিয়ে অমন তুলকালাম হয়ে গেছে।

বুদ্ধদেববাবুকে ফোন করেছিলাম। উনি কত যত্নে কত দায়িত্ব নিয়ে উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপালকে চিঠি লিখে দিয়েছিলেন। এবং সেটা নিয়ে কোনও বিজ্ঞাপন হয়নি। 'গণশক্তি' কোনওদিন এককলম খবরও বের করেনি।

যে কোনও ছোট সাহসের কাজে পাশে দাঁড়ানোর জন্য বারবার তো এই বিশ্বাসের জায়গাতেই শরণসন্ধান করেছি। সেই আশ্রয় খোঁজার মধ্যে কোনও গ্লানি ছিল না, কোনও অগৌরব বোধ করিনি কোনওদিন।

তাই আজি যদি হঠাৎ সেই আশৈশব বিশ্বাসকে সন্দেহ করতে শুরু করতে হয় তাহলে যে কী ভয়ঙ্কর অসহায় লাগে—একথা নিশ্চয়ই আমার মতো আরও অনেকেই বুঝছেন।

অনেকেই বলছেন,—'না না। বামফ্রন্টের বিরোধিতা কোরো না, তাহলেই মমতার হাত শক্ত হবে। আর তাহলেই বিজেপি আসবে। আর তাহলে কতবড় সর্বনাশ বুঝতে পারছ না?

সত্যিই তো! আবার, সত্যিই কি?

যা ঘটে গেল গত কয়েকমাসে, তার থেকে বড় সর্বনাশ আর কী হবে? আর তেমন কোনও সর্বনাশ যে ঘটবে না তার কি কোনও স্থির বিশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি আছে আমাদের কাছে? বিজেপি মৌলবাদী—তাই তাঁরা প্রগতিশীল চিন্তায় নিন্দার্হ।

পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমও তো এখন ধর্ম। প্রাতিষ্ঠানিক সমাজ চালনাপন্থা।

নিজের বিশ্বাসকে অভ্রান্ত মনে করে সদম্ভে বেঁচে থাকা, যেখানে অন্য কোনও সমান্তরাল বিশ্বাসের কোনও মূল্য বা ঠাঁই নেই, সমান্তরাল বিশ্বাসের সেটাই যদি মৌলবাদ হয়, তাহলে নতুন করে কোন মৌলবাদের ভয় পাচ্ছি আর?

সেদিন রাত্রে স্বভূমিতে শুটিং ছিল। বিকেল পাঁচটা নাগাদ রবীন্দ্র সরোবর প্রাঙ্গণ পার হচ্ছি, এমন সময় দেখি কাতারে কাতারে মানুষ। দীর্ঘ লাইন দিয়ে অপেক্ষা করছেন। কতগুলো মেডিক্যাল ভ্যান এর মতো জিপ দাঁড়িয়ে, প্রচুর গেরুয়া কাপড়ের ফেস্টুন—বিকেলের কমলা আলোয় কেমন যেন মায়াময় হয়ে আছে।

একবার মনে হল এটা কি পোলিও ইঞ্জেকশন দেওয়ার ভিড়? কই, কোনও বাচ্চা তো চোখে পড়ছে না। তারপরই, একটু এগিয়ে যেতেই দেখলাম—রামদেব-এর যোগ প্রশিক্ষণের আসর। নীরোগ সুস্থ জীবনের কামনায় কত মানুষ কাতারে কাতারে চৈত্র মাসের রৌদ্রকে উপেক্ষা করে অপেক্ষা করছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মরে আসা বিকেলের আলোয় সেই জীবনভিক্ষু মানুষের দীর্ঘ প্রতীক্ষা দেখে বড় কষ্ট হল, বড় মায়া হ'ল। আমার কলকাতার, আমার পশ্চিমবঙ্গের জন্য। যে কটা জীবন সম্প্রতি মরে গেছে শেষ ফাল্গুনের কোনও এক রক্তহোরিখেলায়। এ কি তারই প্রায়শ্চিত্ত?

মহাভারতের সেই গল্পটা মনে পড়ল একঝলক। কূপের মধ্যে নিরলম্ব মানব, ওপরে ভয়াল হস্তী। নিচে বিষধর সর্প, তখনও সেই অন্তিম মুহূর্তে মৌচাক থেকে টপটপ করে ঝরে পড়া মধুর শেষ আস্বাদ নিচ্ছে জিহ্বায়।

জীবনের রং সত্যিই বড় বিচিত্র। কমলা বা লাল—কোনও রঙেই কি তাকে বেঁধে ফেলা যায়?

১ এপ্রিল ২০০৭

গরমকাল এসে গেল।

হারিয়ে যাওয়া কালবৈশাখীর নস্ট্যালজিয়া নিয়ে। প্রায় বিলীন হয়ে যাওয়া লোড শেডিং-এর পুনরাবির্ভাব নিয়ে। গুলি বারুদের গন্ধে, রবীন্দ্রনাথ সত্যজিতের স্মরণসৌরভে।

দোসরা মে, পঁচিশে বৈশাখ বয়ে গেল চিরন্তন নিরন্তরতায়।

কলকাতা থেকে মাত্র একশো কিলোমিটার দূরে সভ্যতার নিত্যবিরচিত শ্মশান থেকে মুখ ফিরিয়ে আমরা ক্ষণেকের জন্য ফিরে তাকালাম সেই পুণ্য আবাহনে।

লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণের জয়গানে যে দুই মহাশিল্পী বাঙালিকে পরম গর্বে মাথা উঁচু করে বাঁচতে শিখিয়েছিলেন, তাঁরা জানলেনও না যে তাঁদের জন্মতিথির প্রাক্কালে তাঁদেরই বড় আদরের বাংলার বুক থেকে কত কত প্রাণ বারুদের ধোঁয়ার আড়ালে টাটা সুমোর ডালা ভরে পাচার হয়ে গেল অন্ধকারের গর্ভে।

সত্যজিতের শেষ ছবি 'আগন্তুক'-এ 'অন্ধজনে দেহ আলো'র প্রথম কলিটুকু গুনগুন করেই ছবির প্রধানপুরুষ বলেন 'কে দেবে আলো? কে দেবে প্রাণ?'

শিল্পীর সেই অতর্কিত দৈববাণী, সেই গভীর হতাশ উচ্চারণকে সফল করে তোলবার জন্য এত তৎপর হয়ে পড়লাম আমরা?

১৪ই মার্চ-এর নন্দীগ্রাম নিধনযজ্ঞের পর একটা স্বতস্ফূর্ত বিদ্রোহের বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল চারপাশের মানচিত্র জুড়ে।

'এই কন্যা কুরুবংশের ধ্বংসের কারণ হবে'—এই আকাশবাণীর সঙ্গে যজ্ঞাগ্নি থেকে যেভাবে উদ্ভূতা হন পূর্ণ যৌবনা কৃষ্ণাঙ্গী পাঞ্চালী, ঠিক সেরকম করেই যেন প্রতিটি সংবেদনশীল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবেকজাগ্রহ হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হয়েছে এক পবিত্র নির্ভীক অগ্নিশিখার মতো।

শাসকের অত্যাচারের সামনে দাঁড়িয়েও দৃপ্ত অনির্বাণ স্ফুলিঙ্গ ঝরে পড়েছে কবিতার ভর্ৎসনা, মিছিলের ধিক্কার, নানা সভা সমাবেশের প্রতিরোধ।

সমস্ত তথ্য আমাদের কাছে নেই। কারণ মহাকাব্যের দিব্যদৃষ্টিকারী রণভাষ্যকার সঞ্জয়রা আজ দ্বিধাবিভক্ত দুই যুযুধান রাজনৈতিক পক্ষে। ফলে, নিরপেক্ষ ধারাবিবরণী আর বোধহয় সম্ভব নয়।

সব সত্যি মিথ্যে আমরা জানি না।

শাসকরা এক কৃত্রিম স্বচ্ছতায় তাঁদের সত্যিটুকু আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, কিন্তু আসলে সে এমনই এক ভারি অন্ধকার পর্দা।—যে তার ওপারে দৃশ্যান্তরের ফাঁকে কখন যে বদলে যাচ্ছে রঙ্গমঞ্চ দৃশ্যপট, আমরা জানতেও পারছি না।

বিরোধীরা তাঁদের মতো করে তথ্য সাজাচ্ছেন। যেহেতু আপাতভাবে আজ তাঁরা অত্যাচারিতের পক্ষে, আমরা তাঁদের বিশ্বাস করছি প্রায় নিজেদের বিবেক দায়ভাগ লঘু করার জন্য।

শাসকরা অন্যায় করছেন। উদ্ধত নিষ্ঠুরতায় নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছেন প্রতিস্পর্ধীদের। কয়েকদিন আগেও সিপিএম কেবলমাত্র দীর্ঘশ্বাস ফেললেই ভস্মীভূত হয়ে যেত যে কোনও বিদ্রোহের অঙ্কুর। আজ ঘটনাটা আর বোধকরি অতটা সুগম, সুরম্য নয়।

রাজ্যপ্রধান কেবল তাঁর রাজনৈতিক দলকর্মীদের দায়িত্ব নিয়েই দায়মুক্ত হতে পারেন না। মানুষের প্রতি, এই রাজ্যের প্রতিটি সুস্থ, স্বাভাবিক, ক্ষীণ, মুমূর্ষু, প্রতিবাদী, শান্ত নিশ্বাস প্রশ্বাসের প্রতিও তাঁর সমান দায়িত্ব আছে।

একথা বহুবার, বহুজন ক্রোধে, ধিক্কারে, যুক্তিতে, আবেগে, মিনতিতে, প্রতিরোধে তাঁকে বুঝিয়েছেন। আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা না হয় আরেকবার করজোড়ে তাঁকে অনুরোধ করতে পারি।

বুদ্ধদেববাবু, আপনি কেবল সিপিএম নেতা নন, আপনি এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। সমস্ত পশ্চিমবঙ্গবাসীর শুভ অশুভ, মঙ্গল অমঙ্গলের দায়িত্ব আমরা একজন নিরাপদ বিশ্বস্ত অভিভাবকের হাতে তুলে দিয়েছি। দয়া করে আমাদের বিশ্বাসভঙ্গ করবেন না।

হিংসার নিরপেক্ষ হিসেবের দায়িত্ব আপনার, আমাদের, সকলের। যাঁরা শাসন করছেন। বা, যাঁরা বিরোধিতা করছেন—সবার।

সম্প্রতি ২৯ এপ্রিল নন্দীগ্রামে দু'জন মারা গেলেন।

নন্দীগ্রামে মৃত্যুসংবাদ পেলেই এ ক'দিন স্বতস্ফূর্ত বিদ্রোহে সজাগ হয়ে উঠছিল মন। শোনা গেল এই দু'জন মৃতকে সিপিএম ক্যাডার বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

ব্যস্! অমনিই যেন স্বস্তির নিশ্বাস। আর প্রতিবাদ করার কোনও দায় রইল না।

সত্যিই জীবন কি তাহলে এত মূল্যহীন? শাসক না বিরোধী—সেই তকমাই কি এখন থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্ধারণ করবে মানবজীবনের পরিণতিমূল্য?

যে কোনও হিংসাই পরিত্যাজ্য—আমরা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি কর্মীরাও যদি এ সত্য বারবার করে নিজেদের কাছেও না মনে করিয়ে দিই, তাহলে একথা আর কে বলবে?

প্রতিবাদের একটা আত্মগরিমা আছে। সেই গরিমার অহংকার আমাদের আচ্ছন্ন করছে না তো?

হঠাৎ করে নিজেদের বুদ্ধিজীবী ঘোষণা করতে একটু কেমন অপ্রস্তুত লাগছে না? মিডিয়া যা বলে বলুক, আমরা কেন নিজেদের বুদ্ধিজীবী বলে ডাকতে শুরু করলাম? কথাটা গালভরা বলে? না, আমাদের যে সহকর্মীরা শাসক পক্ষে কথা বলছেন তাঁদের 'বুদ্ধজীবী' বলে বিদ্রূপ করা যাবে বলে?

মানুষ মাত্রেই বুদ্ধির সাহায্যে জীপনযাপন করেন। তবে এই শৌখিন শ্রেণিভাগ কেন? আমরা কি আমাদের নিজ নিজ শক্তির পরিচয়—লেখক, শিল্পী, কবি, নাট্যকর্মী, চলচ্চিত্রকারের অভিধাগুলোয় আর বিশ্বাস করতে পারছি না?

ঔদ্ধত্যের যোগ্য উত্তর কমনীয়তা। ক্রোধের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়া যায় কেবলমাত্র অপরিসীম শান্ততায়। নিজের বুদ্ধিজীবী বলা তো সেই ঔদ্ধত্যেরই নামান্তর মাত্র!

কৃতী মানুষদের নানা সমস্যা। তাঁদের সৎ উদ্দেশ্যকেও প্রচারলিপ্সা বলে ভুল করা বা ভুল বোঝানো বড় সহজ। তাতে হয়তো যথার্থ সত্যতায় কিছু আসে যায় না। কিন্তু ক্ষতি এটাই যে, একবার যদি সেই অপসত্যটি ভুল করেও ধারণাবদ্ধ হতে আরম্ভ করে, ভবিষ্যতে আমাদের কোনও প্রতিবাদই সৎ বা নিরপেক্ষ বলে মনে হবে না।

নন্দীগ্রাম এখন অনেক অনেক জীবনের মারণভূমি। আমরা যেন সেটাকে আমাদের নাগরিক নিত্যব্যস্ততার অবসরের বিবেকদংশন উপাদানে পরিণত করে না ফেরি।

কমলকুমার মজুমদার একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বলেছিলেন—আমাদের ছেলেরা কবিতা লিখিবে বলিয়া তোমাদের সৈন্যরা দাঁত ছ্যাতরাইয়া পড়িয়া থাকুক।

এমনিতেই কানে আসছে—ও! নন্দীগ্রাম তো এখন ফ্যাশন। আরও চলতি ভাষায় ফ্যাড।

নিজেদের অজান্তে আমরা নন্দীগ্রামকে পশ্চিমবঙ্গের সংবেদনশীল মানুষের অন্তরের উত্তাপের পারদমাত্রা করে ফেলছি না তো?

ভয় করে। এবার পুজোয় আলোকসজ্জায় চন্দননগরের শিল্পীদের হাতে 'নন্দীগ্রাম লাইটিং' দেখতে হবে কি না?

১৩ মে, ২০০৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি এবার কলকাতা আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যাইনি।

আগে নিয়মিত যেতাম। দিনে চারটে করে ছবি দেখতাম। অনেকের সঙ্গে দেখা হত। যাদের সঙ্গে বছরের ওই কটা দিনই দেখা হয়।

ওই ক'দিন নন্দন ছিল আমাদের ঘরবাড়ি। উৎসবের শেষদিন দুপুর থেকে নন্দন চত্বরের গাছগুলোও কেমন যেন শোকে থমথম করত। মনের ভেতরটা আঁধার করে আসত। আমরা ঠাট্টা করে বলতাম 'বিজয়া দশমী।'

কাগজে পড়লাম রীণাদি এবার মার্কেট বিভাগ উদ্বোধনের দায়িত্ব প্রত্যাখ্যান করেছেন।

অনেক এসএমএস পেলাম বয়কট করার আহ্বানে। বক্তব্য একটাই—যে সরকার নন্দীগ্রাম করে, তার ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল করার নৈতিক অধিকার নেই।

কিছু অগ্রজ চলচ্চিত্রকাররা অন্য কথাও বললেন। নন্দীগ্রাম নিন্দনীয়, তবে তার সঙ্গে সিনেমার কোনও সম্পর্ক নেই।

বন্ধুবান্ধবরা একটু দ্বিগাগ্রস্ত। উৎসবে যোগ দিলে অপ্রগতিশীল মনে হতে পারে। আবার একেবারে না গেলে ভাল ছবি দেখার এই বাৎসরিক সুযোগটুকু একেবারে মাঠে মারা যায়। তার ওপর, এ বছর ডেলিগেট পাস-এর চারশো টাকা।

তাহলে কী? চলচ্চিত্রোৎসবে যোগ দিলেই ধরে নেওয়া হবে যে নন্দীগ্রামের নারকীয়তায় সায় আছে?

নিশ্চয়ই নয়। তাহলে?

আসলে আমি তো প্রত্যক্ষ রাজনীতি করিনি কখনও। কোনও গণ আন্দোলনের ইতিহাসের মধ্যেও পারস্পরিকভাবে থাকিনি কোনওদিন। কী করব তবে?

নিজের সঙ্গেই কথা বললাম কিছুক্ষণ। তর্ক করলাম, ঝগড়া করলাম। তারপর মনটা থিতু হল।

ঠিক করে ফেললাম—যাব না। ছবি দেখতে যাব না। সত্যাগ্রহ, ভুখা-হরতাল যদি প্রতিবাদের চেহারা হতে পারে, তাহলে সিনেমাপ্রেমীদের সিনেমা-অনশনটাও প্রতিবাদ। আমি যাব না।

যে জিনিসটাকে সব থেকে ভালবাসি, সেটা যদি ছাড়তে পারি—তবে নিজের কাছেও পরিষ্কার হবে priority কাকে বলে।

আমি 'উৎসর্গ' করার মতো মহৎ কিছু বলছি না। বলছি, এটাই আমার অসহযোগ। আমার বিযুক্তি।

নন্দীগ্রামের সঙ্গে সিনেমার সরাসরি সম্পর্ক কী আমি জানি না। থাকলেও জানি যে,

এটুকু তো জানি যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার নন্দীগ্রামের নৃশংসতার পাশে দাঁড়িয়ে একতরফা একটা রাজনৈতিক দলের পক্ষ নিয়ে 'আমরা এটা করিনি, ওরা এটা করেছে' বলে চলছে অহর্নিশি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনওদিন কি ভাবতে হয়েছে যে গণতান্ত্রিক প্রথায় নির্বাচিত সরকার কখনও কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের কণ্ঠস্বরে কথা বলতে পারে? বিশ্বাস করতে হয়েছে যে সরকারের কাছে 'ওরা-আমরা'র তফাৎ আছে?

এখন হচ্ছে। রোজ দেখতে হচ্ছে, ভাবতে হচ্ছে। ইচ্ছে না থাকলেও বিশ্বাস করতে হচ্ছে।

সাতিঙ্গাবাড়িতে দেড়শো বাড়ি পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে। ধানের গোলা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে দাউদাউ। ফলিডল ঢেলে দেওয়া হয়েছে পুকুরে পুকুরে। কারা করেছে?

সবাই বহিরাগত গুণ্ডা?

আমরা কি ভুলে যাচ্ছি যে একটা লম্বা সময় ধরে গ্রামাঞ্চলের কৃষককে সিপিএম ক্যাডার বানানো হয়েছে। পয়সা বা ক্ষমতার প্রলোভন দেখিয়ে।

এক সময় যাঁরা কৃষক ছিলেন, আজ তাঁদের অধিকাংশই ক্যাডার। এমনই ভয়ঙ্কর এই 'ক্যাডারীকরণ' পদ্ধতি, এমনই সুদীর্ঘ নিষ্ঠুর—যে আজ ধানের গোলায় আগুন দিতে সেই কৃষকক্যাডার-এর এতটুকু হাত কাঁপে না।

সিপিএম এখন ধর্ম। কলকাতায় থাকি, তাই বুঝতে পারি না—গ্রামাঞ্চলে সিপিএম-এর সঙ্গে অ-সিপিএম-এর বিয়ে হয় না।

তাহলে সিনেমাপ্রেমীদের মধ্যেও এই ধর্মাচরণ থাকবে, তাতে আশ্চর্য কী?

জানি না, এবার যদি আমার এই লেখাটা পড়ে বিরক্ত হয়ে সিপিএম (পড়ুন সরকার) আমারই একজন সিনেমা-সহকর্মীকে আদেশ দেন আমার ছবির নেগেটিভটায় আগুন ধরিয়ে দিতে...?

নিষ্ঠুরতার পাশাপাশি নান্দনিকতার উদাহরণ অনেক আছে। জ্বলন্ত রোমের ওপর দাঁড়িয়ে বীণা হাতে নিরো, Concentration Camp-এ গ্যাস চেম্বারের বোতাম ঘোরাতে ঘোরাতে মোৎজার্টের বাজনা।

মনে হত গল্পকথা। এই জীবনে, এত কাছ থেকে সেটা দেখতে হবে ভাবিনি।

যাঁরা পারেন তাঁরা পারেন। আমি পারি না। আমি দারুণ ছবি করিয়ে নই, অপূর্ব সম্পাদক নই, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তান নই।

আমি সাধারণ মানুষ। আমার মধ্যে এখনও কিছু সাদা কালো আছে—সেটা থাক। সেটা হারাতে চাই না আমি। সবকিছু অত ধূসর জটিল করে ফেলার প্রয়োজন নেই আমার।

আমার 'রাজনৈতিক' বিবেক বলে—যারা নন্দীগ্রাম করে তাদের ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল করবার অধিকার নেই।

আমি সরকারের থেকে আমার বিবেককে বেশি বিশ্বাস করি।

আপনাদেরও করতে হবে বলছি না।

শুধু খবরটা দিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি এবার কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যাইনি।
এবং সেটা নন্দীগ্রামের প্রতিবাদে।

১৮ নভেম্বর ২০০৭

চোদ্দই নভেম্বর-এর মিছিলে অনেকেই ছিলাম আমরা।
পশ্চিমবঙ্গের অনেক-মানুষ।

মিছিলের মধ্যেই ভেসে আসছিল টুকরো টুকরো কথা।

অল্পবয়সী ছেলেদের একটা দল। 'ধিক্কার' ব্যাজ বুকে এঁটে এগিয়ে যেতে যেতে একে অপরকে বলছে,

—বাবলু, ২৪ ঘণ্টা সব তুলে রাখছে কিন্তু। তারপর দেখবি তোকে দেখিয়েই বলবে—ওই তো মাওবাদী! মিছিলে হেঁটেছিল।

অন্য আরেকটি দল। তাদের মধ্যেও ফিসফাস আলোচনা।

—এই যে সব ক্যামেরা দেখছিস, ভুলেও ভেবো না মামা, এরা সবাই স্টার আনন্দ-টানন্দ। এ স-ব সিপিএম-এর ক্যামেরা। কে কে মিছিলে হেঁটেছে, পুরো রেকর্ড করে রাখছে। এরপর এরিয়া ধরে ধরে সিডি চলে যাবে সব পার্টি অফিসে। বলবে, এর মধ্যে কে কে তোমার পাড়ার, তুলে এনে ক্যালাও।

আলোচনাগুলো যারা করছিল মনে হ'ল না তারা রাজনীতি করে। বা রাজনীতির মধ্যে থাকতে চায়। কিন্তু বর্তমান রাজনীতির একটা দিক সম্পর্কে দেখলাম সবাই বেশ ওয়াকিবহাল এবং সতর্ক। সেটা, রাষ্ট্রের সন্ত্রাস।

আমি একটা প্রতিবাদী মিছিলে হাঁটলে সরকার আমাকে ঠ্যাঙাবে—এই ধারণাটা কেমন যেন বিশ্বাসযোগ্যভাবে গেড়ে বসে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনে।

যে বন্ধুবান্ধবরা প্রতিবাদী লেখা লিখছিল, শুনলাম কয়েকজন সিপিএম কর্মী তাদের ফোন করে জানিয়েছেন যে লেখাগুলো তাঁদের ভাল লেগেছে।

আমি তো বোকার মরণ!

—দ্যাখ তো, তার মানে, ভাল লাগছে বলেই তো বলেছে। সেদিক থেকে তো উদার বলতে হবে।

একজন অল্পবয়সী বন্ধু বলল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—তুমিও পারো ঋতুদা। আপনার লেখা ভাল লেগেছে মানেটা বুঝলে না?

—হ্যাঁ। ভাল লেগেছে লেখাটা, আবার কী?

—ধ্যাৎ। 'আপনার লেখা ভাল লেগেছে মানে আসলে হল আমরা কিন্তু লেখাটা পড়েছি—আপনাকে চিনে রাখলাম।'

হয়তো মিছিলের আলোচনাটা অমূলক আশঙ্কাভিত্তিক।

প্রতিবাদী লেখা পড়ে সিপিএম কর্মীর মন্তব্যটা যথার্থভাবে প্রশংসাত্মক। আমার ক্ষুদে বন্ধু অযথা সন্দেহ করছে।

কিন্তু কোথা থেকে এল এত সন্দেহ, এত অবিশ্বাস!

যে রাষ্ট্র, আমাদের নিজেদের নির্বাচিত সুহৃদদের হাতে একদিন তুলে দিয়েছিলাম আমরা, তাদের শুভ্র আদ্দির পোশাকের গায়ে কখন যেন একটা খাকি রঙের অদৃশ্য উর্দি চেপে বসেছে—তার হয়তো ছবি উঠছে না, কিন্তু দেখতে তো পাচ্ছি অনেকেই।

অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর মতে—

'যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা'—কথাটা যদি তর্কের খাতিরে মেনেও নিই, এটাই হয়তো সত্যি যে দৃষ্টিহীন মানুষের মতোই আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি আজ অনেক বেশি সক্রিয় ও প্রখর। ফলে ঘাড়ের কাছে ক্রোধের নিশ্বাসটুকু মৃদু হলেও আর উপেক্ষা করতে পারছি না।

আমাদের এবারের সংখ্যার বিষয়—রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস।

নন্দীগ্রামের সাম্প্রতিক ঘটনার পর এত তাড়াতাড়ি একটা গোটা সংখ্যা প্রস্তুত করতে ভেবেছিলাম। বেশ বেগ পেতে হবে। সহযোগিতা যে এত স্বতস্ফূর্তভাবে আসবে, ভাবিনি। সবাই নিজের নিজের ব্যস্ততার মধ্যে ঠিক সময় বের করলেন।

এখন মনে হচ্ছে, আপনারা সবাই চাইলে, এই বিষয়টা রোববার-এর একটা নিয়মিত বিভাগ হতে পারে।

আমাদের প্রতিবাদ যদি সচেতন অরাজনৈতিক সাধারণ মানুষের জায়গা থেকে হয়, তাহলে এই বিভাগটা আপনাদের সবার।

কেবলমাত্র পরিচিত শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের নয়।

তাঁদের পাশাপাশি আপনারাও লেখা পাঠান। কিংবা ছবি—আঁকা বা তোলা। যা দিয়ে আপনি আপনার মতো করে এই সন্ত্রাসের চেহারা দেখেছেন এবং দেখাতে চান।

সঠিক নামপ্রকাশে অনেকের অনিচ্ছা থাকতে পারে। তার মানে এই নয় আমরা আপনাকে অসাহসী ভাবব।

সন্ত্রাসের কথাটা কে বললেন সেটা জরুরি, কিন্তু তার থেকেও অনেক বেশি জরুরি এটা বলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে কীভাবে এই সন্ত্রাস আমাদের আলো, বাতাস, সূর্যালোক, জ্যোৎস্নাকে ঢেকে দিচ্ছে গাঢ়, ঘন, ভারি অন্ধকারে।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ঠিক যেখান থেকে জীবনানন্দকে মনে পড়ে—আমি, বেশি দূর নয়, কেবল একটি পংক্তি পিছিয়ে যাব—অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ'—একা দাঁড়িয়ে থাকলে যে কোনও অন্ধকারও নিকষ, নিশ্চল প্রাচীরের মতো মনে হয়।

পাশাপাশি কয়েকটা হাত ধরা থাকলে কখন যেন দেওয়াল ফুঁড়ে সুড়ঙ্গপথ বেরিয়ে আসে—অপরপ্রান্ত থেকে উঁকি মারে আলোর উৎসমুখ।

'আমরা তো তিমিরবিনাশী
হতে চাই।
আমরা তো তিমিরবিনাশী।'

২৫ নভেম্বর ২০০৭

AMARBOI.COM

বইল ঝোলা, চলল ভোলা
বলল রতন টা-টা
আমরা নাচি ঢাকের তালে, মোদের সুকান কাটা
দিদি নাচে সালসা নাচন ভাগ্নে মদন সাথে,
মা গো মোদের যাসে নে ফেলে ভূতের বিজয়াতে
মা বললেন মুচকি হেসে, ভয় পাচ্ছিস কেন?
আর বছরে দেখা হবে আসব চড়ে ন্যানো

বিজয়ার প্রীতি-শুভেচ্ছা চালাচালির ভিড়ে এই ধরনের ছড়া সম্প্রতি এসএমএস বা ই-মেল'এ অনেকেই হয়তো পাচ্ছেন।

আমার কয়েক জন পরিচিত বন্ধুবান্ধব, যাঁরা সাধারণত আমাকে নানা ধরনের উপভোগ্য, আনন্দদায়ক, সুস্থ-কৌতুকপূর্ণ খবর, চিঠি বা ঘটনা, ফরোয়ার্ড করেন এসএমএস বা মেল-এ, তাঁদেরই কয়েক জনের কাছ থেকে এটা এল। সম্প্রতি।

তাঁদের মধ্যে একজন বন্ধু—অঞ্জনা বসু। অঞ্জনা লেখক। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, যথেষ্ট ওয়াকিবহাল, খবরাখবর রাখে। আমার থেকে অনেক বেশি খুঁটিয়ে খবরের কাগজ পড়ে, টেলিভিশন দেখে। দেশ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাল, ঘটনা কোনও কিছু সম্পর্কেই অজ্ঞ বা নিস্পৃহ নয়।

অঞ্জনা কবিতাটা ফরোয়ার্ড করেছে An Ode to Bengal বলে। তলায় লিখেছে—Enjoy.

অঞ্জনা বহুদিনের বন্ধু। ফলে এটা যদি বিদ্রূপাত্মক ভাবে লিখত, আমি বুঝতে পারতাম ঠিক। কিন্তু অঞ্জনাও এটাকে নির্মল কৌতুকপাঠ মনে করেছে। আমাকেও মনে করতে বলেছে—ওর মেল থেকে অন্তত তাই মনে হল।

টাটাদের সিঙ্গুর থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে নেওয়া নিশ্চয় সাম্প্রতিক কালের পশ্চিমবঙ্গে একটি অত্যন্ত বড় ঘটনা।

যে কোনও ঘটনা মানুষের কাছ থেকে যেমন নানা প্রতিক্রিয়া আদায় করে নেয়—সমর্থন, অসমর্থন বা তীব্র বিদ্বেষ, এই ঘটনার পরিণতি তেমনই হতে পারত।

অন্তত আমরা গণতান্ত্রিক ভাবে তাই আশা করেছিলাম।

কিন্তু দেখা গেল যে, প্রতিক্রিয়া যেটা তৈরি হল জনমানসে (আমি প্রধানত কলকাতা শহরের কথা বলছি, বাইরের শহর, এমনকী বাংলার গ্রামের কারও সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলবার সুযোগ হয়নি আমার) সেটা তীব্র বিদ্বেষের, আক্ষেপের, এবং কঠোর সমালোচনার, যার বটম লাইন,

—একজন মতিচ্ছন্ন মহিলার গোঁয়ার্তুমিতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে উন্নয়নের এত বড় একটা সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল।

AMARBOI.COM

প্রথম, আজ থেকে প্রায় দু'বছর আগে, যখন সিঙ্গুর নিয়ে লিখতে শুরু করি, তখন একবার লিখেছিলাম যে, সিঙ্গুরের লড়াইটা সিঙ্গুরের মানুষের; তাকে নেতৃত্ব দেওয়ার আমরা কেউ নই।

এটাকে বুদ্ধদেব-মমতার ক্ষমতা বা জনপ্রিয়তা দখলের লড়াই থেকে সরিয়ে এনে দেখতে পারলে, সভ্যতার একটা সংকট হিসেবে এর দিকে তাকাতে পারলে, তবেই কিছুটা সুবিচার হয়তো আমরা মনে মনে হলেও করতে পারতাম।

দু'বছর আগে সিঙ্গুর নিয়ে যখন এসপ্ল্যানেড ইস্ট-এর ধরনা মঞ্চে বসেছিলেন বিরোধী নেত্রী, তখন কলকাতার মানুষজন মনে মনে কিছুটা সমর্থন করেছিলেন কি না জানি না, কিন্তু কোনও দায়িত্বই যে নিচ্ছেলেন না বেশির ভাগ মানুষ—সেইটা বোঝা যাচ্ছিল, অফিস যাওয়ার পথে বা এসপ্ল্যানেড দিয়ে চলাফেরার সময় একবার ধরনা মঞ্চের দিকে উৎসুক ভাবে তাকাতেন।

—আজ কে এল? কবীর সুমন নাকি গোপালকৃষ্ণ গান্ধি। ব্যাস!

প্রতিক্রিয়াটা কৌতূহলের আর একটা 'কী-হবে-দেখা-যাক' টাইপের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার মধ্যে এমন কথাও শুনেছি—সত্যি কিন্তু এই বামফ্রন্টের এবার বড্ড বাড় বেড়েছে।

যদি কলকাতা শহরের জনমানস, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ জনতার রাজনৈতিক মনোভাবের কোনওরকম নির্ণায়ক হয়, তা হলে মোদ্দা ব্যাপারটা বোধহয় এইরকম যে,

—মমতা ছাড়া বিরোধিতা করার কেউ নেই, আর মমতা আছেন বলেই এই বিরোধিতা কোথাও পৌঁছবে না।

এরকম স্বভাবসিদ্ধ নৈরাশ্য আমরা আগেও বহুবার দেখিয়েছি এবং 'রাজনীতি আসলে বড় কঠিন জিনিস, বড় প্যাঁচালো—এর মধ্যে ঢুকে লাভ নেই' বলে অবলীলায় আমাদের অনেক স্বাভাবিক সামাজিক দাবিকে রাজনীতির যূপকাষ্ঠে নিবেদন করে দিব্যি অফিস-কাছারি-সিনেমা-থিয়েটার-শপিং মল করে বেড়িয়েছি।

উত্তর-টাটাপ্রস্থান পর্বে সমগ্র বাংলা জুড়ে তীব্র মমতা-ধিক্কার চলল।

আমরা সবাই বললাম,

—ইস! গামবাট কাকে বলে! এই করলে আর পশ্চিমবঙ্গের কিছু হয়েছে!

AMARBOI.COM

হয়তো অত্যন্ত সৎ-প্রতিক্রিয়া। কিন্তু বঙ্গপ্রেমের আবেগ আর বিভিন্ন ঘটনা-সংঘাতের যুক্তিকে পাশাপাশি দাঁড় করালে আবেগের পাল্লাটা ভারি ঠেকছে না কি?

বাঙালি আবেগপ্রবণ। সে ভাবেই আমরা নিজেদের চিনি, ভালওবাসি। কিন্তু যে যুক্তির কষ্ঠিপাথরে ঘষা খেয়ে আবেগ 'বোধ' হয়ে ওঠে—সেই পদ্ধতিটা আমাদের অনকের কাছেই সহজগ্রাহ্য নয় বোধহয়।

ন্যানো মানেই উন্নয়ন—এ কথাটা যেন আমরা স্বভাবসিদ্ধ ভাবে ধরেই নিয়েছিলাম।

ছোট গাড়ি মানেই যে মাথাপিছু পেট্রোলের খরচা ব্যবহার বেড়ে যাওয়া, প্রায় একই পেট্রোল খরচা করে অনেক অল্পসংখ্যক মানুষ সেই গাড়িতে চড়বেন—এটার আঘাত যে পুরো পশ্চিমবঙ্গের ওপর কেমন করে ঘনিয়ে আসতে পারে অদূর ভবিষ্যতে, সেটা আমরা কেউ ভেবে দেখিনি। যেন দেখার কথাও ছিল না—এ কথা পণ্ডিতরা ভাববেন। আমরা কেন?

আমি আমেরিকায় লস এঞ্জেলেস-এ দেখেছি বড় বড় ফ্রি-ওয়েগুলোয় আলাদা লেন করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে। যাঁরা গাড়িতে একাধিক প্যাসেঞ্জার নিয়ে যান, তাঁরাই কেবল সেই ফাঁকা বিশেষ লেন-এর সুবিধে পান। অর্থাৎ, মাথাপিছু পেট্রোল উপভোগ কমানোর জন্য একটা প্রশাসনিক ইনসেনটিভ আছে।

যাক সে কথা! আমরা না আদার ব্যাপারী...

কৃষিজমি আঁকড়ে রাখার আন্দোলনটা যে আদতে অর্থহীন, তার কতগুলো টুকরো টুকরো বিশ্লেষণ পেলাম।

সাগর, আমাদের বয়ঃকনিষ্ঠ বন্ধু, একটি বিদেশি বিমানসংস্থায় কাজ করে, বলল—

দেখলে না টিভি'তে, চাষির ছেলেরা বলছে, আমরা চাষ করতে চাই না। আমরা কারখানায় যেতে চাই।

আমি সাগরকে বললাম,

—এটা তো এরকম হল যে, আমি বাংলা সিনেমা দেখতে চাই না, হিন্দি সিনেমা দেখতে চাই।

এটা পুরোটাই প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের ছেলে ক্ষত্রিয়? বর্ণাশ্রম জন্মগত, না কর্মোপার্জিত? এই দ্বন্দ্বাত তো ভারতসভ্যতার আদি সমস্যা।

আর কোনও একজন কৃষকসন্তান কৃষিকাজ করতে চান না বলে কৃষিজমির উপকারিতা বা প্রয়োজনীয়তা লুপ্ত হয়ে যাবে, এ কথা কে বলছে!

সিঙ্গুরে মমতার সাম্প্রতিক লাগাতার ধরনার ফলে আমাদের প্রভূত অসুবিধে হল। রাজ্যজুড়ে ট্রাকের লাইন, কলকাতার প্রবেশপথ অবরুদ্ধ, যানজট, দুর্ভোগ—কই সাধারণ মানুষের এত অসুবিধে দেখে তো রাজ্য সরকার ১৪৪ ধারা জারি করেননি—যে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অসুবিধে হচ্ছে, এখানে কোনও জমায়েত হবে না।

তাতে কি সরকারের জনপ্রিতা কমত?

মনে হয় না।

কিন্তু মমতাকে বাড়তে দেবার, প্রগতিবিরোধী করে দেখানোর সুযোগটা হয়তো এত ফলাও করে ব্যবহার করা যেত না।

টাটা চলে গেল। পশ্চিমবঙ্গের মুখে কলা দেখিয়ে, টাটা চলে গেল। আমরা বিমর্ষ— এ পোড়া বাংলায় আর কী হবে?

চলে গেছে তো অনেকেই।

লিপটন, ব্রুক বন্ড, বাটা, জি কে ডব্লিউ, সুলেখা—সবাই চলে গেছে। তখন তো মমতা ছিলেন না। বামফ্রন্ট ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কই, আমরা তো যবাই মিলে দুঃখ পাইনি। একবারও বলিনি, উন্নয়নের প্রদীপ একে একে নিভছে।

'নৌকাডুবি'র লোকেশন দেখতে গিয়ে চোখে পড়ল গঙ্গার ধারে সার বেঁধে বন্ধ-কারখানা।

আমরা কাঁদছি না তো!

আমরা টাটা'র দেওয়া ফুল পেজ বিজ্ঞাপন পড়েছি, আর ভাবছি, এই তো রতন টাটা কেমন চমৎকার প্রাঞ্জল করে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন, বামফ্রন্ট-ই আমাদের ত্রাতা।

এসএমএস'এ গণকবিতা পেতে আমি পছন্দ করি না।

পুজোর আগে বা পরে, এই যে অজস্র এসএমএস কবি'র উদয় হয়, 'শরতের বাতাসে দুলিছে বাতাস দুলিতেছে কাশ' ইত্যাদি বলে, নেহাত-ই ভদ্রতাবশত চুপ করে থাকি, বেশির ভাগ সময় মিলিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে, —এবার গালে মারব ঠাস ঠাস।

টাটা'র বিজ্ঞাপনটা দেখে এই প্রথম আমার একটা কবিতার অংশ এসএমএস করতে ইচ্ছে করেছিল সবাইকে—

বণিকের মানদণ্ড পোহাইলে শর্বরী
দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে।

AMARBOI.COM

পুনঃ—অনেকেরই হয়তো মনে হচ্ছে, আমি তৃণমূলের হয়ে লিখছি, টাকা খেয়ে। তাঁরা বরং এক কাজ করুন—আজ দুপুরে বেশি করে ভাত খান।

১৬ নভেম্বর, ২০০৮

এক

বিশু মানে আমাদের বাড়ির বিশ্বনাথ মণ্ডল। ওর বাড়ি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়। আমাদের বাড়িতে রয়েছে গত পাঁচ বছর প্রায়। ১২ তারিখ থেকে ঢল নামিয়ে যখন বাড়ির সব গৃহকর্মী সদস্যরা দেশে চলল ভোট দিতে, বিশুকে জিজ্ঞেস করলাম,

কি রে! তুই যাবি না?

না, আমার এবার নাম নেই, দাদা। কার্ড হয়নি।

কার্ড হয়নি আর নাম নেই যে দু'টো আলাদা জিনিস, সেটা বিশুকে বোঝানো একটু কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ। বললাম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—তা হলে এই ভোটটা মিটে গেলে করিয়ে নে।

তাপসের বাড়ি আজাদগড়ে। ভোট দিয়ে ফিরে এল দুপুর নাগাদ।

গোবিন্দর বাড়ি ক্যানিং। ওর পক্ষে সেদিন ফেরা সম্ভব ছিল না। এল পরদিন সকালে।

সাধারণত আমার কারও একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে তেমন তীব্র কোনও কৌতূহল থাকে না, তবু এইবার, এই লোকসভা নির্বাচনের ভোটদানে—'কে কাকে ভোট দিল'-র মৌলিক প্রশ্নটা বারবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল।

প্রশ্ন না বলে কৌতূহল বলাই ভাল। তবু, নিজেকে কঠোর ভাবে সংযত করলাম। না—ভোট না ব্যক্তিগত এবং ফলত গোপনীয়! আমার গণতান্ত্রিক ভদ্রতায় বাধল যেন কোথাও।

বাবার ভোট নিয়ে কোনও সংশয় ছিল না। স্মৃতি যত দূর সাঁতরাতে পারে, সেটা যদি ভরা বর্ষার মেঘনার এপার ওপার-ও হয়, বাবাকে কোনও দিন সিপিএম ছাড়া ভোট দিতে দেখিনি। দেখব, কল্পনাও করতে পারি না।

এই যে চারদিকে 'পরিবর্তন চাই' বলে শোরগোল উঠল ভোটের আগে, বাবার কাছে মনে মনে সেই পরিবর্তনটার চূড়ান্ত নাম হল সিপিএম। যারা কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গকে পরিবর্তন দেখিয়েছিল।

হতে পারে, দেশভাগে ভিটেমাটি উচ্ছিন্ন হয়ে এই বাংলায় চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে সেদিনের কৈশোর ছাড়ানো তরুণ, আমার বাবা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল নেহরু-গান্ধীর উচ্চবিত্ত রাজনীতি সম্পর্কে এক উদ্যগ্র অবুঝ অভিমান।

স্থান পরিবর্তন-ও পরিবর্তন। কিন্তু ভিটেমাটি ত্যাগ করে আসা, আর নতুন জায়গায় পা রাখা এক নয়। এই পরিবর্তনের মধ্যে একটা বাধ্যতামূলকতার বেদনা আছে।

হয়তো বা, সেই সময় নীচুতলার মানুষের স্বপ্ন দেখার যে অমোঘ প্রভাতসূর্য-রঙা পার্টি, তাকেই অজান্তে আঁকড়ে ধরেছিল বাবা। আরও অনেক অনেক মানুষের মতো।

সেটাই বোধহয় বাবার জীবনে, বাবার সামাজিক-রাজনৈতিক চেতনায় সব থেকে বড় পরিবর্তন।

যেটা আজও মনে মনে অপরিবর্তিত থেকে গেছে।

দুই

ভোট হয়ে গেল। আমরা বাপ-বেটা গিয়ে ভোট দিয়ে এলাম। কাগজে আবার তার ছবিও বেরলো।

আমি ক্ষণেকের তরেও বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম না,

—বাবা, তুমি কি এবারও সিপিএম-কে ভোট দিলে?

আমি জানি আমার নাস্তিক বাবার একটাই ধর্ম। সিপিএম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর বাবা, আমার সাম্প্রতিক কালের 'ফার্স্ট পার্সন'-গুলো পড়তে পড়তে নিশ্চয়ই ভাবত যে আমার এই বৎসরাধিকালীন সিপিএম-বিরোধিতা নিশ্চয়ই আমার অনেকগুলো হুজুগের মতোই একটা।

যেদিন খামোকা ন্যাড়া মাথা নিয়ে ঘুরে না বেড়িয়ে আবার সুস্থ মানুষের মতো চুল রাখতে আরম্ভ করব, সেদিন আমার এই 'অ্যান্টি সিপিএম বাই' চলে যাবে।

ফলে, বাবাও আমায়, এবারও এই বলে বোঝাবার চেষ্টা করল না,

—বিরোধী বলতে আছেটা কে যে ভোট দেবে তাকে?

আমরা বাপ-ছেলে বাড়ি ফিরে এলাম। তারপর একটা সময়ের পর কে কাকে ভোট দিয়েছি, এই কাল্পনিক দ্বৈরথ ঘুচেও গেল।

কেবল খাবার টেবিলে খাবার বেড়ে দেবার সময় আমি বাবার, আর বাবা আমার ভোটের বেগুনি কালির ছোপটার দিকে তাকিয়ে ক্ষণেকের জন্য থমকালাম।

তিন

আজ সকাল থেকে ভোট গণনা শুরু। বিশু, তাপস, গোবিন্দ, প্রদীপ—সবাই বাড়িতে।

আমি চিত্রনাট্যের কাজ করছিলাম। হঠাৎ খেয়াল হল—আজ তো রেজাল্ট।

AMARBOI.COM

বিশুকে ডেকে বললাম,

—টিভিটা চালা তো রে।

তখন বেলা এগারোটা।

বিশু ঘর থেকে বেরোবার আগে একটা সদর্প ঘোষণা করল

—তৃণমূল সতেরোটা।

টিভির কোনও চ্যানেলেই মন থিতু হচ্ছে না। সংখ্যাগুলো ক্রমশ বদলাচ্ছে। বাড়ছে বা কমছে। অতএব বেশির ভাগটাই প্রোজেকশন, খবর নয়।

বিশুদের ডেকে বললাম,

—তোরা তো টিভি দেখছিস। আমায় মাঝে-মাঝে খবর দিস।

পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর এক একজন পালা করে এসে খবর দিয়ে গেল আমায়। সতেরো, আঠেরো, উনিশ...।

ধীরে ধীরে খবর দেখার দ্রুততা বাড়ছে। অস্থির উত্তেজনার আনন্দ দেখতে পাচ্ছি ওদের রগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিমধ্যে সমানে বেজে চলেছে মোবাইল-এর এসএমএস ঘণ্টি। চেনা, অচেনা নানা মানুষ অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

কাকে অভিনন্দন? আমি কে? আমি না কোনও রাজনৈতিক দলের, না আমি ভোটে দাঁড়িয়েছিলাম, জিতেছি!

তারপর বুঝলাম যে, এ অভিনন্দন সবার সবাকার জন্য। সত্যিই যে ভেতর থেকে চাইলে যে কোনও অচলায়তনেও ফাটল ধরে, সব ক'টা হাত এসে জমা হলে অনেক মসৃণ হয়ে যায় রথের রশি—এ খবরটাই এসএমএস মারফত পৌঁছচ্ছে জনে-জনে। এটা ভেতরে লুকিয়ে থাকা, পাথর-চাপা এক প্রস্রবণের মুখ খুলে যাবার অভিনন্দন।

যে-ভবিতব্যকে অবধারিত বলে মেনে এসেছি সবাই এতকাল, সেও যে কেবল আমাদের হাতের ঠেলাতেই নড়েচড়ে উঠতে পারে, নিজের কব্জির সেই জোরটাকে অভিনন্দন। আমি সেই অগুন্তি কব্জির একজন মাত্র।

ততক্ষণে 'রোববার' দপ্তর থেকে ফোন এল। কভার স্টোরি বদলাব কি না? অনিন্দ্য আর সৃঞ্জয় ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেলেছে।

অতএব আমার একটা 'ফার্স্ট পার্সন' দরকার।

ফোনে ওদের গলা শুনে মনে হল অফিসে বেশ একটা উৎসবের হাওয়া। খামোকা আমিই বা বাদ পড়ি কেন তার থেকে?

বিশুকে ডেকে বললাম,

—অফিস যাব। গোবিন্দকে গাড়ি বের করতে বল।

এবার দেখলাম বিশুর কপালে সবুজ আবিরের টিপ।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে যতক্ষণে গাড়িতে উঠলাম, ততক্ষণে সবার কপালেই সবুজ টিকা পৌঁছে গিয়েছে।

চার

বাবার সঙ্গে আর তাড়াহুড়োয় দেখা হল না।

এখন ক'দিন বাবার সঙ্গে এ নিয়ে কথা না বলাই ভাল।

অন্তর থেকে যাকে চূড়ান্ত পরিবর্তন বলে জেনে এসেছে মানুষটা, যে পরিবর্তনের স্থিতিতে বিশ্বাস করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে গত বত্রিশ বছর, তাকে কী বলে বোঝাব,

—এটা পরিবর্তন ছিল না, বাবা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবর্তন কায়েম করে না। পরিবর্তন বদল আনে। আর সেই বদলের নাম কেবল ফ্লাইওভার আর মাল্টিপ্লেক্স নয়, সেখানে তোমার ছেলের ছবি দেখানো হলেও নয়।

কথা হল বাবাকে হয়তো কোনওদিন না কোনওদিন এ নিয়ে কিছু বলা হবে।

কিন্তু যাঁরা 'উন্নয়ন' বলে একটা গালভারি অন্তঃসারশূন্য শব্দকে এতদিন পরিবর্তন বলে চালাতে চাইছিলেন, তাঁরা কি আমার বাবার মতো, প্রায় অবুঝভাবে হলেও, আজও সেই প্রভাতসূর্য-রঙা নিশানটার দিকে তাকান?

না, উন্নয়নের আফিমে তাঁদের ঘুম ভাঙতে দেরি হচ্ছে আজকাল?

২৪ মে, ২০০৯

কোথা থেকে যেন একটা ফিরছিলাম। বা, যাচ্ছিলাম কোথাও। ট্রেনে চেপে, সবাই মিলে। বাবা, মা, ভাই, আমি।

ভোরের দিকে ঘুম ভেঙে গিয়েছে। দেখি ট্রেন দাঁড়িয়ে। আর বাবা আগেই উঠে পড়েছে, জানলার বাইরে তাকিয়ে বসে।

ছেলেবেলায় যতক্ষণ ট্রেন চলত, চলত। থামলেই মনে হত পৌঁছে গেলাম বুঝি। যেন আমার গন্তব্যে যাওয়ার জন্যই ট্রেন তার চলা শুরু করেছে।

স্বাভাবিক ভাবেই ঘুমজড়ানো গলায় জিগ্যেস করলাম বাবাকে,

—পৌঁছে গিয়েছি?

বাবা বলল,

—ওঠো, তাকাও জানলার বাইরে।

আমি উঠে বসে তাকাই। কুয়াশার মধ্যে চা-ওয়ালা, লাল জামা কুলি, আর মাফলার জড়ানো নানা মানুষ।

বাবা জিগ্যেস করল,

—নামটা পড়েছ স্টেশনটার?

চশমা বের করলাম বালিশের তলা থেকে। চোখে লাগিয়ে জানলার বাইরে তাকালাম।

কালো বর্ডার দেওয়া হলদে সাইনপোস্টের গায়ে ইংরেজি আর হিন্দি ভাষায় জ্বলজ্বল করছে একটা নাম। ঠিক যেন বইয়ের পাতা থেকে উঠে আসা। অযোধ্যা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চকচক করে উঠল আমার চশমা-পরা চোখ দু'টো।

এই অযোধ্যা? আমার রামায়ণের দেশ? আমার মহাকাব্যের সিংহদ্বার?

ট্রেন ছেড়ে দিল। আর আমি ঠায় জানলার বাইরে তাকিয়ে তাকিয়ে খুঁজতে লাগলাম আমার সেই পুরাণপ্রান্তর।

এবার বুঝি দেখতে পাব সরযূ নদী। নিশ্চয়ই তার পাশেই সেই অন্ধমুনির তপোভূমি, সেই নদীতে জল ভরতে এসেই না শরবিদ্ধ হয়েছিল অন্ধমুনির সন্তান।

কোন জঙ্গল, রাজপথ পার হয়ে বিশ্বামিত্রের পিছু পিছু তির-ধনুক হাতে গিয়েছিল দুই বালক? এই জঙ্গলেই কি বাস করত ভয়ংকরী তাড়কা?

রাম-লক্ষ্মণ যখন বনবাসে যাচ্ছেন, ভরত তখন মাতুলালয়ে। ফিরে এসে খবর পেলেন রাম, লক্ষ্মণ, সীতা নির্বাসনে। তারপর রামের পাদুকা স্থাপন করে ছদ্ম-রাজা হয়ে কাটিয়ে দিলেন নন্দীগ্রামে বনবাসের চোদ্দ বছর।

কত দূরে ছিল এই নন্দীগ্রাম, যেখানে বসে অযোধ্যানগরীর কর্মভার পরিচালনা করতেন ভরত—নিশ্চয়ই তেমন দূরে হবে না। তবে কি ট্রেনের জানলায় সেটিও ধরা পড়বে?

এই স্মৃতিচারণ করতেই করতেই হঠাৎ মনে হচ্ছে—ওগো মূঢ় বালক। কীসের দূরত্ব খুঁজছিলি তুই!

এ তো কেবল ভূগোলের দূরত্ব আর বড়জোর দু'টো তারিখের দূরত্ব। ছ ডিসেম্বর আর ১৪ মার্চ।

অযোধ্যা আর নন্দীগ্রাম—আজ কলঙ্কনিন্দিত তারিখ দু'টো নিয়েই ভারতবর্ষে বর্বরতার প্রতিবেশী। ভূগোলের দূরত্ব দিয়ে তার হিসেব করার দরকার নেই।

দু'টো নামই ধর্মান্ধ ক'জন রাজ-অনুচরের কুকীর্তির সাক্ষী।

একটা ধর্ম যদি হয় হিন্দুত্ব, অন্যটার নাম আর নতুন করে বলবার প্রয়োজন আছে কি?

৬ ডিসেম্বর, ২০০৯

পশ্চিমবাংলার পুরভোট হয়ে গেল।

শিগগিরই, আমাদের নতুন মেয়র নির্বাচিত হবেন।

মেয়র কথাটার সঙ্গে আমি কিছুতেই কেন যেন, এখনও, খবর কাগজের কোনও সংবাদের টুকরোকে মেলাতে পারি না। পারি না কোনও রক্তমাংস মানুষের ছবিকে।

মেয়র কথাটা আমার কাছে এখনও ছোটবেলায় ইংরেজি গল্প কবিতার একটা শব্দ।

সে 'মেয়র অফ ক্যাস্টারব্রীজ'ই হোক, বা 'হ্যামেলিনের বাঁশিওয়ালা'-র দীর্ঘ কবিতাই হোক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বহু বছর আগে, সবে কলেজে ঢুকব, বা ঢুকেছি। একদিন সুরেন ব্যানার্জি রোডের বিশাল ওই লাল বাড়িটায় গিয়েছিলাম কারওর সঙ্গে। অলিগলি দিয়ে চলা একটা ভুলভুলাইয়া। বড় বড় বারান্দা, এবাঁক ওবাঁক দিয়ে কোথায় হারিয়ে গিয়েছি।

আর একতলা, দোতলায়, নর্দমার ঝাঁঝরির কোণে বড় বড় ইঁদুর নির্ভয় ঘুরে বেড়াচ্ছে। দিনের আলোয়। অত লোকের মাঝখানে। মনে হয়েছিল, সত্যি যদি এই বাড়িটা মেয়রের শাসনাধীন হয়, তিনি কি পারেন না কোনও এক অচিন বাঁশিওয়ালাকে ডেকে এনে এই বাড়িটাকে সম্পূর্ণভাবে মূষিকমুক্ত করতে? ভাবতে অবাক লাগছিল, সুরেন ব্যানার্জি রোডের সব গাড়ি থেমে গিয়েছে। এসপ্ল্যানেড স্তব্ধ প্রায়—কেবল তারই মধ্যে দিয়ে বাঁশি বাজাতে বাজাতে এগিয়ে চলেছে এক বিচিত্রবেশ বাঁশিওয়ালা। আর তার পিছন পিছন সারি বেঁধে ইঁদুরের দল।

ধীরে ধীরে তার দল ভারি হচ্ছে। কার্জন পার্ক থেকে অন্য ইঁদুরের দল মিশে যাচ্ছে এসে তাদের সঙ্গে। কলকাতা শহরের সমস্ত ইঁদুর বাড়ি ঘর, উঠোন, নর্দমা ফেলে দৌড়ে আসছে বাঁশির টানে।

তারপর আবার সব স্বাভাবিক। বাস, ট্রাম চলছে নিজের মতো। কলকাতার জনজীবন পরিচ্ছন্ন। ছিমছাম।

তারপর হয়তো আবার একদিন ফিরে এল সেই বাঁশিওয়ালা। তার বকেয়া বুঝে নিতে। মেয়রের দ্বাররক্ষীরা আটকাল অচেনা বিচিত্রবেশকে। মেয়র প্রতিশ্রুতি রাখলেন না। ভাবলেন কেউ জানতে পারল না, জানল কেবল সেই বাঁশিওয়ালা। তার কিছুদিন পর আবার বাঁশির সুরে ভেসে গেল কলকাতা।

বাঁশিওয়ালা চলেছে আগে আগে। আবার রাস্তা-ঘাট স্থবির, অচল গাড়ি অধীর প্রতিক্ষায়। এবার বাঁশিওয়ালার পিছন পিছন চলেছে তরুণ-তরুণীর দল। এ-কলেজ, সে-কলেজ, এই রক, সেই চায়ের দোকান—সব খালি করে। অচল মহানগরী। স্তব্ধ যানবাহন।

তারই মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে বাঁশিওয়ালা। আর পিছন-পিছনে-যুবক মিছিল। শক্তি, বল, ছাত্রদল। কেউ বা দেখতে পাচ্ছে, তাদের তাদের হাতে কোনও অদৃশ্য ঝাণ্ডা। কেউ বা শুনতে পাচ্ছে তাদের কোনও নিঃশব্দ স্লোগান। দেখছে সারা শহর।

দেখছে সুরেন ব্যানার্জী রোডের লাল বাড়ি।

দেখছে আরও একটা লালবাড়ি। ডালহৌসির কোণ থেকে।

আর দেখছি আমরা 'রোববার'-এ। ভাবছি পরের সংখ্যাটা কর্পোরেশন হলে কেমন হয়।

১৩ জুন, ২০১০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ কথা আজ আর নতুন করে কারও অজানা নয় যে, পরিবর্তনের সরকারের আচরণবিধি নিয়ে নানা অসন্তোষ প্রায়ই বেশ প্রকট হতে শুরু করেছে মিডিয়া-য়।

এই সরকারের হঠকারিতা, যুক্তিবর্জিত আবেগসর্বস্বতা দিন-দিন মিডিয়া ছাড়িয়ে এক চরম দুর্ভাবনার আকারে জনসাধারণের মধ্যেও সঞ্চারিত হতে শুরু করেছে।

ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে যে—এই নতুন সরকার অনেক আলোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে শেষ পর্যন্ত কি এক অপরিণামদর্শী অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেবে আমাদের?—এই প্রশ্ন আজ আর কেবল মিডিয়ার নয়; আপনার, আমার সকলেরই দুরুদুরু সংশয়।

এবং আমরা এও জানি, কোনও প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে যখন কোনও নেতিবাচকতা তৈরি হয়, তখন তার সমালোচনাপ্রবাহ এত দ্রুত এক গভীর নদীপথ তৈরি করে নেয়, যার স্রোতে সামগ্রিক যুক্তি-বুদ্ধিও নিতান্তই খড়কুটো।

নতুন সরকারের কাছে নিশ্চয়ই আমাদের অনেক প্রত্যাশা ছিল। এবং বিভিন্ন মানুষ বিভিন্নভাবে বিশ্বাসভঙ্গতার শিকার হয়েছেন। এবং এখন যেন, প্রায় চোখ বন্ধ করেই, এই নতুন সরকার যা কিছু করছেন, বা করবেন, তা নিয়ে সমালোচনা বা বিদ্বেষটুকু এক সর্বনাশা সংক্রামক ব্যাধির মতোই সর্বগ্রাসী।

কিন্তু এই সামগ্রিক হতাশার মধ্যে কোনও শুভ উদ্যোগকেও যদি আমরা কেবল নিরবচ্ছিন্ন বিতৃষ্ণা দিয়ে দূরে ঠেলে রাখি, যাচাই না-করে নিজের স্বাধীন বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে—তা হলে হয়তো অকারণেই আমরা আরও হতাশাগ্রস্ত হব।

এ যেন 'যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা!'

কয়েক দিন আগে একটি বেসরকারি বাংলা নিউজ চ্যানেলে একটা সংবাদ পরিবেশিত হল।

শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে performing arts-কে অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন। খবরটা এটুকুই। বাকিটুকু চ্যানেল অ্যাঙ্কর-এর টিপ্পনি। উচ্চশিক্ষাকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমুখী না-করে, নাচ-গান শেখানোর এই বিলাসিতা—সংগত কি না, এই নিয়ে।

মুশকিল একটাই, আমরা সমালোচনার inertia-য় এমনই প্রবল বেগে ধাবমান যে, ক্ষণিকের জন্য দাঁড়িয়ে কোনও সাধু অভিপ্রায়কেও গ্রহণ করতে পারছি না যেন।

আমার পরিষ্কার মনে আছে, আমার ছোটবেলায় স্কুলে ছবি আঁকার, গান শেখার, এমনকী হস্তশিল্পের ক্লাসও ছিল। এবং আশ্চর্যের কথা এই যে, শেষোক্ত ক্লাসটি নিতেন আমাদের Crafts Sir কমলকুমার মজুমদার।

আমরা যখন হাই স্কুলে গেলাম, বালিগঞ্জ প্লেস-এর বাড়িতে, সেখানে মাঝে-মাঝে ক্লাস নিতে আসতেন স্বয়ং উদয়শংকর।

শরীরের ছান্দিক চালনায় আমার প্রথম হাতেখড়ি ওই বিশ্ববরেণ্য প্রতিভার কাছে। সেই ক্লাসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার সব সহপাঠীই থাকত—ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে। কারও পেলব মনকে আলাদা করে অনুপ্রাণিত করা হত না।

ফলে সর্বাঙ্গীণভাবে এক প্রচ্ছন্ন নান্দনিক যাত্রার মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছি আমরা।

পাঠক নিশ্চয়ই এই তর্ক জুড়বেন না যে, কমলকুমার বা উদয়শংকরকে শিক্ষক হিসেবে পাওয়ার অধিকার কি তামাম পশ্চিমবঙ্গের সব শিক্ষার্থী পাবে?

মোটেই পাবে না। এবং এই নাম দু'টো—আলোচনার সুবিধাক্রমে উদাহরণ মাত্র। মূল কথা হল, নান্দনিকতা ও ললিতকলার সংস্পর্শ প্রায় অজান্তেই এক বোধের জন্ম দেয়, যেখানে এক সাধারণ অফিস-চাকুরের জীবনও শৈশবের এই সঞ্চয় থেকে সুন্দরকে আহরণ করতে পারে সারাজীবন।

প্রযুক্তিদক্ষ, বিজ্ঞানমনস্ক নাগরিকের ললিতকলা শিক্ষায় কোনও অসুবিধে থাকার অসুবিধেটা কী? না কি, এটা পুরোটাই আমাদের মনগড়া?

এমন কি হতে পারে যে, এক কৌলীন্যকামী রুচির বিচারের সামনে দাঁড়িয়ে বর্তমান সরকারকে যথেষ্ট সম্মান করতে পারছি না? তার মূলে কি আমাদের প্রখর রাজনৈতিক সচেতনতা, না এক বিশেষ শ্রেণিবোধ বা নান্দনিক অহংকার?

তা হলে, সিনেমা বা নাটক চলাকালীন প্রেক্ষাগৃহে বারম্বার মোবাইল ফোন বেজে ওঠে কেন? কারণ অভিনয় বা সিনেমা তো বিনোদন! সেটাকে 'বিদ্যাচর্চা' বলে ভাবা মুশকিল।

প্রশ্নটাকে একটু ঘুরিয়ে দেখলে হয়তো চোখে পড়বে আমাদের নিজেদেরই উন্নাসিক উদ্ধত আত্মপ্রতিকৃতি।

কম্পিউটার শিক্ষায় লালিত আজকের নাগরিক সহজতম নান্দনিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে-হতে স্বাভাবিক শোভন ব্যবহারটুকুও হারিয়ে ফেলেছেন।

উচ্চশিক্ষায় ললিতকলা-চর্চ হয়তো অনেক গায়ক, নৃত্যশিল্পী বা অভিনেতার জন্ম দেবে না—কিন্তু হয়তো তৈরি হবে অনেক সংবেদনশীল দর্শক ও নাগরিক।

এখনও অনেকেই আছেন, যাঁরা বইয়ে পা লাগলে অবচেতনেই কপালে হাত ঠেকান বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধায়।

নাচ, গান, অভিনয়—এগুলোও তো বিদ্যা। দর্শকদের সশ্রদ্ধ শিষ্ট আচরণ এদেরও তো প্রাপ্য!

২ ডিসেম্বর, ২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইটি ৫১৩। মুম্বাই থেকে ছাড়ার কথা বিকেল পাঁচটা কুড়িতে।

একটা জরুরি মিটিং ছিল বান্দ্রায়। শেষ হল প্রায় পৌনে চারটে। তড়িঘড়ি কোনক্রমে মালপত্র গুছিয়ে হুড়তে পড়তে এয়ারপোর্ট।

সেই এয়ারপোর্টটা। নামটা শুনি প্রত্যেকবার মুম্বই নামার সময়—ছত্রপতি শিবাজী হাওয়াই আড্ডা।

বন্ধুবান্ধবদের মুখে কিংফিশার এয়ালাইনস-এর খুব তারিফ শুনছিলাম হালে।

কী ভাল খাবার!

কেমন চমৎকার সারভিস। সরকারি ভায়ায় যা নাকি পরিষেবা।

এবং, সর্বোপরি প্লেনে বসে টিভি দেখা যায়—ইনফ্লাইট এন্টারটেনমেন্ট যাকে বলে।

ঠিক যেন, বিদেশি এয়ারলাইন্স।

AMARBOI.COM

বিদেশের ডোমেস্টিক এয়ারলাইন্স-এ বহুবার চড়েছি। মোটেই তেমন ভাল নয়। আর প্লেনের খাবার—এক প্যাকেট ন্যাচোস ধরিয়ে দিয়েই—ব্যাস্!

কোনওক্রমে এয়ারপোর্টে পৌঁছলাম। কাউন্টারে বসা মহিলা, সরু করে ভুরু প্লাক করা, টকটকে লাল লিপস্টিক, সাদা ব্লাউজ লাল ব্লেজারের সঙ্গে পার্ল স্ট্রিং। অত্যন্ত মোলায়েম ব্যবহারে বোর্ডিং পাস ইস্যু করে এক্কেবারে শেষে মোক্ষম কথাটি বললেন প্লেন ছাড়বে ছ'টা চল্লিশে।

—সে কি! কেন?

—শুক্কুরবার, শুক্কুরবার এরকম নাকি হয়। কি যেন হয়টয়...

বুঝলাম মহিলা নিজেও বিশেষ কিছু জানেন না।

ভারতবর্ষের বিমানযাত্রীদের কাছে এটা কিছু একটা চরম বা আকস্মিক দুঃসংবাদ নয়। মেজাজটা একটু খারাপ হল। তবু গিয়ে বসলাম এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জে।

বিচিত্র বর্ণের আসবাব, কোনওটার রঙের সঙ্গে কোনওটার মিল নেই। কোনও একটা বিশেষ খবরের কাগজের সঙ্গে নিশ্চয়ই কোনও গভীর বাণিজ্যবন্ধন আছে। ফলে, গোটা লাউঞ্জে অন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনও খবরের কাগজ নেই।

তবুও তারই মধ্যে গুছিয়ে নিয়ে বসেছিলাম। যে মিটিংটা ফেলে দুদ্দাড়িয়ে চলে এসেছি, তারই পয়েন্টগুলো গুছিয়ে লিখে নিচ্ছি আস্তে আস্তে করে, এমন সময় ঘোষণা, কিংফিশার কলকাতার গেস্টদের (প্যাসেঞ্জার নয়, কিন্তু) জন্য, যে বিমান এবার ছাড়ব ছাড়ব করছে। আপনারা যে যার মতো রওয়ানা দিন।

ঘড়ি দেখলাম—ছ'টা বারো।

একটু সন্দেহ হল। জিজ্ঞেস করলাম—ডিপারচার অ্যানাউন্সমেন্ট মনে হল, ব্যাপারটা সত্যি তো?

নিশ্চয়ই সত্যি। শিগগির রওয়ানা দিন।

তাড়াতাড়ি খাতাকলম গুছিয়ে ল্যাপটপ ব্যাগে ভরে, মোবাইল সামলে, সিকিউরিটিতে দাঁড়িয়ে এর দাঁত খিঁচুনি, ওর চোখ রাঙানি সহ্য করে যথারীতি নিরাপত্তা বেষ্টনীতে প্রবেশ করলাম।

হ্যান্ডব্যাগেজ নাকি একটার বেশি নেওয়া মানা। পুরুষরা যদি ল্যাপটপ সঙ্গে নেন, সেটাই তাঁদের একমাত্র হ্যান্ডব্যাগেজ।

মহিলা যাত্রীরা কিন্তু অবলীলায় দেখলাম তাঁদের ভ্যানিটি ব্যাগ এবং ল্যাপটপ নিয়ে দিব্যি গটগট করে বেরিয়ে যাচ্ছে।

জিজ্ঞেস করলাম এ ব্যতিক্রম কেন? অমনি ওঁরা নিজেদের মধ্যে মারাঠি ভাষায় কথা বলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমি তো নাছোড়বান্দা। একটু আধটু হিন্দি বা ইংরেজি যাঁরা বলতে পারেন বা চান, তাঁরা বললেন—মেয়েদের ক্ষেত্রে নাকি এটা অনুমতিযোগ্য। কেন মেয়েরা কি টেররিস্ট হতে পারেন না?

বোমা ফেলতে পারেন না?

সেই শুনে তাঁরা আমায় এই মারেন তো সেই মারেন।

একবার আমার মনে আছে, নন্দনে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল সময় রীণাদি আর আমি একসঙ্গে ছবি দেখতে ঢুকছি, তখন বোধহয় আমি ছবি করা শুরু করিনি। আমার ব্যাগটা খুব তল্লাশি করা হল। রীণাদিকে দেখে একগাল হেসে 'আসুন আসুন' বলে ছেড়ে দিল। বললাম 'কেন অপর্ণা সেনের কি বোমা থাকতে পারে না?' সেই শুনে কেবলমাত্র রীণাদি হো হো করে হাসল। আর সবাই এমন কটমট করে আমার দিকে তাকাল যেন আমি কী একটা ঘোর অন্যায় কথা বলেন।

আজকাল তো আবার অনেকরকম নিয়ম হয়েছে। হ্যান্ডব্যাগে জলীয় বা ক্রিমজাতীয় পদার্থ নিতে দেওয়া মানা সে ওষুধই হোক, বাচ্চার দুধ-ই হোক। শীতের সময় প্লেনে চড়লে প্রেশারাইজড ক্যাবিন বলেই হোক, বা প্লেনের এয়ার কন্ডিশনিং এর জন্যই হোক—ভীষণ ঠোঁট ফাটে। আমি অনেক বুঝিয়ে বলেছিলাম, আমার ছোট্ট একটা চ্যাপস্টিক—নিষ্ঠুরভাবে কেড়ে নিল। কী আর করি। নিয়ম বলে কথা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওমা! প্লেনে উঠেছি, প্লেন ছেড়েছে, প্লেন পৌঁছেছে নামার একটু আগে দেখি এক ভদ্রমহিলা দিব্যি ঘুমটুম থেকে উঠে চুল আঁচড়ে খুব মন দিয়ে লিপস্টিক লাগাচ্ছেন তাঁর বেলায় কি সিকিওরিটি মহিলা গান্ধারী সেজে বসেছিলেন?

ওঃ! কোথায় যেন ছিলাম। হ্যাঁ, ছ'টা বারো। সিকিওরিটি পার হলাম, নীচে নামলাম। বলে দিয়েছে দশ নম্বর গেট, সেখানে পিলপিল করছে কলকাতার লোকজন। অনেকেরই কানে মোবাইল-হ্যাঁ এখনও ছাড়েনি এই ছাড়বে, একটু দেরি হবে, দিব্যি বাংলা কথা কানে আসছে।

ছ'টা চল্লিশ বাজল, সাতটা বাজল, সাতটা দশ বাজল।

ঘোষণা হল ব্যাঙ্গালোর থেকে যে প্লেনটা এসেছে, সেটাই কলকাতা যাবে।

সুখবর। কিন্তু কখন?

গুটি কয়েক লাল ব্লেজার আর মুক্তোর মালা ঘুরছে। কেউ কোনও সদুত্তর দিতে পারছে না। সবারই ভুরু সরু করে তোলা। সবারই লিপস্টিক টকটকে, না কটকটে।

সাতটা কুড়ি। এবার দেখলাম, কলকাতার পাবলিক ধীরে ধীরে স্বমূর্তি ধরেছেন। একটা জটলা—সব ক'জন বাঙালি নিজেদের মধ্যে প্রবল ইংরেজি বলছেন, আর গ্রাউন্ড স্টাফ মেয়েগুলোর সঙ্গে কথা বলতে গেলেই তোতলাচ্ছেন। আর মেয়েগুলো সেটা বুঝতে পেরে আরও ফ্যাঁশফ্যাঁশ করে ইংরিজি বলছে।

এবার মাথাটা একটু গরম হয়েছে। বুঝলাম একটু যদি কিছু না বলি, আজ রাতে প্লেনটা আর ছাড়বে না। একটি লাল ব্লেজারকে ডাকলাম। খুব মিষ্টি করে বললাম—'শুনুন, আমি দিব্যি এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জে বসেছিলাম। আমাকে ধাক্কা মেরে টেনে আনা হয়েছে প্লেন ছাড়ছে বলে। আমি এখন সেখানে ফেরত যেতে চাই। এবং আমি হেঁটে যাব না। সিকিউরিটি পার হয়ে যাব না। আমাকে পৌঁছে দিতে হবে। কী করে দেবেন সেটা আপনাদের ব্যাপার। দেরি আপনারা করেছেন, ঠেলে জোর করে এই ভিড়ের মধ্যে নীচে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি ঠিক আমার আগের জায়গাটাতে ফিরে যেতে চাই।'

একেবারে পোর্শিয়ার হিসেব। এক পাউন্ড মাংস, তো এক পাউন্ড মাংস, এক ফোঁটা রক্ত পড়লে চলবে না।

এটা নিয়ে সরু ভুরু, কটকটে ঠোঁট এবং নানা বিচিত্র মুক্তোর মালাদের মধ্যে অনেকরকম শলা পরামর্শ হল। কেউ তেমন একটা জুতসই কিছু বলতে পারল না। আর আমি মাঠে নেমে পড়েছি দেখে কলকাতার পাবলিক তো বার খেয়ে একশো। এবার আর ইংরেজি নয়, কাঁচা বাংলা বেরোচ্ছে অনর্গল। একজন আবার বলল নেহাৎ প্লেন অবরোধ করা যায় না, নইলে...

বেগতিক দেখে হঠাৎ কিংফিশারের একটা মোটা মতো লোক ফস করে বলল—না না, ব্যাঙ্গালোর থেকে যে প্লেনটা এসেছে সেটা কলকাতাতেই যাবে। কলকাতার প্যাসেঞ্জার, থুড়ি গেস্টরা চটপট উঠে পড়ুন। অমনি একটা বাস এসে গেল। আর সবাই যেন 'আসছে বছর আবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩.৫' টাইপ একটা ঝিংচ্যাক ভাব নিয়ে টক করে বাসে উঠবে বলে গেটের দিকে এগোলো।

গেট দিয়ে বেরিয়ে বাসে ওঠার আগে দেখি সেই মোটামতন-লোকটা জনে জনে বোর্ডিং পাসগুলো দেখছে আর 'থ্যাংক ইউ' বলে ছেড়ে দিচ্ছে। আমি বোর্ডিং পাসটা এগিয়ে দিতেই স্বাভাবিভাবেই 'থ্যাংক ইউ' বলল।

আমি বললাম 'না, আগে সরি বলুন'।

মুখটা বেশ কাঁচুমাচু দেখাল।

লাইনে একটা হৈ চৈ শুনলাম হ্যাঁ, হ্যাঁ, সরি বলতে হবে, সরি বলতে হবে। অবশ্য জনে জনে 'সরি' বলা হয়েছিল কি না, জানি না।

প্লেনে উঠলাম, এখানেও সরু ভুরু কটকটে ঠোঁট আর ফ্যাঁশফ্যাঁশে ইংরিজি। কারা আবার ব্যাঙ্গালোরের ঘোষণা শুনে আগেভাগে উঠে পড়েছিলেন। তাঁদের আবার নামিয়ে দেওয়া হল। এই নাকি কিংফিশার। বিদেশি এয়ারলাইন্সকে হার মানায়। দুগ্গা, দুগ্গা!

প্লেন ছাড়ার আগে ওভারহেড টিভি মনিটার নেমে এল। বিজয় মল্ল রেলায়, হাত-পা নেড়ে বললেন—তিনি আমাদের কত ভালবাসেন, কিংফিশার তাঁর প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ। কোনও অভিযোগ থাকলে আমরা যেন সরাসরি ওঁকে বলি। হে বিজয় মল্ল, (আজকের হারুন অল রশিদ) দয়া করে ক্ষমা চেয়ে অন্তত একটা ক্লিপিং রেকর্ড করে রাখুন।

কিংফিশারের যা হাল দেখলাম, যতদিন না সেটা শোধরাতে পারছেন, আপনার অভ্যর্থনার থেকে এই ক্ষমা প্রার্থনাটা বেশি কাজে দেবে।

খাবারের কথায় আসি। বেশ ইল্যাবরেট মেনুকার্ড, কায়দা করে লেখা।

কফি চাইলাম, একগাল (থুড়ি, একদাঁত) হেসে বলল—ক্যাপুচিনো নেই।

দেখলাম এদের ট্রেনিংটা হচ্ছে, সবসময়ে দাঁত বার করে হাসার। পারুক না পারুক, চাট্টি দাঁত বার করবেই করবে।

প্লেনে খেতে দিল 'চিকেন আর ক্যাভিয়ার'। সে কেমন জানেন? আমাদের বাড়িতে ছবি খুব মেজাজ খারাপ থাকলে যখন শাক রান্না করে, এর থেকে বেশি বড়িগুঁড়ো করে ছাড়িয়ে দেয়।

কথা হল—আর কোনও এয়ারলাইন্সে কি এমন বিপর্যয় হয় না? রবি ঠাকুরদের গুরুমশাইয়ের ভাষায়, 'সকল পক্ষী মৎস্যভক্ষী, কেবল মৎস্যরাঙা কলঙ্কিনী!'

হয়তো হয়, কিন্তু মুশকিলটা হল বিজয় মল্ল ঠিক করে ফেলেছেন মাছরাঙাকে ময়ূর করে ছাড়বেন। এখন সেটা কতটা সম্ভব— ভাববার বিষয়!

১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যবিত্ত শব্দটি যে এত ব্যাপকভাবে বহুমাত্রিক সম্প্রতি সেটা বারবার করে টের পাচ্ছি। আভিধানিকভাবে মতে যা ছিল এক বিশেষ আর্থসামাজিক শ্রেণির অনানুভূতিক বর্ণনা, সম্প্রতি তাতে নানা অনুষঙ্গ যোগ হয়ে চলেছে প্রাত্যহিক বাগধারায়।

ঐশ্বর্য রাইয়ের মা পরম গর্বে বলেন 'আমার মেয়েকে আমরা একেবারে মধ্যবিত্তর মতো করে মানুষ করছি।'

উল্টোদিকে আবার প্রয়োজনে অন্য কারুর মোবাইল ফোনে কথা বলতে গেলে, কথোপকথন শেষ হওয়া মাত্র বিপুল তাড়াহুড়োয় 'কল এন্ড' বোতামটা খুঁজি, আর অবধারিতভাবে বন্ধুরা গালি দেয়।

'উফ!' এখনও তোর মধ্যবিত্তপনা গেল না।' কখনও গর্বিত বিশেষণ। কখনও হীনমন্যতার ধিক্কার। মধ্যবিত্তের নিত্যদোলাচল বর্ণনা।

আচ্ছা, বিশদে যাওয়ার উপায় নেই—ধরে নিচ্ছি আমাদের শিক্ষাভিলাষী চাকুরি সীমিত রোজগারের জনপ্রতিবেশের সম্মিলিত মূল্যবোধের নামই মধ্যবিত্ত।

যে মূল্যবোধের মধ্যে বহু দ্বিচারিতা, অনেক ছদ্মযুদ্ধ, অনেক সন্তর্পণ। বাঙালি মধ্যবিত্তের এক চমৎকার স্বপ্নিল সারাৎসার সৃষ্টি করেছিলেন আমাদেরই এক মহান প্রেরণাপুরুষ—সত্যজিৎ রায়।

বাঙালি মধ্যবিত্তের রুচি, সৌন্দর্যবোধ, সাহিত্যপ্রীতির অহমিকা, নিজসংস্কৃতিজাত উন্নাসিকতা, আধুনিকতার গর্ব এবং ঐতিহ্যের অহঙ্কার—সব মিলিয়ে যে বাঙালিয়ানা আজও শ্যামবাজার, ভবানীপুর, নিউ আলিপুর, বালিগঞ্জের, মানিকতলার চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের পুরনো বাড়িগুলোর বসবার ঘরের শৌখিন দেওয়াল, আলমারিতে সাজানো আছে, তারই এক মায়াময় অলৌকিকতা ছড়িয়ে রয়েছে সত্যজিতের প্রতিটি শিল্পকর্মে।

সত্যজিতের সব নায়কনায়িকা সুদর্শন। তাঁরা মার্জিত বাংলায় কথা বলেন। গ্রাম্যনারীর চরিত্রেও শর্মিলা ঠাকুরের ডায়শেসন উচ্চারণ এবং অপর্ণার মডার্ন হাই দিব্যি ভাল নম্বর পেয়ে পাশ করে যায়, কেবলমাত্র তাঁদের অনির্বচনীয় মুখশ্রীটুকুকে ঘিরে। সত্যজিৎ জানেন নায়িকা মানেই, স্বপ্ননারী। গ্রাম্য উচ্চারণের বিকৃতিতে আর যা হয় হোক, স্বপ্ন নির্মাণ হয় না—কারণ তাঁর ছবির দর্শক শহুরে মধ্যবিত্ত।

'তিন কন্যার কথাই ধরি। পোস্টমাস্টারের রতন সাধারণদর্শন, তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না। কারণ সত্যজিতের পোস্টমাস্টার প্রেমের গল্প নয়, এবং রতনকে ঘিরে কোথাও রোম্যান্টিক আকর্ষণ বুনে দিতে চান না পরিচালক। কিন্তু মৃন্ময়ীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা পুরো আলাদা। তাকে সুন্দরী হতে হবেই, কারণ সে এক প্রেমের গল্পের নায়িকা। চিত্রাঙ্গন্দার মতোই কুরূপা থেকে সুরূপার উত্তরণেই 'সমাপ্তি'র সার্থকতা। মধ্যবিত্তের স্বপ্নপূরণ। দর্শকের পয়সা উত্তল।

সত্যজিৎ বিজ্ঞাপনের মানুষ ছিলেন। সিনেমার বাস্তবতা যে জীবনের বাস্তবতা নয়—সে কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড় অমোঘভাবে জানতেন।

ফলে, বাস্তবতার নামে সত্যজিৎ আদতে যেটার জন্ম দিয়েছিলেন তা হল এক সুচারু মধ্যবিত্ত জীবনের মায়াদর্পণ, যেখানে স্বপ্নপূরণের সূত্রগুলো বাস্তবতার পথ ধরে অভিপ্রেতর দিকে এমনভাবে হাঁটে, যে সেই যাত্রা শেষ পর্যন্ত বাস্তব হল না অভিপ্রেত হল—দর্শক সেটা সহজেই ভুলে যান।

মূলধারা ছবির যে যে ফর্মুলাকে আমরা নিন্দে করে এসেছি, সত্যজিৎ তার সবকটিকে ব্যবহার করেছেন এমন সুষম চাতুর্যে, যে অতিবড় বিনোদনবিরত কিছুক্ষণের জন্য এই অনন্য নির্মাণকে নিছক মনোরঞ্জন বলে চিনতে পারেন না।

শিবের গীতটা সংক্ষেপ করি। মধ্যবিত্ত জীবনের ব্যক্তিগত ক্ষেত্র যখনই গণমাধ্যমে উঠে এসেছে, তখনই এক অপরিসীম সন্তর্পণ এসে গ্রাস করেছে তার শিল্পভঙ্গি। যে কোনও সরাসরি অমনি প্রতীকের আড়াল খুঁজেছে, প্রাত্যহিকতা মুখ লুকিয়েছে কাব্যভঙ্গির আঁচলে।

রবীন্দ্রনাথের খোকা যখন মাকে ডেকে বলে 'এলেম আমি কোথা থেকে' মা হেঁসে কেঁদে, আদরের পুত্তলিকে বুকে বেঁধে (বুঝিবা প্রস্তুতির কালক্ষেপণ) উত্তর দেন, 'ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।'

জন্মরহস্য সম্পর্কে অপরিণত মন ও প্রাপ্তবয়স্ক কথোপকথন কবির হাতে পড়ে এক অন্য মাত্রা পায়। এবং সেই সঙ্গে বাঙালি মননের নবীনতম বিগ্রহ আমাদের সশ্মশ্রু স্মিতহাস্যে এক গোপন সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্র করেন, তাঁর তাবৎ অনুরাগীকে ধূর্তছলনা শিল্পের সন্ধান দেন।

যুগ যুগ ধরে করে যার অসার অগভীর অনুকরণ বাঙালির বেড়ে ওঠাকে, বড় হওয়াকে, পরিণত হওয়াকে প্রতিহত করবে। মাঝেমাঝে পরম অভিমানে মনে হয়, এ নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের কোনও এক গোপন দূরভিসন্ধি—নিজের সুউচ্চতাকে আরও অগণ্য রাখবেন বলে বাঙালি শিল্পসাহিত্যচর্চাকে কতগুলো সহজ অনুন্নয়নের পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

কেমন করে যেন মধ্যবিত্ত বাঙালি শিখে গেল জীবনের অন্তরমহলের অভিব্যক্তি কেবলই প্রতীকে, অতিরিক্ত লালিত্যে বা পেলবতায় সঞ্জীবিত করলে কোথাও বা বাস্তবের রূঢ়তার সঙ্গে সরাসরি সম্মুখীন হতে হবে।

আমি বহুদিন 'বোরোলীন'-এর বিজ্ঞাপন লিখেছি। বারবার দেখেছি যে চামড়ার সর্বাপেক্ষা ব্যবহৃত বাঙালি প্রতিশব্দ যেখানে Skin, সেখানে বিদ্রোহে ভেঙে যেতে যেতেও বারবার আমাকে 'ত্বক' শব্দটির আড়ষ্ট আশ্রয় সন্ধান করতে হয়েছে। বোরোলীনের ওড়িয়া বা অসমিয়া বিজ্ঞাপনে (কোন ভাষা, সেটা সঠিক মনে নেই) 'ছাল' কথাটা ব্যবহার করা হয়েছিল, আমাদের সমস্ত মধ্যবিত্ত বাঙালি উন্নাসিকতা তার প্রবল পরিহাস করতে ছাড়েনি—দ্যাখ, দ্যাখ—ওরা চামড়াকে ছাল বলে। এবার পিটিয়ে 'ছাল' তুলে দেব'র সময় আমি ত্বক লিখে দেখব—মধ্যবিত্ত নিষ্ঠুর ভ্রু কোঁচকানো ছাড়াও নির্মল কৌতুকানন্দ পান কি না। এ হেন মধ্যবিত্তের জন্য যৌনরোগ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইশারা ইঙ্গিতই প্রধান ভাষা হবে, তাতে আর আশ্চর্য কী?

যৌনরোগ চিকিৎসা সংবাদ আজও পাবলিক প্রস্রাবাগারের দেওয়ালের আর্দ্রতাকে অবলম্বন করে বেঁচে আছে—এ আমরা কে না জানি। তাকে সম্মানিত সামাজিক প্রেক্ষিতে আনতে গেলে মধ্যবিত্তকে একবার তো আয়নার কুরুশের ঢাকনাটা সরাতে হবে। সুদর্শনার সেই রাজদর্শন বাঙালির সহ্য হবে তো!

ছোটবেলায়, পরিবার পরিকল্পনার বিজ্ঞাপন দেখতাম গোল গোল চারটে হলুদ মুখ, নাক, চোখ, ঠোঁট আঁকা। মনে আছে 'নিরোধ' নামক বিশেষ্যটি তখন সত্য বাঙালির ভক্যাবুলারিতে অদৃশ্য ছিল, কেবল নিষিদ্ধতায় অনুষঙ্গে।

এতদিন পর নেই গোল গোল হলুদ মুখগুলোই যেন শাড়ি পড়ে বুলাদি হয়ে নেমে এনেছে। তাই, বুলাদি যখন নিরাপদ যৌনতার কথা বলেন সেটা যে পরিবার পরিকল্পনা প্রসঙ্গ নয়, সে কথা আমি ভাল করে বুঝতে পারি না। সত্যিই কি বিজ্ঞাপনকর্মীরা নিজগুণমুগ্ধ বলে বিশ্বাস করেন যে একটা চালু অনুষ্ঠান ব্যাহত করে যখন বিজ্ঞাপন দেখানো হয়, তখন তার প্রতিটি শব্দ ও দৃশ্য আমাদের সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের মতোই প্রণিধানযোগ্য?

পুতুল খেলার সময়ই বাস করছি আমরা।

আমরা বিশ্বায়নের পুতুল, উন্নয়নের পুতুল।

যৌনশুদ্ধীকরণের মতো প্রাত্যহিক জৈবিক সমস্যা যদি পুতুল দিয়েই বোঝাতে হয়, তাহলে বুলাদি নাম না রেখে 'গঙ্গা মা' নাম রাখলেই তো হত।

অন্তত এডস ক্যামপেন বিজ্ঞাপন দেখবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির প্রাত্যহিক আত্মিক আচমনের পর্বটিও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারত।

২০ মে, ২০০৭

যখন আপনারা আজকের ফার্স্ট পার্সন পড়ছেন, তখন আমি অনেক দূরে। ফরাসি দেশের সাগরপারের কান শহরে। ইদানীং আবার অনেকে শুনি ক্যানস বলেন। যাক, সে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি কোন জায়গাটার কথা বলছি।

কান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব এবছর ষাটে পা দিল। আমাদের দেশের স্বাধীনতাপূর্তির মতোই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলে, এবছর ভারতীয় ছবির একটি বিশেষ প্যাকেজ আনুষ্ঠানিকভাবেই কান ফেস্টিভ্যাল-এর অন্তর্গত। আর সেই সিনেমাস্তবকের মধ্যে সৌভাগ্যক্রমে একটি বাংলা ছবিও আছে। দোসর।

ইদানীংকালে কান ফেস্টিভ্যাল প্রায় যেন দিল্লির সিরি ফোর্ট হয়ে গেছে। বম্বের তাবড়-তাবড় সব ফিল্মমেকাররাই প্রায় তাঁদের নিজেদের ছবি নিয়ে আসেন কান ফেস্টিভ্যাল মার্কেট প্রদর্শনীর জন্য। ফলে গরম পড়লেই কান-এ পৌঁছে যাওয়াটা এখন হালফ্যাশনের বলিউড ফ্যাড।

কোনও এক বছর 'চোখের বালি'ও কানে দেখানো হয়েছিল মার্কেট বিভাগে। সেটা প্রধানত প্রযোজকদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে। তার সঙ্গে মূল উৎসবে অন্তর্ভুক্তির কোনও সম্পর্ক নেই।

সেদিক থেকে দেখতে গেলে কান উৎসবের নিজস্ব আমন্ত্রণে এই প্রথম আমার বানানো কোনও ছবি দেখানো হচ্ছে। এটা যে কোনও ছবি করিয়েরই স্বপ্ন। এতে যে আমাদের ইউনিট-এর সকলেরই খুব আনন্দ হচ্ছে সেটা আশাকরি স্পষ্ট করে বলার দরকার নেই।

ইচ্ছে আছে আগামী সংখ্যায় কান বেড়ানোর একটা লম্বা গল্প লেখার। দেখা যাক।

'যবনের ভগবান', সংখ্যাটা নিয়ে আমরা ভাবছিলাম বেশ কিছুদিন ধরেই। সুব্রত মুখোপাধ্যায় আমাদের জন্য রামপ্রসাদের জীবনীভিত্তিক একটি নতুন ধারাবাহিক উপন্যাস লিখছেন। তার একটা যথাযথ প্রেক্ষাপট যদি মলাটকাহিনি দিয়ে করা যায়, তখনও আমরা স্বপ্নে ও ভাবিনি যে বরোদা শিল্প প্রদর্শনী নিয়ে এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা ঘটবে।

দেবদেবী নগ্ন ছিলেন, না পোশাক পরতেন—তা কেউ দেখেননি। আসলে আজকের মন কোনও বিমূর্ত মূর্তিকেও পোশাক ছাড়া ভাবতে পারেন না। ফলে আদিম বলতে আজকের মনে নগ্নতার স্থান আগে না পোশাকের স্থান আগে? পোশাকের অভ্যেসের কারণেই কি নগ্নতা অস্বস্তিকর?—এ আলোচনা প্রায় ন্যায়শাস্ত্রের তর্কের মত।

আমার দিদিমা তাঁর পেতলের গোপালের জন্য শীতকালে ছোট ছোট সোয়েটার বুনতেন। সেটা আমার কাছে অত্যন্ত আদরের স্মৃতি। আবার, ভাদ্রমাসে কুমোরপাড়ার একজন মৃৎশিল্পী দুর্গা প্রতিমা গড়ার সময়ে যখন পরম যত্নে প্রতিমার বক্ষদেশ, জঘনাংশ নির্মাণ করেন সেটাও আমার ভারতীয় হয়ে বেড়ে ওঠবার অত্যন্ত মূল্যবান গর্ব।

ঈশ্বরকে মানবরূপ দেওয়া যদি কোনও ধর্মের ভঙ্গি হয়, তবে সেই রূপ ক্রমবিবর্তনশীল হওয়াটাই বোধহয় বাঞ্ছনীয়। আমরা নিজেদের অস্তিত্বের সীমার মধ্যে সর্বদা সঙ্কুচিত হয়ে থাকি তাই প্রেমের মতোই সীমাহীন এক সঙ্গীকে ঘিরে আমাদের কল্পনা নিরন্তর পাখা মেলে। সেই সঙ্গীই আমাদের ঈশ্বর।

দেবদেবীর নগ্নমূর্তি নিয়ে মৌলবাদীর অসহিষ্ণুতা এদেশে এই প্রথম নয়। এই নারকীয় হিংস্রতার প্রতিবাদে যে কোটি কোটি মানুষ একদিন ভোট দিয়ে বর্তমান সরকারকে শাসনাসনে ফিরিয়ে এনেছিলেন তাঁরা সকলেই নিশ্চয়ই দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত করাটা নাকি আমাদের দেশে মহাপাপ। অন্তত সে রকমই তো দেখি। তার চেহারাটাও আবার অঞ্চলবিশেষে বদলায়। এবং বদলায় ভোটদাতাদের ধর্ম পরিচয়ের হিসেবে। কোথাও রাস্তা চওড়া করতে গেলে মসজিদটুকু বাঁচিয়ে মন্দিরটা ভেঙে ফেলা যায়— কোথাও ঠিক উল্টোটা। ধর্মের সংঘাতে যদি জনবিক্ষোভ হয়, তাই নিয়ে রাজনৈতিক নেতারা সতত বিপর্যস্ত এতো গেল ধার্মিকদের কথা, তাঁদের ধর্মবিশ্বাসের কথা।

নাস্তিকেরও তো ভগবান আছেন। কারুর ভগবান যদি রাম হন, আমার ভগবান তবে নিঃসন্দেহে বাল্মীকি। শিল্প, সাহিত্য, থিয়েটার, সিনেমার ওপর এই নিরন্তর নিষ্ঠুর বলপ্রয়োগকে আমার মতো অনেক অনেক মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত করা, সেটা কোনওদিন কোনও নেতা ভেবে দেখেছেন কি?

রোমিলা থাপারের ইতিহাস বইয়ের নিষ্ঠুর সম্পাদনা যে কোনও দেবীর বস্ত্রহরণের থেকে কম ভয়ঙ্কর নয়, এ নিয়ে সংশয়ে কোনওদিন কেউ কোনও কথা বলেছেন?

না বলে থাকলে বলুন। সবাই মিলে বলুন। এখনও না বললে বড্ড দেরি হয়ে যাবে।

২৭ মে, ২০০৭

AMARBOI.COM

ঠিক যখন প্রায় বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে ফেলেছি যে আমাদের মতো প্রগতিশীল সমাজে বোরখা জিনিসটা একটা সেকেলে পর্দা। কেবল পুরনো দিনের অভিনেত্রীরাই ব্যক্তিগত জীবনের গতিবিধিকে স্বচ্ছন্দ করার জন্যই এটা ব্যবহার করতেন ঠিক সেই সময়ই বোমাটা ফাটাল প্রীতি জিন্টা।

প্রীতিকে আধুনিকা বলেই জানি। প্রীতি পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত, নিজের ব্যক্তিত্ব নিয়ে বিন্দুমাত্র আড়ষ্টতা নেই। সেই প্রীতিও নাকি বোরখা ব্যবহার করে ওর দৈনন্দিন জীবনে।

কারণগুলো মজারও বটে। আশ্চর্যও বটে। প্রধান কারণ, প্রীতি যা বলল, সে বোরখা থাকলে বাইরে বেরোবার জন্য আলাদা করে তৈরি হতে হয় না সব সময়ে। বাড়ির টি শার্ট এবং শর্টস-এর ওপর বোরখা চড়িয়ে নিলেই বেশ একটা বাইরের পোশাক। এরপর, প্রয়োজনে অটোরিকশা করে যাতায়াত করলেও অসুবিধে নেই।

ভাবলে কেমন লাগে না! যে পোশাক আদতে সৃষ্টি হয়েছিল নারীর বন্দিত্বের ঘেরাটোপ হিসেবে, সেটাই আজ এক আধুনিকা সর্বজনাকাঙ্ক্ষিতা রমণীর মুক্তির বেশ। কালো কাচ গাড়ির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝামেলা নেই অহর্নিশি ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলা দেহরক্ষী বেষ্টনী নেই। বোরখার ঘনকৃষ্ণ অনন্ত, কারাগারই যেন মুক্তির এক অপার ঐশ্বর্যের 'গুপ্ত' সিংহদ্বার। পথে ঘাটে, দোকানে বাজারে, বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে বা ভিড় বাসে চড়ে সাধারণ স্বাভাবিক, অবাধ একজন হয়ে ওঠার সাময়িক ছদ্মবেশ। এই ছুটির নিমন্ত্রণ আমাদের কল্পনাবিলাসী মনে রোমান হলিডের মতো সুকুমার লাবণ্যময় আখ্যান সম্ভাবনারও জন্ম দেয়, আবার একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোধহয় অনেক অনাবিষ্কৃত সত্যও মেলে ধরে।

হঠাৎ বোরখা পরার শখ হল কেন তোমার? দুবাইতে একটা মেয়েকে দেখে, ঋতুদা। মেয়েটি ভারতীয় হিন্দু মেয়ে। একটা শো করতে গিয়ে আলাপ হয়েছিল। ও এমন এটা অদ্ভুত কারণ বলেছিল...যে আমি একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

—কী কারণ?

—মেয়েটি দেখতে ভীষণ সাদামাটা। কেবল চোখদুটো সুন্দর। বড় বড় দুটো চোখ, বাদামি রঙের মণি।

—তো?

—ও নাকি প্রায় খেলাচ্ছলে একবার বোরখা পরেছিল সেখান থেকে একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করে।

—কী?

—ওর যে সারাজীবনের কমপ্লেক্স যে ওকে দেখে পথেঘাটে ছেলেরা ঘুরে ঘুরে তাকায় না, ওকে তেমন যুতসই দেখতে নয় বলে ওর বিষয়ে পুরুষদের তেমন আগ্রহ নেই। এই গোটা জিনিসটা নাকি বদলে গিয়েছিল ও বোরখা পরার পর।

—সে কীরকম?

—বোরখা মানেই একটা রহস্য, বুঝলে। বোরখার আড়ালে যে মেয়েটি তুমি তো তাকে দেখতে পাচ্ছ না, দেখছ কেবল তার চোখদুটো। এবার তাকে তোমার মনের মতো করে কল্পনা করে নিতে তো তোমার কোনও অসুবিধে নেই।

বোঝা গেল! বোরখা হল গিয়ে তাহলে চিত্রাঙ্গদা সুরূপা বেশ, মোহ আবরণের আড়ালে এক ক্ষণিক কাল্পনিক অনঙ্গমায়া।

কিন্তু, তোমার তো আর সাধারণ দেখতে বলে কোনও কমপ্লেক্স নেই। তোমাকে পথেঘাটে তাকিয়ে দেখার লোকেরও অভাব নেই...তাহলে?

ঠিক বলেছ। ফলে আমার কাউকে ভাল করে দেখবার কোনও উপায়ও নেই। তোমরাই বলো যে অভিনয় শেখার গোড়ার কথাই হল অবজারভেশন। সারাক্ষণ যদি লোকে আমার দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়েই থাকে—আমি তাদের অবজারভ করব কেমন করে? কোন ফাঁকে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—অবজারভ করতে গিয়ে নতুন কোনও কিছু আবিষ্কার করেছ? একটু থামল প্রীতি। বোধহয় ক্ষণিকের সংশয়ে বলব? আমাকে কম্যুনাল ভাববে না?

—না। বল...

—আমি দেখেছি বোরখা পরে রাস্তায় বেরোলে লোকে দেখে বটে, কিন্তু কোথায় একটা অন্যরকম ব্যাপার আছে।

—সেটা আবার কী?

—হিন্দু ছেলেরা কিছুক্ষণ দেখে চোখ সরিয়ে নেয়। মুসলমান ছেলেরা কিন্তু ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকে। জানি না কেন? হয়তো এটাকে তাদের ধর্মীয় অধিকার মনে করে। 'দ্য ইনভিজিবল ম্যান'-এর কল্প আখ্যান যে আসলে আমাদের প্রতিটি মানুষের কোনও একটি নিষিদ্ধ আকাঙ্ক্ষার গল্প, তা এতদিনে আমরা সকলেই জেনে গেছি।

নিজের বৈধ পরিচয়, সামাজিক অবস্থানের বর্তমানতা আমার জৈব জীবনে যে অলঙ্ঘ্য কতগুলো প্রাচীর গড়ে তুলেছে—নিজেকে অদৃশ্য করতে পাওয়ার ক্ষণিক কল্পনাবিলাস আমাদের সেই বৈধতার কারাগার থেকে মুক্তি দিতে পারে।

ফলে মিঃ ইন্ডিয়া ছবিতে অনিল কাপুরের নারকীয় কীর্তি আমাদের কাছে আরও অনেক বেশি রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠে, তা কেবল নায়কোচিত বলে যতটা তার থেকে অনেকগুণ বেশি তা আমাদের মনের সুপ্ত অদৃশ্যায়নের অভীপ্সাকে প্রজ্জ্বলিত করে বলে।

সামাজিক অনুশাসন আর আমাদের জৈব উপস্থিতির যে বিরোধ তার থেকে মুক্তির এক চোরা সুড়ঙ্গপথই এই বৈধতার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ। সামাজিক বৈধতার একটি স্থান-কাল মানচিত্র আছে। সেই মানচিত্রের সীমারেখার বাইরে আমাদের বৈধ উপস্থিতি অনেক সময় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। ঠিক যেভাবে চেনা পরিবেশ, চেনা শহর বা চেনা লোকজনের আড়ালে আমরা এক নতুন অনাড়ষ্ট জীবনভঙ্গি লাভ করি। সেই বৈধতার বাইরে গিয়ে আমরা নানা সময়ে নানা আত্মপরিচয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াই, হয়তো বা রোমাঞ্চিতও হই, তারপরেই আবার সেই নবলব্ধ পরিচয়কে সসংকোচ ছদ্মবেশের মতোই ব্যবহার করি। কারণ আমরা জানি, সামাজিক বৈধতা 'মানবমনের অপার বৈচিত্র্যকে কুঁকড়ে গুটিয়ে ছোট্ট করে আনতে চায় কেবল তার একমাত্রিক অনুশাসনলিপিতে। সাইবারজগত বোধকরি সেই সীমাহীন ছদ্ম পৃথিবীর এক নতুন সন্ধান।

এই রাজ্যে নিত্য জন্ম নেন অগণিত বাসিন্দা। তারা জন্ম নেন, বাস করেন এবং নিজ নিজ বৈধতা সৃষ্টি করেন এই রাজ্যের নিয়মে নয়, তাঁর নিজস্ব জীবনযাপনের ভঙ্গিতে। সাইবার পৃথিবীতে 'আমি কে' সেটা আমার নিজস্ব স্বীকারোক্তি। তার সঙ্গে পুলিশ ভেরিফিকেশন বা গেজেটেড অফিসারের সইসমৃদ্ধ সার্টিফিকেট-এর কোনও মূল্য নেই।

নিজস্ব ভঙ্গিতে নিজ পরিচয় সৃষ্টি করার পরও এই স্বীকারোক্তি পর্ব চলতে পারে। কেবল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখানে কোনও বিশেষ শ্রোতার কোনও ভূমিকা নেই। এবং বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে নেই কোনও সামাজিক ইতিহাসসেতু। অতএব সেই স্বীকারোক্তি বিশিষ্ট হতে বাধ্য।

এই রাজ্যে আমি নিজেই আমার পরিচয় সৃষ্টি করি, কোনও পিতা মাতা সমাজ প্রতিষ্ঠান তার দায়িত্ব নেন না। প্রয়োজনে সেই পরিচয় ভাঙি ভেঙে আবার নতুন করে জন্মলাভ করি—কেবল এক জীবনে অনেকগুলো মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার আনন্দ চুরি করে পাই।

এই নতুন পৃথিবীতে একজনই অনুপস্থিত। তিনি বোধ করি ঈশ্বর।

মানবমনের নিবিড়তম, গহীনতম সৃষ্টি যে কল্পশক্তি—যিনি সব শক্তিমান বলে যুগ যুগ ধরে আমাদের পাপ-পুণ্য, ন্যায়, অন্যায়, ধর্ম, অধর্মকে প্ররোচিত করে এসেছেন এই পৃথিবীতে তাঁর কোনও অর্চনাগৃহ নেই।

ফলে সাইবারজগত প্রকৃত অর্থে amoral। সামাজিক জীব হিসেবে যে নীতিবোধ আমরা কখনও অভ্যাস করার অবকাশ পাই না, সাইবার জগত আমাদের সেই সমান্তরলতার সন্ধান দেয় অত্যন্ত সুচতুর গোপনতায়।

এমন এক দেশের স্বাধীন নাগরিকত্বের এক অদ্ভুত অভিনবত্ব আছে।

কিন্তু সন্দেহ হয়, যে এই দেশ কোনও দেশ নয়। বড়জোর উপনিবেশ বলা যেতে পারে। যেখানে, সুদূরবর্তী প্রায় যেন অন্তরীক্ষাবিষ্ট কোনও সার্বভৌমের কাছে আমাদের বারংবার নতিস্বীকার করতে হয়।

যে পরিচয় অবলম্বন করেই আমরা বাঁচতে চাই না কেন, তা আদতে সেই ঔপনিবেশিক শাসকের অনুমোদন সাপেক্ষ।

যে কোনও বাসিন্দার স্বীয়সৃষ্ট পরিচয়ের বৈধীকরণই এই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার প্রধানতম অনুশাসন, আমার ইউজার নেম। আমার পাসওয়ার্ড নির্বাচন করার প্রাথমিক স্বাধীনতাটুকুই আমার—আমার সেই স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়ার সম্পূর্ণ ক্ষমতা তেমন সেই অদৃশ্য শাসকের।

আমার কল্পনা আমাকে সামাজিক বৈধীকরণ থেকে মুক্তি দেয়। আবার আমার সেই অলীককে বৈধতা দেয় এই নতুন জগত। ফলে, আদতে কোনও পরিচয়ই বৈধতা বহির্ভূত নয়।

আমার, ব্যক্তির স্থান তবে কোথায়?

ছোটবেলায় হিন্দি সিনেমায় নায়কের নাম যখন হত বিজয় এবং তাঁকে সম্বোধন করা হত 'মিঃ বিজয়' বলে বা নায়িকার নাম হত পূজা এবং তিনি অবশ্যই অভিহিতা হতেন 'মিস পূজা' বলে, স্বাভাবিকভাবেই সেটা আমাদের অনেকের কাছে প্রবল কৌতুককর ঠেকত।

বংশ পরিচয়, পদবী, সামাজিক ইতিহাসকে গৌণ করে দেওয়ার এই অভিনব প্রণালী আমরা হিন্দি সিনেমায় অন্তর্লীন মায়াবী বাস্তবের অঙ্গ বলে ধরে নিয়েছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ সাইবার স্পেস-এর সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে পাই, এখানে মানুষ তার সামাজিক ইতিহাসের পরিচয় এবং সেই পরিচয়ের স্বীকৃতির বৈধতা থেকে মুক্তিলাভ করেছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি মুক্ত যে পৃথিবীর স্বপ্ন আমরা যুগে যুগে দেখে এসেছি এ কি তারই এক নতুন পদক্ষেপ?

৮ জুলাই, ২০০৭

৯/১১-র পর থেকে আমার কয়েকবার আমেরিকা যাত্রার অভিজ্ঞতা নিয়ে কয়েকটি দৃশ্য বর্ণনা করা যায়। কোনওদিন চিত্রনাট্যে ব্যবহার করে ফেলবার আগে অন্তত তার সত্যিটা কোথাও ধরা থাক।

দৃশ্য এক

নিউ ইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটন ডি সি যাচ্ছি। আমেরিকার অন্তর্দেশীয় বিমানে।

সিকিওরিটির লাইন থেকে হঠাৎ আমাকে আলাদা করে সরিয়ে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল লাইনের বাইরে।

লাইনে যাঁরা ছিলেন, এক এক করে পার হয়ে গেলেন—আমি দাঁড়িয়ে আছি এক অনন্ত অধৈর্য অপেক্ষায়।

যতবার জিজ্ঞেস করতে যাই, 'সমস্যাটা কী'—কোনও সদুত্তর পাই না।

কে একজন নাকি সুপারভাইজার আছেন, তিনি আসছেন! বেশ!

আমি দাঁড়িয়ে আছি, আর আমার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আমার ওপর আড়চোখে নজর রাখছেন এক বিশালদেহী কৃষ্ণাঙ্গ বিমানবন্দর সিকিওরিটি যুবক।

আমি কয়েকবার সসংকোচে তাকে জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করলাম, যে আর কতক্ষণ লাগবে?

যতবার আমি প্রশ্নটা তুলতে যাই, লোকটি মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

একবার চোখাচোখি হল। আমি প্রশ্নটা পাল্টালাম।

—Why you're picking me out like this? You know how it feels? Don't you?

কৃষ্ণাঙ্গ যুবক কী বুঝল কে জানে? ধীরে ধীরে চোখ নামিয়ে নিল।

আর চোখ তুলে তাকাল না। তারপর যতক্ষণ আমাকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল, ইচ্ছে করেই যেন একবারও আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়নি—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃশ্য দুই

অন্য এক বছর। সালটা মনে নেই। তারিখটা মনে আছে। ৪ঠা জুলাই।

আবার আমি নিউ ইয়র্কে। জর্জিয়া যাচ্ছি। বোর্ডিং অ্যানাউন্সমেন্ট হয়ে গেছে—আমি লাইনে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে এগোচ্ছি প্লেন-এর দিকে।

একটু দূরে মাটিতে বসে থাকা এক মধ্যপ্রাচ্যের প্রৌঢ় দম্পতিকে দেখে থমকে তাকালাম। তাঁদের থুম হয়ে বসে থাকার বিপর্যস্ত ভঙ্গি দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে ওঁদের ওপর জবরদস্ত খানাতল্লাসি চলেছে।

মেঝের ওপরে খোলা পড়ে রয়েছে স্যুটকেস। মাটিতে ছড়ানো রয়েছে সমস্ত জিনিস। জামাকাপড়, কাগজে মোড়া চটি, প্লাস্টিকের প্যাকেটে ডালমুট জাতীয় খাবার, ওষুধ, চশমা, নকল দাঁতের পাটি, এমনকী ভদ্রমহিলার অন্তর্বাস।

আমেরিকান পুলিশগুলো ভ্রূক্ষেপহীন। ওদের কাজ খানাতল্লাশি করা। অতএব কর্তব্য সেরে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে নিজেরা গল্পে মশগুল।

আর, শীর্ণ প্রৌঢ় দম্পতি মেঝেতে বসে আছেন স্থবির, বাকশক্তিরহিত। তাঁদের একান্ত ব্যক্তিগত জগতটা সম্পূর্ণ ওলটপালট হয়ে যাওয়ার অভিঘাত লুকোনোর চেষ্টা করছেন শুষ্ক মুখমণ্ডলে তাম্রবর্ণ বলিরেখার আড়ালে। ভদ্রমহিলার মুখ বোরখার আড়ালে, কেবল শিরাওঠা দুটি করুণ হাত হাঁটুর ওপরে আলতো করে রাখা।

কেন যেন, আমার বাবা-মা'র কথা মনে হল। ঠিক মনে হল কোনও প্রবাসে ভিনদেশের মাটিতে বসে আছে বাবা-মা, সামনে ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে তাদের সাধের সংসার।

আমি লাইন ছেড়ে এগিয়ে গেলাম। এক একটা করে জিনিস তুলে রাখতে শুরু করলাম হাঁ করা স্যুটকেস-এর মধ্যে। ভদ্রলোক প্রথমে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বাধা দিতে চেয়েছিলেন। দেখলাম দুর্বল হাতদুটোর বাধা দেওয়ার ক্ষমতাও নেই।

তারপর কিছুক্ষণ আমাকে লক্ষ করার পর, হয়তো বা গায়ের রং দেখেও হবে, কতকটা যেন ভরসা পেলেন। একটা একটা করে জিনিস তুলতে লাগলেন স্যুটকেস-এ, আমার সঙ্গে হাতে হাত লাগিয়ে।

মেঝেতে একটা খালি প্লাস্টিকের প্যাকেট পড়েছিল। অন্তর্বাসগুলো তার মধ্যে কোনওরকমে চালান করে দিয়ে প্যাকেটটা এগিয়ে দিলাম ভদ্রমহিলার দিকে। শিরা ওঠা করুণ আঙুলগুলো কৃতজ্ঞতায় কোমল হল। প্যাকেটটা কোনওরকমে আমার হাত থেকে নিয়ে বোরখার আবরণে ক্ষিপ্রহাতে লুকিয়ে ফেললেন মহিলা।

আমেরিকান পুলিশগুলো এবার ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে আসছে এক আধজন। তাদের হাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অ্যানথ্রাক্স দস্তানা—হঠাৎ কোনও এক ভিনদেশিকে অপরিচিত মানুষের স্যুটকেস গোছাতে দেখে প্রথমটায় কিছুটা সন্দেহ হয়ে থাকবে। তারপর হয়তো স্বাভাবিক মানবিকতায়, তারাও উঁচু হয়ে মেঝেতে বসে হাত লাগাল স্যুটকেস গোছাতে।

আমার সঙ্গে একবার চোখাচোখি হল একজনের। স্বাভাবিক মার্কিন ভঙ্গিতেই বলল—হাই।

আমিও ততোধিক নির্লিপ্তভাবে বললাম—হাই! হ্যাপি ইনডিপেনডেন্স ডে।

দৃশ্য দুটি চিত্রনাট্যকারের কল্পনা নয়, ভুক্তভোগীর স্মৃতিচারণ। এই মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ এশীয় মানুষ লন্ডনে বা নিউইয়র্কে পা দেওয়া মাত্র এক কঠিন ইমিগ্রেশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। আর তার ওপর তিনি যদি মুসলমান ধর্মাবলম্বী হন, তাহলে তো কথাই নেই।

আমরা, সংখ্যাগরিষ্ঠরা, খুব সহজে মনে করি এটা তো ওদের সমস্যা—আমাদের নয়। খুব বেশি হলে দাড়িওয়ালা বন্ধুদের সতর্ক করে দিই—ওখানে গিয়ে ঝামেলা করবে, দাড়িটা পারলে কেটে ফ্যাল।

কিন্তু ওস্তাদ রাশিদ খানের সঙ্গে সম্প্রতি যেটা হয়েছে শুনলাম, সেটা অত্যন্ত মর্মন্তুদ।

এবার উত্তর আমেরিকার বঙ্গ সম্মেলনে রাশিদ খানের গান গাইতে যাওয়ার কথা ছিল।

কলকাতার তরফের উদ্যোক্তাদের কারওর একটা কাছ থেকে শুনলাম রাশিদভাই যেতে চান না। এর আগে মার্কিন ইমিগ্রেশনে তাঁকে নানাভাবে নাজেহাল করা হয়েছে। তখনও ব্যাপারটার গুরুত্ব তেমনভাবে বুঝিনি।

মধ্যে কোনও একটা বিদেশ যাওয়ার সূত্রে প্লেন-এ দেখা হল রাশিদ ভাইয়ের সঙ্গে। জিজ্ঞেস করতেই কতকটা প্রাঞ্জল হল ব্যাপারটা।

'রশিদ খান' নামটার সঙ্গেই নাকি একটা সাঙ্কেতিক অ্যালার্ম আছে। ফলে যে কোনও দেশে ইমিগ্রেশনে এই নামধারী যে কোনও মানুষকে আটকানো হয়।

দুর্ভাগ্যবশত, পশ্চিম পৃথিবী 'রাশিদ খান' আর 'রশিদ খান'-এর তফাৎ করতে পারে না। ফলে গত কয়েকটি আমেরিকা-ভ্রমণ রাশিদভাইয়ের কাছে দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা।

তাঁকে বিবস্ত্র করে খানাতল্লাশি করা হয়েছে। এমনকী তাঁর প্রস্রাবের নমুনাটুকু নিয়ে পরীক্ষা করে মেলানো হয়েছে কোনও এক অদৃশ্য আততায়ীর সঙ্গে।

আর যতক্ষণ এই পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে, এই ভূমণ্ডলের দীপ্যতম সুরগন্ধর্ব অপমানে, গ্লানিতে মাথা হেঁট করে বসে থেকেছেন আমেরিকার কোনও এক এয়ারপোর্টে, এক দুঃসহ যন্ত্রণা নিয়ে।

রাশিদ খান আর আমেরিকা যেতে চান না। তাতে, আমেরিকার কী ক্ষতিবৃদ্ধি আমরা জানি না। কিন্তু আমাদের দেশের একজন সেরা গুণী মানুষকে যদি যে কোনও আন্তর্জাতিকতার সামনে থমকে দাঁড়াতে হয় এবং সংকুচিত পদক্ষেপে পিছিয়ে আসতে হয় কেবলমাত্র ইমিগ্রেশনের আতঙ্কে—তার প্রতিবিধান করার দায়িত্ব কি আমাদের সকলের নয়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৌরভবিহীন ভারতীয় দল মাঠে খেলতে নামলে আমরা সঙ্গতকারণেই ক্ষোভে, উষ্মায় ফেটে পড়ি।

রাশিদ খানের জন্য তাহলে কি আমরা কেউ কোনও প্রতিবাদ করব না? প্রতিকার ভাবব না?

আমি ধরেই নিচ্ছি, ঘটনাটা অনেকেই জানেন না। জানলে প্রত্যেক রুচিবান মানুষই তাঁদের শোভন মানবাধিকারবোধেই এগিয়ে আসতেন।

আমার এই লেখাটা এখন যাঁরা পড়ছেন তাঁদের মধ্যে ক্ষমতাবান মানুষ নিশ্চয়ই কিছু আছেন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সংস্কৃতিমন্ত্রীও বটে। এবং, কেন্দ্রীয় তথ্য সম্প্রচারমন্ত্রী ঘটনাচক্রে বঙ্গভাষী।

অন্তত ভাষার অন্তরায়ের কারণে আমার এই আবেদনটুকু দুজনের কারও কাছেই অপ্রাঞ্জল হওয়ার কথা নয়।

দুজনের কাছেই আমার আবেদন, আমাদের দেশের এই মুহূর্তের অন্যতম সেরা গায়কের সম্মানের জন্য আমরা একটু সচেষ্ট হই না!

৫ আগস্ট, ২০০৭

AMARBOI.COM

যে দণ্ডবেদনা

পুত্রেরে পার না দিতে সে কারে দিয়ো না;
যে তোমার পুত্র নহে তারো পিতা আছে,
মহা অপরাধী হবে তুমি তার কাছে
বিচারক!

রাজমহিষী গান্ধারীর হয়ে অন্ধ কুরুরাজের কাছে এই সকাতর বিনতি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

আমরা 'গান্ধারীর আবেদন' বারবার পাঠ করি রবীন্দ্রজয়ন্তীতে, ক্যাসেট সিডি কিনে গাড়িতে বাড়িতে শুনি। তারপর ভুলে যাই।

এবার নিজেদের বিচারের সময়, সমালোচনার সময় অত্যন্ত সতর্ক হয়ে থাকি নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তির ভান নিয়ে, আমাদের এতদিনকার অর্জিত শৌখিন পলিটিক্যাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারেক্টনেসকে অবলম্বন করে?

কিছুদিন আগে তসলিমা নাসরিন হায়দরাবাদ শহরে নিগৃহীতা হয়েছেন ইসলাম মৌলবাদীর হাতে।

তার প্রতিবাদে সামান্য কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ক্ষুব্ধকণ্ঠ ছাড়া সত্যি কতটা মুখর হয়েছি আমরা?

দুটো কারণ অনুমান করতে পারি।

প্রথম কারণ, হুসেনের স্বরস্বতী বিতর্ক। বা দীপা মেহতার 'ওয়াটার'-এর সময় যে কত প্রতিবাদপত্রে, কত ই-মেল স্বাক্ষর সংগ্রহে সই করেছি আমি নিজে, তা গুনে বলতে পারব না।

এবার তো কই, আমার ই-মেল ইনবক্স-এ কোনও প্রতিবাদ-সংবাদ দেখলাম না। কোনও এসএমএস এল না তসলিমার এই অপমানের বিরুদ্ধে কোনও সৎ নির্ভীক প্রতিবাদের ডাক নিয়ে।

মৌলবাদের ধর্মবিভাজনও কি মৌলবাদ নয়?

হিন্দু মৌলবাদকে আমরা যতটা নির্মমতায়, যে তীব্র তিরস্কারে আক্রমণ করি, ইসলাম মৌলবাদের বেলায় তুলনায় আমরা সংযত, সদয়, প্রশ্রয়ী হব কেন?

যেন হিন্দু মৌলবাদ নিজের সন্তানের অবাধ্যতা, তাকে নির্বিচারে শাসন করার অধিকার আছে।

আর, ইসলাম মৌলবাদ যেন পাশের বাড়ির দুষ্টু ছেলেটা—প্রগতিশীল মানুষ হিসেবে তাকে স্বল্প শাসন করাটাই সামাজিক রীতি।

আমাদের এই সতর্ক পলিটিক্যাল কারেক্টনেস-এর দায়, হিন্দু আর মুসলমানকে সহোদর বলে চিনতে দেয় না।

দ্বিতীয় কারণটা যেটা আমি ভাবছি, আরও অনেক বেশি নিষ্ঠুর।

তবু কারণ হিসেবে সেটা একবার চোখ মেলে দেখার চেষ্টা করি?

তসলিমা আপাতত ও বাংলারও নন, এ বাংলারও নন।

অতএব, তাঁর অসম্মানের প্রতি আমাদের কারওর কোনও দায়িত্ব নেই।

'বহিরাগত' শব্দটিকে কি তাহলে বড্ড বেশি সিরিয়াসলি মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছি আমরা?

২৬ আগস্ট, ২০০৭

শরতের বুকের মাঝখানে পৌঁছে গেলাম আমরা। ভাদ্রমাসের সংক্রান্তি বেশিরভাগ মানুষের কাছেই বিশ্বকর্মা পুজো, কারও কারও কাছে শরৎচন্দ্রের জন্মদিনও বটে।

আশ্চর্য লাগে এই ভেবে যে দেবানন্দপুরের এই নারীদরদী কথাশিল্পীর যাত্রা শুরুর দিন সংস্কৃতির বিবর্তনক্রমে প্রধানত এক পৌরুষের উৎসব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বকর্মা পুরুষদেবতাও। যদিও আমাদের ছোটবেলায় হিন্দি সিনেমা তখনও গাঁকগাঁক করে বসার ঘরে ঢোকেনি—অনেক সময় বিশ্বকর্মা ঠাকুর আনার সময়ে দু-একটা লরি বা টেম্পো থেকে 'বিশ্বকর্মা মাঈকি জয়' শুনিনি তা নয়। বিশ্বকর্মার আরাধনা হয় শ্রমিকদের কর্মমন্দিরে। কল-কারখানার কর্মীদের মাঝখানে।

আমরা যারা ছোটবেলায় কোনও শিল্পাঞ্চলে বড় হইনি, বিশ্বকর্মা পুজোর আয়োজন দেখেছি ছোটখাটো গ্যারাজে, গাড়ির মেকানিকদের ডেরায়।

এ এমনই এক উৎসব, যেখানে পুজোর জোগাড়যন্ত্র থেকে শুরু করে উপোস করার দায়িত্বটুকু অবধি পুরুষদের।

দেবার্চনায় চিরাচরিত নারীর যে সনাতন কল্যাণী মূর্তিটুকু অন্দর থেকে নিশ্চুপে তার ভূমিকা পালন করে চলে, এই পুজোতে এসে কোথায় যেন সেটাকে অন্তর্হিত হতে দেখি।

বিশ্বকর্মা পুজো কায়িক কর্মীর ছুটির দিন, উৎসবের দিন, মদ্যপানের দিন। প্রায় যেন সমাজসিদ্ধভাবে।

কলকারখানার বাইরে বিশ্বকর্মার অধিষ্ঠান কতগুলো রঙিন কাগজের ভাসমান টুকরোয়। ঘুড়ি ওড়ানোর উদ্দাম উৎসবে।

ভাদ্রশেষের আকাশজুড়ে, বাজি জেতার এই এক অপূর্ব বর্ণময়তা, এখনকার কলকাতায় তেমন করে আর দেখতে পাই না, যেমনটা দেখেছি ছোটবেলায়।

পাড়ার এ ল্যাম্পপোস্ট থেকে ও ল্যাম্পপোস্ট জুড়ে, তাঁতির তাঁতের মতো সুতোয় মাঞ্জা দেওয়া। রঙের সঙ্গে কাচের মিহিগুঁড়ো মিশিয়ে সুতোর গায়ে এক বিপজ্জনক আদর।

ঘুড়ি ওড়ানোর সময় সত্যিই যেন সবাই দিগ্বিদিকশূন্য। ছাতের পাঁচিল বেয়ে কত দৌড়োতে দেখেছি পাড়ার দাদাদের। কাটা ঘুড়ি ধরবে বলে।

মনে পড়ে গেল, কয়েকদিন আগেই জন্মাষ্টমীর সময় মুম্বই ছেড়ে টরোন্টো রওনা দিচ্ছি।

তিথিটা তেমনভাবে মনে ছিল না। ফলে শেষ মুহূর্তের কোনাকাটাগুলো থমকে গেল।

মুম্বই জুড়ে, বিশেষ করে জুহু অঞ্চলে, যেখানে আমি ছিলাম—সব দোকানপাট বন্ধ। সেদিন মহারাষ্ট্রের পুরুষ, যুবকদের প্রাণের উৎসব 'গোবিন্দা আলা রে'।

কখন যে কোন বিবর্তনের মুখে দাঁড়িয়ে ননীচোরের সারল্য পৌরুষের দৃপ্ত আস্ফালন হয়ে গেছে, জানি না।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে, গলির ভেতরে, পাড়ার মধ্যে কোনও একটা উঁচু বাড়ির বারান্দ থেকে শিকেয় হাঁড়ি ঝোলানো আর যুবকদের দল পিরামিডের মতো ব্যূহ রচনা করে জেতার জন্য পিঠ পেতে বহন করছে সেই নায়ককে, যে হাঁড়ি ভেঙে নামিয়ে আনবে খুচরো পয়সার পুরস্কার।

আমার এক বন্ধু বললেন, তাঁর গাড়ির ড্রাইভার নাকি গত দেড় মাস ধরে রিহার্সাল দিতে চলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাচ্ছে এই উৎসবের জন্য।

শুনলাম আজকাল নাকি এই অনুষ্ঠানগুলোর বড় বড় স্পনসর আছে। হাঁড়িতে আর খুচরো পয়সা থাকে না। পুরস্কারমূল্য অনেক সময় প্রায় লাখ পাঁচেক টাকা।

একটা ভয় হল। এটা হিন্দু মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের ক্যাডার নির্বাচনের অডিশন নয় তো!

আগে শুনেছি, ঘুড়ির গায়ে হাজার টাকার নোট লাগিয়ে উড়িয়ে দিতেন কলকাতার বাবুরা।

আমরা সেটাকে সামন্ততন্ত্রের খেয়াল বলে পাত্তা দিইনি।

তারপর ধীরে ধীরে কলকাতায় বা বাংলায় ঘুড়ি ওড়ানোর আনন্দ কেবল উৎসবের আনন্দই ছিল। তার কোনও গভীর ধর্মীয় তাৎপর্য দেখিনি। মুম্বইতে যেটা দেখলাম সেটা সত্যিই একটু আশ্চর্যের। ভীতিকরও বটে।

তবে কি সত্যিই কোনও মহাযুদ্ধ আসছে? গোপনে তৈরি হচ্ছে অক্ষৌহিণী সেনা? মনে পড়ে গেল, পূর্বে শারদারম্ভেই রাজার মৃগয়া কিংবা যুদ্ধে যেতেন।

আশ্বিনের অমল আলোয় তখনও কি এত হিংসা লুকিয়ে ছিল?

১৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৭

AMARBOI.COM

দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সম্মান জানাবে মকবুল ফিদা হুসেনকে। তারই মানপত্র লিখছিল আমার বন্ধু সোহিনী।

হুসেন সম্পর্কে বিশদে পড়াশোনা করবে বলে স্বভাবসিদ্ধভাবেই ইন্টারনেট ঘাঁটতে গিয়ে একটা অদ্ভুত জায়গায় হোঁচট খেল সোহিনী।

হুসেন নামটা টাইপ করলেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে হদিশ দিতে আসছে অনেকগুলি সম্প্রতি নির্মিত antiblogs —যার দৌলতে হুসেন-এর প্রধানতম পরিচয় তাঁর রেখা সৌষ্ঠব নয়, তাঁর বিষয় বৈচিত্র্য নয়, তাঁর নগ্ন পদ নয়, এমনকী জরুরি অবস্থার সময় আঁকা স্বৈরাচারিণী প্রধানমন্ত্রীর মাতৃনির্মাণের ন্যক্কারতাও নয়।

যাঁরা আজকের এই ইন্টারনেট সম্বল করে মকবুল ফিদা হুসেনকে চিনতে চাইবেন, তাঁদের কাছে এই শিল্পীর একটাই পরিচয়—তিনি সেই বাড়াবাড়ি রকমের স্পর্ধাশীল যবন তিনি সরস্বতীকে নগ্নিকা করে হিন্দুধর্মকে অপমান করেছেন।

হুসেন-এর এই সরস্বতীসৃজন ১৯৭৬ সালে। আর নব্বইয়ের দশকে হঠাৎ কোনও এক হিন্দু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিন সকালবেলা দিদাই স্নান করাচ্ছিল কৃষ্ণ রাধাকে। মখমলের পোশাক খুলে, জরির উত্তরীয় সরিয়ে আবার উঁকি মারল অনাবৃত পেতল শরীর। জলভরা রুপোর বাটিতে চানে নামলেন কৃষ্ণ রাধা।

সারাজীবন কূলছাপানো যমুনার জলে, বৃন্দাবনের অবারিত রোদে স্নান করেছে যে দুটি স্বর্ণশরীর, ঠাকুরঘরের জানলা দিয়ে আসা চিলতে আলোয় হঠাৎ সেই পোশাকবিহীন প্রণয়ীযুগলকে কেমন যেন আড়ষ্ট দেখাল।

কৃষ্ণের বাঁশিবিহীন মুরলীধারী ভঙ্গি কী আড়াল করছে কে জানে, আর রাধিকার হাত দু'খানি যেন কাঠ হয়ে গিয়েছে লজ্জায়। তাই বুঝি বেঁকে দাঁড়িয়ে আছে রাধারানী—ওই তেরছা ভঙ্গির আড়াল যতটুকু আব্রু দিতে পারে।

খোলা রাস্তায়, খোলা আকাশের তলায়, সকালের রোদে যে মূর্তি দুটি ছিল স্বাধীন, সুঠাম, দৃপ্ত—বসনবিহীন অবস্থায় তাদের যেন কেমন বিড়ম্বিত, সঙ্কুচিত মনে হল। বুঝলাম দু মাসের অভ্যেসে কৃষ্ণরাধাই কেবল পোশাক পরছেন তা নয়, পোশাক-ও ওঁদের পরতে শুরু করেছে। আর সেই সঙ্গে, সেই প্রথম বুঝলাম নগ্নতা কাকে বলে।

নগ্নতা শব্দটার মধ্যেই আসলে পোশাক লুকিয়ে আছে। ইংরেজি ভাষায় naked আর nude বললে যে তফাৎটুকু হয় বাংলায় আপাতত সেটির জন্য 'উলঙ্গ' আর 'নগ্ন' শব্দদুটি বেছে নিচ্ছি। (ভাষাবিদরা মার্জনা করবেন) পোশাক শব্দটির বাস যেমন একই সঙ্গে আবরণ আর উন্মোচনের এক রহস্যময় দোলাচলের সন্ধিক্ষণে, নগ্নতা শব্দটিও তেমনি একই সঙ্গে ছুঁড়ে দেয় আবরণ ও উন্মোচনের এক যুগ্ম অনুষঙ্গ। আবরণ না থাকলে নগ্নতা হয় না।

উলঙ্গের কোনও পোশাক নেই, নগ্নর আছে। সেই পোশাকের আবরণ উন্মোচিত করলে, তবেই সে 'ন্যুড' বা 'নগ্ন'।

পোশাকের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা আমরা সকলেই জানি—প্রাকৃতিক প্রাখর্য থেকে সুরক্ষা ও লজ্জা নিবারণ। সামাজিক সংজ্ঞা নিঃসন্দেহে শ্রেণি অভিজ্ঞান—পোশাকই আলাদা করে চিনিয়ে দেয় অরণ্যবাসী বা নাগরিককে, শীত কিংবা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বাসিন্দার প্রভেদ, এবং ধনী এবং বিত্তহীনের বিভাজন।

অত্যন্ত ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে পোশাক প্রতিটি মানুষের দৈনন্দিন নন্দনচর্চার অবকাশ। শাড়ির ক্ষেত্রে ব্লাউজটি খুঁজে নিয়ে পরে, কিংবা কোনও বিশেষ প্যান্টের সঙ্গে শার্ট গুঁজে পরব না ঝুলিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দিনে অন্তত একটিবার নেহাৎ অশিল্পীও চিত্রকর বা ভাস্কর হয়ে ওঠেন। এমন চটজলদি শৈল্পিক তৃপ্তি আর কিছুতেই আছে কিনা জানি না।

এবং সেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছি যখন কোনও গহীন গূঢ় অবচেতন মানবমন পোশাকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে দিয়েই গড়ে নেয় অনাবৃতের ইশারা, তখনই আমরা আবার করে ভাবতে বসি 'নগ্নতা' আগে, না 'পোশাক' আগে? উলঙ্গ-পোশাক-নগ্ন এই কি তবে পর্যায়ক্রম?

ঠিক যেন 'স্ট্রিপটিজ' নৃত্যে নগ্নতার ভূমিকা যতখানি, ঠিক ততখানি পোশাকের—একটিকে বাদ দিলে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয় অন্যটির আবেদন, ঠিক তেমন করেই বোধ করি সামাজিক শিষ্টতা এবং ইন্দ্রিয় অভীপ্সার মধ্যে দিয়েই টলমল পায়ে যাত্রা করে চলেছে মানবসভ্যতার শ্লীল অশ্লীলতার প্রশ্ন।

নগ্নিকা শব্দটির উচ্চারণ সাধারণভাবেই এক রহস্যময় যৌনতার ইঙ্গিতে আক্রান্ত করে চেতনা। একটিবার যদি মনটা সরিয়ে নিয়ে ভাবি পথের ধারের কোনও বস্ত্রহীনা উন্মাদিনীর কথা; কিংবা কোনও অনাবৃত মৃতদেহ বা চরম দারিদ্রের নিষ্ঠুর নিরাবরণ—তখন কি এই 'নগ্নিকা'ই ফিরে আসে না এক গ্লানিময় চিৎকার হয়ে?

ঠিক যেমন এই নগ্নিকাই অবার কেমন পবিত্র হয়ে ওঠেন, যখন প্রস্তরীভূত মর্মরমূর্তির অনাবৃতা নারীদের কখনও সেই বিষণ্ণ মৎস্যকন্যা হয়ে রোদ পোহান কোপেনহেগেন শহরের হলদে আলোর মধ্যে কিংবা গ্রিক দেবী হয়ে অনাবৃতা দেহভঙ্গির সঙ্গীতে উজাড় করে দেন রাশি রাশি পুণ্যতা।

নগ্নতা সম্পর্কে আমাদের সাধারণ অভিযোগ যে নগ্নশরীর যেহেতু সামাজিক নয়, অতএব মানবিকও নয়। যেন একটা সমগ্র মানুষ থেকে কেবল তার নগ্ন শরীরটুকু আলাদা করে ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে কেবল একটা যৌন আবেদন নির্মাণের অভিপ্রায়ে। অতএব নগ্নতা মানবিকতার এক স্খলিত ও খর্বকায় আংশিক প্রতিকৃতি— যৌনতার পণ্যীকরণ।

পাশাপাশি যদি ভিক্টোরিয়ার পরীর কথা ভাবি কিংবা প্রায় দেবদূতসম নগ্ন শিশু, যারা কিনা সংস্কৃতির আইকন অভিধানে ন্যায় ও অপাপবিদ্ধ পবিত্রতার প্রতিশব্দ, তখন তো কই আমরা বলি না— যে একটা গোটা মানুষের ভেতর থেকে কেবল পবিত্রতাটুকু বের করে নিয়ে তাকে যখন অনাবৃত শরীর দিয়ে চিত্রিত করা হচ্ছে, সেটাও পণ্যীকরণ—পবিত্রতার পণ্যীকরণ।

উলঙ্গ শিশু প্রকৃতির কাছাকাছি। যা কিছু কৃত্রিম বা মানবসৃষ্ট চাতুরী তাকে সরাসরি সমালোচনা করার প্রয়োজনে এই অকৃত্রিমতার ব্যবহার বারবার করে এসেছি আমরা। ফুলের মতো নিষ্পাপ ও শিশুর মতো সুন্দর যখন বলি, নিঃসন্দেহে সেই কনিষ্ঠ মানবদেহে আমরা কোনও বসন কল্পনা করি না। এমনকী অনাবৃতা শিশুদেহে আমরা লিঙ্গভেদও করি না। শিশু শিশুই—সে পুরুষশিশু বা নারীশিশু নয়।

এবং নিরাবরণ শরীর একই সঙ্গে পরম পবিত্রতা এবং চরম অশ্লীলতার যুগ্ম সংজ্ঞাবাহী।

প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কী করে, এবং কোনটাকে নির্বাচন করব?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রাবণ মাসের পর থেকেই কালীঘাটের পটুয়াপাড়ার রাস্তা দিয়ে যখনই যাই, দেখি রাস্তার দু'পাশে কুমোরের আখড়ায় সার সার একমেটে দশভুজা দাঁড়িয়ে আছেন। মনটা তখনই কেমন যেন খুশি খুশি হয়ে ওঠে। সেই ভরা শ্রাবণের সোঁদা গন্ধের মধ্যেও যেন পুজো প্যান্ডেলের ত্রিপল-ধুনো-কুচো ফুল-পাটভাঙা তাঁতের শাড়ির গন্ধ বৃষ্টির ধারার মতো অবিরত ঝরতে থাকে। আর যাতায়াতের পথে অবাক হয়ে দেখি কেমন করে ধীরে ধীরে পূর্ণ কান্তিময়ী, পূর্ণঅবয়বময়ী হয়ে উঠছেন দশভুজা। মৃৎনারীর শরীরজুড়ে বাঁকচুর, বঙ্কিম বা ঋজু সুডৌলতা কেমন যেন গুহামানবীর মতো আদিম প্রাগৈতিহাসিক দেখায়, যেন জননী বসুন্ধরার মাটির কন্যারা সব একসঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। তারই মধ্যে, অতগুলি পূর্ণযৌবনার মাঝখানে অবলীলায় কাজ করে চলেছেন সব পুরুষ মৃৎশিল্পীরা। কখনও অ্যাসবেসটসের ছাউনির ফাঁক দিয়ে আসা রোদে, কখনও রাতে লোডশেডিং এর অন্ধকারে কুপির কম্পমান রহস্যআলোয়। এবং কোনদিনই তাঁদের কাউকেই বিশ্বসুন্দরী নির্বাচনের সভার বিচারকদের মতো আড়ষ্ট বা সচেতন লাগে না।

তারপর যখন একদিন শ্রাবণের মেঘ কেটে যায়, মাটির শরীরগুলি সব সাদা হয়ে গিয়ে যেন কাশকুমারীর মতো দেখায়, (অঞ্জন দাশ-এর 'ফালতু' ছবিটিতে এমন একটি অনবদ্য দৃশ্য ছিল), মনে হয় পশ্চিমের যে কোনও দেশের জাদুঘরের কিউরেটরকে ডেকে এনে দেখাই, বলি যে, 'পারবে তোমরা এমন করে গোটা একটা পাড়া জুড়ে মাটির ঢেলাকে রক্তমাংস করতে, আর রক্তমাংসের শরীরকে অমন করে মায়াবী শিল্পের চেহারা দিতে?'

তারপর ভাদ্র মাসের শেষের দিকে মৃৎশরীরে হলুদ রং পড়ে আর আমি আমার যাতায়াতের রাস্তা বদলাই। দেবীর মুখে, গলায়, হাতে পায়ের গোছ থেকে পাতার কাছ অবধি হলুদ রং লাগে। কেবল শাড়ি পরানোর জায়গাটুকু সাদাই থেকে যায়, আর গাড়ির জানলায় কাচ তুলে দিতে দিতে, চোখ ফিরিয়ে নিতে নিতে আমি ভাবি-ইস্, শাড়িটা পরাবে কবে?

যে নগ্নিকারা এতদিন আমার বন্ধু ছিল, যাতায়াতের পথে আমার রোজকার আনন্দ ছুড়ে দিয়ে যেতাম যাদের দশ হাতের মুঠোয়, আমার সেই শারদ-সঙ্গীরা যেন হঠাৎ করে অন্য মানুষ হয়ে গেল, যেন তাদের মা'রা ডেকে তাদের বলেছে—'পেনি পরে ধিঙ্গিপনা অনেক হয়েছে। আজ থেকে শাড়ি না পরে বাইরে বেরোবে না।'

তারপর পুজোর সময়ে প্যান্ডেলে যে আসে সাটিনের শাড়ি পরে, সে আর আমার বন্ধু নয়। বড়জোর হলে কপালে জোড়হাত ঠেকিয়ে তাকে অভিবাদন জানাতে পারি—তাকে আর—'কীরে! কেমন আছিস?' বলতে ইচ্ছে করে না।

জয়াদি (মিত্র) একটা গল্প বলেছিল। ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজের মন্দিরে উঠতেই বাঁদিকে একটা চমৎকার পার্বতীমূর্তি ছিল। যতবার ভুবনেশ্বরে যেত জয়াদি, পার্বতীর সঙ্গে একবার দেখা না করে আসত না। শেষবার দেখা করতে গেল একটা ক্যামেরা নিয়ে—ছবি তুলে রাখবে বলে। সেই শেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখা পার্বতীর সঙ্গে। পাথরের পার্বতীকে কারা যেন লাল পাড় কোরা শাড়ী পরিয়ে দিয়েছে। সিঁদুর লেপে লাল করে দিয়েছে সিঁথি আর ঠোঁট। সে পার্বতীকে আর কি গিয়ে বলা যায়—'কী গো, কেমন আছ?'

কয়েকসংখ্যা আগে রোববার-এ আমার একটা ছবি বেরিয়েছিল ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল গ্যালারিতে। একটা ভেনাস মূর্তির সামনে।

এই মূর্তির স্রষ্টা এক পশ্চিমী ভাস্কর—অ্যারিসটাইডি মাইলো। ১৯১৮ থেকে ১৯২৮, এই দশ বছর ধরে গড়া হয়েছে ব্রোঞ্জের এই ভেনাস প্রতিমা।

মূর্তিটির কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই চমকে উঠলাম। কালো কুচকুচে ব্রোঞ্জ মূর্তি, একটি হাতে ঠিক যেন বীণাবাদিনীর ভঙ্গি, অন্য হাতে বরাভয়। প্রথমেই আশঙ্কা হল, 'এই নগ্নিকা এখানে যথেষ্ট নিরাপদ তো!'

তারপর ধীরে ধীরে ছোটবেলার দেব সাহিত্য কুটিরের কোনও এক পুজো সংখ্যায় পড়া একটা গল্প মনে পড়ে গেল। নাম, লেখকের নাম কিছু মনে নেই। কেবল একটা কথোপকথন মনে আছে।

একটি ছোট বাচ্চা এক পাগল ভবঘুরে বেহালাবাদককে জিজ্ঞেস করেছিল

—এমন ধবধবে একটা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাথায় হঠাৎ একটা কুচকুচে কালো পরি কেন?

বেহালাবাদক উত্তরে বলেছিল

—ওটা সাদাই ছিল প্রথমে। আমাদের শহরের সমস্ত পাপ, অন্যায়, অশ্রদ্ধা, অসহিষ্ণুতা ধীরে ধীরে জমাট বাঁধতে বাঁধতে সাদা পরিটাকে কালো করে দিয়েছে। মুখ তুলে দেখি ভেনাসের ছদ্মবেশে এক কৃষ্ণাঙ্গী সরস্বতী আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমার কানের কাছে শুনতে পাচ্ছি

জয় জয় দেবী চরাচর সারে

কুচযুগ শোভিত মুক্তা হারে...

অঞ্জলি শেষে একটাই কথা বলে এলাম সেই প্রবাসিনী প্রতিমাকে,

—ভাগ্যিস তুমি কৃষ্ণা। তোমাকে নগ্ন সরস্বতী বলে হয়তো কেউ ভুল করবে না। তাই ভাল। যেভাবেই থাক, ভাল থেকো তুমি।

৪ নভেম্বর, ২০০৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব চরিত্র কাল্পনিক-এর শেষ পর্যায়ের শ্যুটিং ছিল বোলপুরে।

ভোরবেলা গণদেবতায় যখন রওনা দিয়েছি, তখন থেকেই আকাশের মুখ গোমড়া। রোদের সঙ্গে আড়ি হয়েছে দিনকয়েকের মতো।

খবর পাচ্ছি কলকাতার অঝোর বর্ষণ। বোলপুরে মাঝে মাঝে মৃদু টুপটাপ। আর বেজায় ঠান্ডা হাওয়া।

একদিন শ্যুটিং শেষ হয়ে গেল সকাল সকাল, দলবেঁধে সবাই উত্তরায়ণ দেখতে গেলাম। সেই 'চোখের বালি'র আগে বেশ কয়েকবার ঘনঘন গিয়েছিলাম। এবার বহুদিন পর আবার।

প্রদর্শনী কক্ষ সরে গিয়েছে একতলা থেকে দোতলায়। আমি জানতাম না। সাজানো জিনিস অদলবদল হয়েছে অনেক।

আগের কয়েকবার যখন গিয়েছি, তখন 'চোখের বালি' সংক্রান্ত জিনিসপত্রই খুঁটিয়ে দেখেছি মন দিয়ে। বাকি অনেক কিছুই হয়তো মন ধরে রাখেনি তেমন যত্নে।

মৃণালিনীর একটা বেগুনি রঙের শাড়ি আর একটা ছোট্ট বালাজোড়া ছিল। নিতান্তই বালিকার হাতের মাপের। মনে আছে বহুক্ষণ সেটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতাম তখন।

রবীন্দ্রনাথের বিশাল মাপের নাগরা, অতিকায় পোশাকের পাশে সেই ছোট্ট বালাজোড়া কোথায় যেন চিনিয়ে দিয়েছিল এক অসম দাম্পত্যকে। আর মনে মনে হয়তো নিজের মতো করেই তৈরি হয়েছিল অবহেলিতা আশালতার সসংকোচ সারল্য।

আমার সঙ্গে আমার ইউনিটের বয়োকনিষ্ঠ বন্ধুরা ছিল। আর আমার ওপরে কেমন করে যেন অযাচিতভাবেই এসে পড়ল প্রদর্শনীর ঘুরিয়ে, বুঝিয়ে দেখানোর দায়িত্ব।

আর সেই সঙ্গেই হয়তো বা খেয়াল করলাম রবীন্দ্রজীবনের এই নথিপত্র, সামগ্রীস্মারকের সম্ভারে কোথায় যেন আশ্চর্যজনকভাবে অনুপস্থিত এক রবিমানসী!

কোথাও খুঁজে পেলাম না কাদম্বরী দেবীর কোনও চিহ্ন।

কাদম্বরীর সঙ্গে কবির সম্পর্ক প্রণয়ের না বাল্যবন্ধুতার—তা নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক উৎসাহ কৌতূহলের নিরন্তর টানাপোড়েনের কথা আমরা জানি। পুরোটা সত্যি না পাঠক বা পণ্ডিতের অত্যুৎসাহী কল্পনা, এ নিয়ে তর্কের অবকাশ হয়তো বা আছে।

কিন্তু জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির এই শ্যামবর্ণা, আত্মঘাতিনী, বিষাদরমণী কোথাও যে কবির মনে তাঁর সুচারু স্পর্শ নিয়ে চিরজাগ্রত হয়েছিলেন সারাজীবন, সে কথা তো অস্বীকার করার উপায় নেই।

কিন্তু আজ সেই কবি যেখানে প্রতিষ্ঠান, সেই অন্তরালের প্রেরণাদাত্রীকে কেমন করে যেন কঠোর নির্বাসনে পাঠিয়ে দিয়েছে প্রতিষ্ঠানের শক্তি।

রবির নতুন বৌঠান বুঝি বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঈশ্বরপ্রতিম জীবনের এক অতর্কিত অমার্জনীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্খলন। ফলে রবীন্দ্রনাথের দেবালয়ে তাঁর কোনও স্থান নেই।

বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, পশ্চিমে হলে এমনটা নাকি হত না।

মনে পড়ল মাদাম ট্যুসোর মোম জাদুঘর। ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছেন বাকিংহাম রাজপরিবার। প্রিন্স ফিলিপস, রানি এলিজাবেথ, দুই পুত্র। কেবল আশ্চর্যজনকভাবে নির্বাসিত রাজবধূ ডায়না।

তাঁর স্থান উল্টোদিকে, একাকিনী। রাজপরিবারের মুখোমুখি। 'প্রিন্সেস অফ দ্য পিপল' দৃপ্ত , উচ্ছলতায় তাকিয়ে আছেন বাকিংহামের রাজতন্ত্রের দিকে। দৃষ্টিতে যেন এক নীরব উপহাস।

একজায়গায় পুব পশ্চিম সবই যেন এক। যেমনটি এক ধর্ম আর শক্তির আস্ফালনে। যুগে যুগে, কালে কালে। অবিকল এক চেহারা, এক প্রতিকৃতি। প্রাতিষ্ঠানিক রোষের কবলে কোনও কোনও অবাঞ্ছিতের নির্বাসন।

এ বছর কলকাতায় বইমেলা হবে কিনা শেষ অবধি জানি না। কিন্তু হ'লে তসলিমাকে ছাড়াই হবে, সেটা তো অন্তত বুঝতে পারছি।

১০ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮

AMARBOI.COM

আজকাল যে কোনও সামাজিক সম্মিলনের মধুরালাপের প্রথম অবধারিত বাক্যটিই হল —ওমা! কি রোগা হয়ে গিয়েছ তুমি!

বক্তা জানেন শ্রোতা এই বাক্যটি শুনে সামান্য লজ্জা লজ্জা মুখ করবেন, কিন্তু অপরিসীম তৃপ্তি পাবেন। এবং বক্তার সঙ্গে শ্রোতার সম্পর্কের আনুপূর্বিক ইতিহাস যা-ই থাকুক না কেন এই বাক্যটির পর সেটা সাময়িকভাবে আনন্দময় এবং শান্তিপূর্ণ হতে বাধ্য।

রোগা কথাটির বাংলা মানে ছিল রুগ্ণ। আজ এই শব্দটিই সার্বজনীনভাবে সুস্বাস্থ্যের দ্যোতক।

আমি নিজে ছোটবেলায় বেজায় মোটা এবং কালো ছিলাম। আমার ঠাকুমা বলত 'কালো, জগতের আলো'। আর মা বলত 'মোটা, আবার কিসের?'

স্কুলে আমি স্পোর্টস-এর সময় স্বাভাবিক রেস-এ দৌড়োইনি কোনওদিন। আমাকে 'ফ্যাট রেস'-এর প্রতিযোগী করা হত।

মেয়েলি বলে যে প্রান্তিকতার অপমান আমাকে বারবার আক্রমণ করেছে, মোটা বলে তার থেকে কিছু কম করেনি কোনওদিন।

তারপর কলেজে উঠতে উঠতে আবার রোগা হয়ে গেলাম। মধ্যিখানে বেজায় মোটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিলাম—আপাতত কিছুটা ঝরিয়েছি।

যাঁরা চট করে জানতে চান কি করে তিনটে সহজ টিপস। মিষ্টি খাই না। কফিতে চিনি খাই না। সরাসরি ভাজা খাই না। মানে ভাজা জিনিসটায় জল পড়ে তরকারি না হলে খাই না।

আর Aerated drinks মানে কোক, পেপসি, লিমকা চেষ্টা করি না খেতে। Diet Coke হলেও নয়।

মোটা মানুষরা বরাবরই মানবচরিত্র চিত্রণের এক অদ্ভুত গণ্ডিতে দাঁড়িয়ে। কৌতুক কিংবা ক্রূরতার।

তাঁরা কোনওদিনই যেন সাধারণ মানুষ নন। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের বর বউ থেকে শুরু করে গোপাল ভাঁড়ের আনুমানিক চিত্র-পৃথুলতা মানেই হয় কৌতুক, কিংবা অসৎ ক্ষমতার চূড়ান্তীকরণ।

আমলকীর রাজা বা হাল্লার কূটবুদ্ধি মন্ত্রীর চেহারা মনে পড়ছে নিশ্চয়ই।

এটা এমনই একটা ফর্মুলা যেটা কমার্শিয়াল ছবি কিংবা নন-ফর্মুলা আর্ট ফিল্ম কেউ-ই এড়াতে পারেনি।

শশী কাপুরের মতো সুঠামদেহী নায়ক যেই মোটা হলেন, গিরিশ কারনাডের 'উৎসব' ছবিটিতে অমনি তিনি লাম্পট্য ও লালসার প্রতীক—মূর্তিমান খলনায়ক। কিংবা 'ইনকাস্টড'র অলস ভোগলিপ্সু নবাব। মনে হয়, ধারণাটি যেন সত্যিই প্রায় পৌরাণিকভাবে আমাদের মনে গেঁথে আছে।

আমার মনে আছে শাঁওলীদি যখন 'সাথবতী অনাথবৎ' করতেন, দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় দুর্যোধন এবং তাঁর একশো ভাইয়ের প্রবেশ দেখানোর জন্য যে পৃথুলতার ভঙ্গী গ্রহণ করতেন মঞ্চে, তার মধ্যে কেবল কৌতুক নয়, অবমানবের প্রতি একটা তীব্র বিধৃত বিবৃত হত।

কৌশিক গাঙ্গুলি একটা ছবি করেছিলেন—'শূন্য এ বুকে'। তাতে অপরিণত বক্ষ নারীর সামাজিক অবমাননার কথা ছিল।

কিন্তু ছবির গোড়াতেই টোটা (রায়চৌধুরী) যে চরিত্রটি করেন, তিনি তাঁর এক মোটা বন্ধুকে সহজেই বিদ্রূপ করেন—এবং মানবদেহের অসম্পূর্ণতার বেদনার মধ্যে যে ছবিটির আত্মা নিবিষ্ট—সেই ছবিটি পৃথুলতাকে সহজ মানবিক সত্য বলে অস্বীকার করে কৌতুকে হেসে ওঠে।

যুগ যুগ ধরে শারীরিক স্থূলতাকে, মানসিক স্থূলতার সঙ্গে একাত্মীভূত করে যে অপমান কাহিনি রচিত হয়েছে—সেটা ঔপনিবেশিকতার ফল না মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব, সেটা সমাজতত্ত্ববিদ বা ঐতিহাসিকরা বলতে পারবেন, কিন্তু আমাদের প্রজন্ম গোড়া থেকেই এই বৈষম্যে বিশ্বাসী বলেই জেনেছি। পৃথুলতা কেবল মাত্র স্বাস্থ্যবিধির লঙ্ঘন নয়, একটা সামাজিক অস্পৃশ্যতা প্রায়।

একটা ছোট্ট ঘটনা বলে শেষ করব। ঘটনাটি রিঙ্কুদির (শর্মিলা ঠাকুর) কাছে শোনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শর্মিলা ঠাকুরের মেজো মেয়ের নাম সাবা। সে সইফ বা সোহার মতো সদেহী, সুন্দরী নয়। কিছুটা পৃথুলা, তুলনায় সাধারণ দর্শন।

গ্ল্যামারাস নায়িকা শর্মিলা ঠাকুর কন্যার এই অবহেলার স্থূলতার বিষয় প্রায় অসহিষ্ণু ছিলেন।

একবার নানাভাবে সাবাকে যখন প্রায় প্ররোচিত করছেন—রোগা না হলে কি করে চলবে তোমার। ....এত মোটা হলে লোকে কি বলবে?...ইত্যাদি ইত্যাদি...সাবা একটাই উত্তর দিয়েছিল— মা। তুমি যদি মোটা হিসেবে আমায় মেনে নিতে না পার, তাহলে লোকে মেনে নেবে কি করে? লোকে তো বলবেই।

যতদূর জানি, রিস্কুদি সাবাকে আর কোনওদিন রোগা হওয়ার জন্য জোর করেননি।

২ মার্চ, ২০০৮

খেলাধুলোর মধ্যে সরাসরি কখনও ছিলাম না বলে বাঙালির এই অতি প্রিয় কোন্দলটি আমাকে সত্যি রক্তমজ্জা দিয়ে তেমনভাবে স্পর্শ করেনি কোনও দিন।

উত্তম বনাম সৌমিত্র, সুচিত্রা বনাম কণিকা, শক্তি বনাম সুনীল— ইত্যাদি নানাবিধ সাংস্কৃতিক আনুভূতি দলবিভাগের মধ্যে দিয়ে গিয়ে বিস্তর গলা ফাটিয়ে হঠাৎ যখন সেই দ্বৈরথটার মধ্যে ঢুকে পড়ত ইস্টবেঙ্গল মোহন বাগান— তখনই যেন কেমন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়তাম।

জন্মসূত্রে আমরা পূর্ববঙ্গীয়— অতএব ইস্টবেঙ্গল। এবং সেটা নামেই মাত্র। ইস্টবেঙ্গল কেন এবং কোথায় মোহনবাগানের থেকে উৎকৃষ্ট হতে পারে, তার কিছু জানি না।

কিন্তু কোথায় যেন মন থেকে প্রায় পিতৃদত্ত এই ইস্টবেঙ্গল পরিচয়টুকুও ছাড়তে পারি না।

তাই যেন কোনও কোনও বিকেল অকারণেই বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছে ইস্টবেঙ্গল হেরে গিয়েছে শুনে। হয়তো বা আমি তখন কোনও সিনেমা হলে টিকিটের লাইনে দাঁড়িয়ে।

আশপাশ থেকে একটা শোরগোল উঠল। কিছু মানুষ হই হই করতে থাকলেন। আবার কিছু মানুষ কেমন যেন পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য ঘন ঘন সিগারেট খেতে লাগলেন। আর আমি অল্প একটা ভার মন নিয়ে ভাবতে লাগলাম— কোথায় কোন একটা খেলা হল, তাঁদের বাইশজনের একজনকেও চিনি না, তাঁরা আমার বন্ধু নন। পরিচিত নন— কিচ্ছু না। তবে কেন আমি তাতে বিচলিত হব?

মোহনবাগানের হেরে যাওয়ার একটা নিষ্ঠুর স্মৃতিদৃশ্য আমার মনে আছে।

আমি তখন কলেজের প্রথম দিকে— যাদবপুর অঞ্চলের কোনও একটা বিখ্যাত জার্মানপাড়ার টিউশন করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিন বিকেলে পড়াতে গিয়ে শুনি— ছাত্র আজ পড়বে না, আজ ছুটি।

কেন?

ছাত্রীকে ধারেকাছে পাওয়া গেল না।

ছাত্রের মা বললেন

— আজ তো আমরা জিতছি (পড়ুন ইস্টবেঙ্গল।) ওরা হারছে। আজ তো উৎসব। বসেন। নাড়ু খান।

উৎসবের আয়োজন দেখে তো আমি তাজ্জব। প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। বাজি ফাটছে প্রবলতরভাবে। আর বারোটা নেড়ি কুকুরকে মোহনবাগানের জার্সি পরে পথে পথে ঘোরানো হচ্ছে সোল্লাসে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম, মনে আছে।

সে প্রায় সাতাশ বছর আগের কথা।

বেটিং-টেটিং তখনও অত পরিচিত শব্দ নয়। খেলা, তখনও অনেকটাই বুঝি বিনোদন। এখনকার মতো এমন ভয়ঙ্কর সময়াকৃতি ধারণ করেনি।

তাই, অসহায় কতগুলি পশুকে ব্যবহার করে উৎসবের এই নারকীয় রূপ! কেমন যেন ভয় করছিল আমার।

দক্ষিণ কলকাতার এই শান্ত কলোনিটিতে এ বাংলার মানুষের সাথে নির্বিবাদে প্রসন্নমনে এতদিন শান্তচিত্তে বাস করে এসেছেন যাঁরা, এক বিকেলের একটা ফুটবল ম্যাচ তাঁদের এক লহমায় 'আমরা', 'ওরা' করে দিল?

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন— এ বার উৎসবের মেজাজে ভোট দেবেন নন্দীগ্রামের মানুষ।

সেই উৎযবের শরিক হতেই নন্দীগ্রাম রওয়ানা দিয়েছিলেন স্বজন গোষ্ঠীর সতেরো জন মানুষ।

মাঝপথ থেকে তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হল।

কারণটা অনুমাণ করতে পারি।

বারোটা কুকুরের জায়গায় সেখানে হামাগুড়ি দিয়ে হয়তো বা পথ চলছেন কত শত 'মানুষ'। অলক্ষ্য লাল জার্সি গায়ে। প্রশাসন বুদ্ধিমান— তাঁরা জানেন 'স্বজন' গোষ্ঠী আসলে যতই না সমাজ-সচেতন হোন না কেন, আসলে তাঁরা সংবেদনশীল শিল্পী! উৎসবের এই চেহারাটা তাঁরা সহ্য করতে পারবেন না।

২৫ মে, ২০০৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোদ্দই নভেম্বর-এর মানে বরাবর জেনে এসেছি, নেহরুর জন্মদিন।
ফলে শিশুদিবস।
তা ছাড়া, আমার কাছে চোদ্দই নভেম্বর রাহুলের জন্মদিন।
রাহুল, আমার ছোটবেলার বন্ধু। আমরা স্কুলে একসঙ্গে পড়েছি।

গত বছরটা কেমন করে যেন সেই চোদ্দই নভেম্বরের মানেটাই বদলে দিল!
কলেজ স্কোয়ার থেকে এসপ্ল্যানেড—ঢল নেমে মিছিল করে হেঁটেছিলেন কলকাতার মানুষ। কোনও স্লোগান ছিল না, কোনও ব্যানার ছিল না—কেবল একসঙ্গে এতগুলো মানুষের পথচলা।

'চোখের বালি'-র যখন চিত্রনাট্য লিখছি, তাতে 'মিছিল' শব্দটা ব্যবহার করেছিলাম, কারও একটা সংলাপে।
শ্রী অশোক সেন শব্দটাকে গোল করে পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন,
—'মিছিল' শব্দটা তখনও বোধহয় ছিল না। একবার দেখে নিও।

সত্যিই তো!
অভিধান থেকে মিছিলের প্রতিশব্দ পেয়েছিলাম শোভাযাত্রা।
পছন্দ হয়নি। মনে হয়েছিল, তাতে যেন আনন্দটা বেশি, প্রতিবাদটা কম।
যেমন 'মিছিল'কে ইংরেজিতে 'র‍্যালি' বলে।
শুনলেই চিরকাল কেমন যেন আমার মোটর-র‍্যালি মনে হত।
কারণ আমি অশিক্ষিত।
পরিষ্কার করে অভিধানে লেখা আছে— troop assembled in united action।
পড়েও শিখিনি কোনওদিন।

যা হোক, মিছিলবার্ষিকী হয়ে গেল।
'মিছিল' শব্দটার বুৎপত্তি আমার জানা হল না।
কেউ সাহায্য করবেন, প্লিজ!

৯ নভেম্বর, ২০০৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বশক্তিমান ফেলুদার পর বাঙালির জীবনে আরেকটাই দাদা। সৌরভ গাঙ্গুলি। আদরের ডাকে মহারাজ। বাঙালির অতিপ্রিয় রাজসম্ভাষণ।

কাগজে পড়লাম এবারের আইপিএল-এ নাইট রাইডার্স-এর অধিনায়কের পদ থেকে সরানো হল সৌরভকে।

ক্রীড়াবিদরা কী বলবেন, আমি জানি না। আমি ক্রিকেট-এর বিন্দুবিসর্গ বুঝি না। কিন্তু বাঙালির আবেগটা বুঝি। আর, এ-ও বুঝি যে, উৎকর্ষের একটা ওজন না থাকলে সাফল্যের এই শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছনো অসম্ভব।

আজ খেলাটা কেপ টাউন-এ হচ্ছে বলে মহারাজকে সিংহাসনচ্যুত করাটা যত সহজ—ইডেন গার্ডেনস-এ হলেও কি ততটাই সোজা হত?

জানি না।

এমনিতেই তো নাইট রাইডার্স থেকে 'কলকাতা' বাদ হয়ে গিয়েছে। তবুও তা ছিল আসলে কলকাতারই দল। নাম থাকা না থাকায় কি কিছু যায় আসে? গতবারের মতো এবারও একইরকম থাকত সমর্থনের জোয়ার। কিন্তু, আজকের পরেও...

কি আমরা শাহরুখের টিমকে 'কলকাতা' নাইট রাইডার্স বলব? নাকি মেনে নেব যে বম্বের বাদশা, নিজের ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয়, কলকাতার মহারাজের প্রাপ্য ন্যূনতম সম্মানটুকুর ব্যাপারে আদপেই যত্নবান হলেন না।

অন্যদের কথা জানি না, এ বছরের জন্য আমি মনে মনে শাহরুখের আইপিএল টিমের নাম থেকে 'কলকাতা' প্রত্যাহার করলাম।

আপনারা কী বলেন?

২৬ এপ্রিল, ২০০৯

আপনারা অনেকেই জানেন, কয়েকটি মঞ্চানুষ্ঠিত বিচিত্রানুষ্ঠানে বা টেলিভিশন প্রোগ্রামে কতিপয় সঞ্চালক আমাকে, অর্থাৎ ঋতুপর্ণ ঘোষের নারীসুলভতাকে ব্যঙ্গাত্মক ভাবে অনুকরণ করে এসেছেন দীর্ঘদিন ধরে।

আমি চুপ করেই থাকতাম। এবং কাকতালীয় ভাবে সেই মঞ্চানুষ্ঠানগুলোতে উপস্থিত থাকলে, আমার নিজের অনুকরণ দেখে সারা প্রেক্ষাগৃহ যখন হেসে ফেটে পড়েছে, আমি নিজেও জোর করে যোগ দিতাম সেই হাসিতে—যাতে বাকি সবাই আমায় অরসিক না ভাবেন। এইভাবে কেটে গিয়েছে বছরের পর বছর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠানে এমনই একজন সঞ্চালককে আমি প্রশ্ন করেছিলাম আমায় ব্যঙ্গ করা নিয়ে।

আমার প্রশ্ন করার মধ্যে হয়তো বহুদিনের এই উপহাসসঞ্জাত কিছুটা দার্ঢ্য ছিল—সেটা দর্শকদের অনেকেই প্রায় অমার্জনীয় মনে করেছিলেন। আমার এই প্রতিবাদ যেন অভব্য, অপরিশীলিত এবং সর্বোপরি 'আমায় মানায় না'।

আরে! আমায় যখন দিনের দিন অপমান করা হয়েছে, একটা মানুষ তো উঠে দাঁড়িয়ে বলেননি যে, এ শহরের একজন বিশিষ্ট নাগরিককে কেন, কোনও মানুষকেই এমন অপমান করা যায় না। আর আমি নিজমুখে যখন প্রতিবাদ করলাম, সেটা অ-মাননসই হল বুঝি!

আজ লালগড়ের জঙ্গলমহল অভিযান দেখছি, তার খবর পড়ছি, শুনছি আর এই কথাটাই ফিরে ফিরে মনে হচ্ছে আমার।

যে মানুষগুলো এত দিন বঞ্চনার, অপ্রাপ্তির, অবহেলার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করতে করতে প্রায় যেন মেনে নিয়েছিলেন এটাই তাঁদের ভবিতব্য, তাঁরা যখন একদিন মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন—চাইলেন সুস্থ, নির্মল জীবনের অধিকার, আমরা কেবল সেটা তাঁদের দিতে অপারগ বা অনিচ্ছুক বলে তাঁদের নিমেষে 'রাষ্ট্রবিদ্রোহী' করে দিলাম।

যেন এই বঞ্চনার, অপমানের জীবনটুকুই তাঁদের প্রাপ্য—মাথা তুলে সম্মানের, মর্যাদার জীবনের চাহিদাই তাঁদের তরফ থেকে একটা 'বেয়াড়া আবদার'। এমনটা আবার করতে আছে না কি?

লালগড় নিয়ে নানা ধরনের প্রতিবাদ সভা ও মিছিল চলছে। অরাজনৈতিক মঞ্চ থেকে স্বজন- ও সম্প্রতি একটি মিছিল বার করল।

আমি জানি, এ নিয়েও অনেক কথা উঠবে। শিল্পী-সাহিত্যিকদের শৌখিন রাজনীতি-চর্চা নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ হবে আবার একচোট। কিন্তু সত্যিই যদি এই প্রতিবাদের সততার এবং একতার জোর থাকে, তার টানে আবার নড়েচড়ে উঠবে কালভৈরবের রথ।

সম্মিলিত আন্তরিক প্রতিবাদের জোর তো আমরা সম্প্রতি দেখলাম। তারপরেও নিজেদের শক্তিকে ছোট করে দেখব কেন? কেবল কয়েকটা মানুষ সেটাকে ঠাট্টার উপকরণ করবেন—এই লজ্জায়?

এই বামপন্থী পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রযোজিত একটি বিখ্যাত ছবির লাইন বলি—'দড়ি ধরে মারো টান, রাজা হবে খানখান'।

২৮ জুন, ২০০৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকস্মাৎ দু'টো ঘটনা ঘটে গেল প্রায় একই সঙ্গে। পৃথিবীর দুই প্রান্তে। একটি সারা বিশ্বের হৃদয়ে আলোড়ন তুলল। অন্যটি ভারতবর্ষকে এক নতুন জীবনচর্চার সামনে দাঁড় করাল—প্রচুর তর্ক বিতর্ক বাদানুবাদের ঝড় এনে।

এক, মাইকেল জ্যাকসন চলে গেলেন। দুই, ভারতীয় সংবিধানে ৩৭৭ ধারাকে মার্জিত করে, সমকামিতাকে শাস্তিযোগ্যতার অপমান থেকে মুক্তি দেওয়া হ'ল। আপাতভাবে দু'টি আলাদা ঘটনা। তেমনভাবে, প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত নয়।

কিন্তু আমার কাছে কোথায় যেন একটি ঘটনা অন্যটিকে জড়িয়ে ধরে আছে আষ্টেপৃষ্ঠে। ইংরিজি গান শোনার অভ্যেস আমার বরাবরই কম। ফলে স্কুল শেষ-কলেজ শুরুর জীবনে আমার অনেক বন্ধুবান্ধব যেমন জ্যাকসন-তরঙ্গে গা ভাসিয়েছিল অবাধে, আমার বেলায় তেমনটি হয়নি।

অথচ আমার ইংরিজি গানের সংস্পর্শ থেকে সম্পূর্ণভাবে বাইরে থাকাটাও ঘটেনি কোনও দিন। আমার ভাই চিঙ্কুর কল্যাণে—ও আবার কেবল ইংরিজি গানই শুনত, এবং এক বাড়িতে বড় হওয়ার সুবাদে নানা গানের টুকরো কথা, সুর, তথ্য ভেসেই আসত আমার কাছে, প্রায় যেন অবচেতনেই। মাইকেল জ্যাকসন মাঝে মাঝে আমাকে মুগ্ধ করেছেন তাঁর স্টেজ পারফরমেন্স দিয়ে। জানি, এটা নতুন কথা কিছু বললাম না—পৃথিবীর কত কোটি মানুষই তো তাঁর মঞ্চম্যাজিকের ভক্ত! তবু, কথাটা নতুন লাগতে পারে এই ভেবে যে মাইকেল জ্যাকসন তাঁর নৃত্যপ্রদর্শনে যেভাবে ধীরে ধীরে স্বেচ্ছায় মিশিয়ে দিচ্ছিলেন নারী এবং পুরুষের এক রহস্যময় সম্মিলন—'পুরুষ' এবং 'নারী' নির্বিশেষে সেটা সমান আদরে গ্রহণ করেছিলেন বিশ্ব জুড়ে। টিভিতে দেখলাম জ্যাকসনের বিয়োগবক্তব্যে সত্যিই ব্যাকুল—হৃতিক রোশন, প্রভু দেবা, মিঠুন চক্রবর্তী, গোবিন্দা। যাঁরা সকলেই কোনও না কোনও সময় আমাদের কাছে পর্দাপৌরুষের চূড়ান্ত নিদর্শন।

মাইকেল জ্যাকসন ধীরে ধীরে গায়ের রং, মাথার চুল, মুখের গড়ন, শরীরের ভঙ্গিমা সব বদলেছেন—ভাল করে খেয়াল করলে দেখা যায় যে এই পরিবর্তন এক কৃষ্ণবর্ণ সাধারণ কিশোরের গণ্ডি ছাড়িয়ে চোখ ঝলসানো এক সুন্দরী হওয়ার যাত্রাপথে। তার ফলে মাইকেল জ্যাকসনকে নিয়ে দর্শক বা মিডিয়ার প্রবল কৌতূহল ছিল, কিন্তু কোথাও কোনও বীতরাগ বা প্রত্যাখ্যান ছিল না।

মাইকেল জ্যাকসন-এর বিরুদ্ধে কিশোর নিগ্রহের অভিযোগ ছিল—তারা সকলেই বালক, অর্থাৎ পুরুষ।

অথচ মাইকেল জ্যাকসন প্রথাগত ভাবে বিবাহিত এবং সন্তানের জনক। তাঁর জীবন সাত্ত্বিক ভাবে বা 'নৈতিক' ভাবে অনাবিল ছিল কি না, সেই বিচারে না গিয়ে আমরা অন্তত এইটুকু নিয়ে হয়তো বা সকৌতূহলে ভাবতে পারি যে যৌনভঙ্গির সত্যিই কোনও সমাজনির্দিষ্ট রূপরেখা হয় না। 'পুরুষ' এবং 'নারী' এই দু'টি বিপরীত শব্দের মাঝখানে এক অসীম প্রান্তর, যেখানে বসবাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেন অর্ধনারীশ্বরতার নানা প্রতিভূ।

মাইকেল জ্যাকসন হয়তো বা একজন রূপান্তরকামী মানুষ যিনি কেবল কৃষ্ণ থেকে গৌর নন, পুরুষ থেকে নারীর দিকে চলবার পথের কোনও একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে এসে থমকে দাঁড়িয়ে যৌনসঙ্গী হিসেবে একই সঙ্গে বেছে নিয়েছেন অল্পবয়সী কিশোর এবং পূর্ণযুবতী রমণী—নিজের অজান্তেই হয়তো বুঝিয়ে দিয়েছেন যে বর্ণ বা লিঙ্গ, যা আমরা আজন্ম ঈশ্বরপ্রদত্ত বলেই জানি, তা-ও কেবল নিজের ইচ্ছায় অনেকটাই পরিবর্তনযোগ্য।

আমরা পরিবর্তনপন্থী, নইলে অপ্রগতিশীল। তা হলে নিজের জীবনটাকে নিজের ইচ্ছা এবং আনন্দ অনুসারে পরিবর্তন করার অধিকার কি আমাদের মৌলিক অধিকার নয়?

সেখান থেকে এসে পৌঁছব অন্য ঘটনাটিতে। ভারতীয় সংবিধানের ৩৭৭ ধারার পরিমার্জনায় বিভিন্ন শহরে সমকামীদের যে গৌরব-মিছিল বেরোল, টিভিতে দেখলাম ক্যামেরাদের স্বাভাবিক ঝোঁক কেবল রমণীসুলভ পোশাক পরা পুরুষদের ওপর। তাদের পাশে পাশে কিন্তু নীরবে হেঁটে চলেছেন অনেক সাধারণবেশী মানুষ, মিডিয়ার তাদের দিকে কোনও লক্ষ্য নেই। যেন সমকামিতা মানেই 'অসামাজিক' সাজগোজ।—এবং ফলত 'অস্বাভাবিক'।

সেই মিছিলেই হাঁটছিলেন একজন সাধারণ-বেশিনী শান্তস্বভাবা প্রৌঢ়া; তাঁর হাতে একটা প্ল্যাকার্ড—'Proud Mother'। হয়তো বা তাঁর সমাজ-ঘৃণিত সমকামী-সন্তান সেই মুহূর্তে অন্য কোথাও, অন্য কোনও শহরে বিজয়মিছিলে—বা হয়তো নিজের অন্য কাজ নিয়ে ব্যস্ত। পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম মহিলা দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা। সমকামী বলতেই যে কেবলমাত্র কতগুলো রংমাখা মুখ এটাও যেমন জ্যাকসন আমাদের শিখিয়েছেন, তেমন এই সত্যটাও বোধহয় শিখিয়েছেন যে স্বেচ্ছা জীবনযাপনের শক্তি যে কোনও কাজল, লিপস্টিকের থেকে অনেক বেশি।

মাইকেল জ্যাকসন-এর শেষকৃত্য হয়ে গেল।

৩৭৭ ধারা নিয়ে মিডিয়ার মাতামাতি অনেক স্তিমিত হয়ে এসেছে। তাঁরা এখন অন্য জিনিস নিয়ে ব্যস্ত। তাঁদের ক্যামেরায় তাই হয়তো ধরাই পড়ল না আরেকজন প্রৌঢ়ার ছবি— আমার মা।

কিন্তু, আমি মনে মনে জানি, অন্তরীক্ষ বলে যদি কোনও নিঃসীমা পথ থাকে সেখানে ক্লিষ্টপায়ে অশক্ত শরীরে দুর্বল হাতে PROUD MOTHER প্ল্যাকার্ড নিয়ে হেঁটে চলেছে আমার মা।

আমার সব নিভৃত নিঃসঙ্গ বিজয়মিছিলের সঙ্গী।

১৯ জুলাই, ২০০৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বহু বছর আগে, সেই রূপকথার যুগে, এক এলাহি গানের বাজি বসেছিল শুণ্ডীর রাজসভায়। দেশ-বিদেশ থেকে নানা গায়ক, নানা বাদ্যযন্ত্র নিয়ে, এসে পৌঁছেছিল রাজসভায়।

পথে এমনই এক গায়ককে তার লোকলস্কর, সেপাই-সান্ত্রী নিয়ে মহা আড়ম্বরে রাজসভা অভিমুখে রওনা দিতে দেখে অবাক বিস্ময়ে, কী যেন অপার কৌতূহলে বা অজানা অনুপ্রেরণার বশে দু'টি নিতান্ত মাটির মানুষ রওনা দিয়েছিল সেই রাজসভার দিকে।

সেখানে নানা ধরনের গান হয়েছিল, নানা উচ্চাঙ্গ ব্যঞ্জনা, নানা কালোয়াতি, নানা সূক্ষ্ম মূর্ছনা।

শুণ্ডীর রাজা অবশ্যই রসজ্ঞ সংগীতপটু বোদ্ধা তেমন ছিলেন না বোঝা যায়—একটা সময়ের পর যখন গানের সভার মাঝখানে প্রায় যেন তিনি ঢলে পড়েছেন তন্দ্রায়, বাঘার ঢোলের চাঁটিতে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তারপরের গল্প আমরা সবাই জানি। সুরের ভাষা, ছন্দের ভাষা, আনন্দের ভাষা, সহজ মনের ভাষা দিয়ে গানের বাজি জিতে নিয়েছিল গুপী আর বাঘা।

এ যেন প্রায় মহাকাব্য-নির্দিষ্ট নিয়তি। ঠিক যেমন পাঞ্চালসভায় সব পরাক্রান্ত রাজা মহারাজাকে হারিয়ে মৎস্যচক্ষু শরবিদ্ধ করেছিল এক অজানা ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণযুবা।

সাধারণ নিচুতলার মানুষরা, তাদের সাধারণ জীবনের অধিকার নিয়ে, বীরত্ব নিয়ে কত সময়ে উঠে এসেছে মঞ্চের পাশ দিয়ে সসংকোচে নীরবে—

তারপর প্রতিষ্ঠিতদের অহংকে ধূলিসাৎ করে প্রতিষ্ঠা করেছে নিজের মর্যাদাসন, সাধারণকে দিয়েছে নায়কের মহিমা।

ঠিক তেমনটি-ই হতে পারত এবার নোবেল সাহিত্য পুরস্কারে, সারা পৃথিবী তাকিয়ে ছিল একটি উজ্জ্বল নামের দিকে, তাদের প্রিয় গায়কের সম্মানপ্রাপ্তির আশায়—বব ডিলান।

জনপ্রিয়তা মানেই যে শিল্পোৎকর্ষের অন্তরায় নয়, বব ডিলান পুরস্কৃত হলে সেকথা আমরা নতুন করে বুঝতে পারতাম। লক্ষ লক্ষ মানুষ কেবলমাত্র ডিলানের গান দিয়ে আবার নতুন করে উপলব্ধি করতেন নোবেল পুরস্কারের মহিমা। তাঁরা হতাশ হলেন। ডিলান সপ্তমবারের মতো এবারও নোবেলজয়ী হলেন না।

অন্যদিকে জনপ্রিয়তার ইচ্ছেকে বুঝিয়ে দেওয়া হল বোধহয় অন্য এক সাম্প্রতিক তারকাকে নোবেল দিয়ে।

ওবামা এখনও নোবেল-যোগ্য কি না, এই নিয়ে বিশাল আলোচনা পর্যালোচনা চলছে।

যে-মানুষটা কেবল বিদ্বেষ অতিক্রম করে গাত্রবর্ণের জোরে এগিয়েছেন, আর কয়েকটা মাত্র ঘোষণা করেছেন ইতিমধ্যে—তিনি কি সত্যিই নোবেল বিজয়ী হওয়ার যোগ্য?

নানা ফিল্মি পুরস্কারের মতো নোবেল প্রাইজ-এও কি তা হলে 'এই বছরের সেরা মুখ' বিভাগও চালু হল?

২৫ অক্টোবর, ২০০৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবে গতকাল ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর জন্মদিন পার হয়ে গিয়েছে। আমি এই জন্মদিন উপলক্ষে একটি কাল্পনিক স্মরণসভায় গিয়েছিলাম বলা যাক।

সেখানে বক্তা নেহরু সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতা শুরুই করলেন কতগুলি চিরাচরিত স্তুতিবাক্য দিয়ে জওহরলাল নেহরু হচ্ছেন ভারতের জনগণমঙ্গলদায়ক নায়ক। একনিষ্ঠ সমাজতান্ত্রিক, আধুনিক ভারতের স্থপতি, বিদেশি শিক্ষায় শিক্ষিত একজন উজ্জ্বল বক্তা, মহাত্মা গান্ধীর একান্ত স্নেহধন্য।

তাঁর সম্পর্কে আরও অনেক সুন্দর কথা শোনা যায়। তিনি ছিলেন শিশুপ্রেমিক, যে কারণে তাঁর নাম চাচা নেহরু। অন্যদিকে তিনি অত্যন্ত স্নেহময় পিতা, জেল থেকে বসে আদরের কন্যাকে যা যা চিঠি লিখেছেন, সেগুলো ইতিহাসের এক পরম সম্পদ। নেহরুর পোশাক আশাকে এক বিশিষ্টতা ছিল—যেখান থেকে জওহর কোট নেহরুর বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর কোটের বোতামে বোতামে লাগানো লাল টুকটুকে গোলাপ। যেমনটি তাঁর কন্যার ছিল : রুদ্রাক্ষমালা—নেহরু পোশাকের ব্যাপারে অত্যন্ত খুঁতখুঁতে ছিলেন, ছেলেবেলায় তাঁর পরিচিত পোশাক কাচা হয়ে আসত ইতালি থেকে।

বক্তার বক্তৃতা শেষ হয়ে আসছিল, একজন শ্রোতা হাত তুললেন

—আর, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন।

শ্রোতা অল্প ঢোঁক গিলে শুরু করলেন আবার।

—তাঁর স্ত্রী কমলা নেহেরু রুগ্‌ণ অসুস্থ। একসময়ে তাঁকে হিমাচল প্রদেশের স্যানেটোরিয়াম-এ রেখেচিকিৎসা করানো হয়েছিল। কমলা দীর্ঘজীবী হননি। ফলে নেহরুর জীবনের অনেকটাই কেটেছে বিপত্নীক হিসেবে। আপর শ্রোতার বেয়াড়া-প্রশ্ন।

—বিপত্নীক নেহরু কি সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্যে কাটালেন বাকিটা জীবন?

বক্তা চরম অপ্রস্তুত। সভায় প্রভূত কোলাহল, কৌতূহল এবং নিষেধ মিশ্রিত সভাস্থ সকলের হই চই। অতঃপর সভাভঙ্গ। শ্রোতা আর কোনও উত্তর পেলেন না।

অনেকটা কাছাকাছি ঘটনাই ঘটেছে সাম্প্রতিক একটি প্রস্তাবিত চলচ্চিত্রকে নিয়ে। নেহরু এবং মাউন্টব্যাটেন-পত্নী এডউইনা-র সম্পর্ক নিয়ে ঐতিহাসিক অ্যালেক্স ভন টানজেল্‌মান একটি দীর্ঘ উপন্যাস লিখেছিলেন Indian Summer : The Secret History of the End of an Empire । সেই উপন্যাসকে ভিত্তি করে একজন ইংরেজ চলচ্চিত্রকার জো রাইট একটি ছবি বানাতে চেয়েছিলেন। আমাদের তথ্য সম্প্রচার দফতর অবিলম্বে সেটিকে ধামাচাপা দিয়ে দিয়েছেন। বইটি বিদেশি লেখিকার লেখা, বিদেশে মুদ্রিত—সেটির ওপর হস্তক্ষেপ করা ভারত সরকারের পক্ষে সম্মকভাবে সম্ভব ছিল না।

বইটি এখানে বিক্রিও হয়েছে ঢালাও, এই বিতর্কের পরপরই কলকাতা শহরের একটি বিখ্যাত দোকানে বইটি কিনতে গিয়ে জানলাম 'আউট অফ প্রিন্ট।' জানি না, এই শব্দগুলির অন্তরালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনও নিষেধাজ্ঞা লুকিয়ে রয়েছে কি না এর এডউইনার কন্যা পামেলা হিক্‌স মাউন্টব্যাটেন নেহরুর সঙ্গে তাঁর মাতার প্রণয় কাহিনি স্বীকার করে নিচ্ছেন।

তবে দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ঘনিষ্ঠতার প্রতিটি আখ্যান আর যে কোনও মানুষের মতো তাঁর কাছেও অজানা। কিন্তু ঘটনাটির সার সত্য কন্যা হয়েও তাঁর কাছে অনস্বীকার্য নয়।

ভারত সরকার ছবিটির অনেক রদবদলের প্রস্তাব দিয়েছেন। এবং একটি কড়া নির্দেশ। ছবির প্রথমেই লিখে দিতে হবে ঘোষণাবাক্য—যে এটি একটি কল্পকাহিনি, এর মধ্যে কোনও ঐতিহাসিক সত্য নেই।

এই 'ঐতিহাসিক সত্য' শব্দটা বড় গোলমেলে। ইতিহাস মানে যদি সময়ের অনুলিপি হয়, তবে ব্যক্তিগত, ডায়েরি জার্নালও তো ইতিহাস। ইতিহাস কোনও একজন লেখক সৃষ্টি করেন না। বা যিনি করেন তিনিও কোনও কমিটিকে দিয়ে সেটা অনুমোদন করিয়ে নেন না। এবং ভারতীয় ইতিহাসের সেই টালমাটালের সময় হয়তো বা সত্যিই কোনও ঐতিহাসিক চেয়েছিলেন এই দু'টি মানুষের কাহিনি লিপিবদ্ধ করে রাখতে—হয় তিনি পেরে ওঠেননি। এডউইনা এবং নেহরুর জীবনযাত্রার বাঁকাচোরা যে কোনও সাধারণ ঐতিহাসিকের জন্য সহজগম্য নয়, বা হয়তো বা তাঁর ওপরেও কাজ করে থাকতে পারে কোনও অদৃশ্য নিষেধাজ্ঞা। স্বাধীন ভারতবর্ষের যিনি প্রাণপুরুষ, সেই মহাত্মা গান্ধীও তাঁর আত্মজীবনি লিখেছেন-তে, যে যখন তাঁর বাবা মৃত্যুশয্যায়, তিনি পাশের ঘরে স্ত্রীসঙ্গমে রত।

গান্ধীকে নিয়ে অনেক জীবনীচিত্র হয়েছে আজ অবধি। কোনও চলচ্চিত্রকারই এই উপলব্ধির সারটুকুকে মোহনদাসের মহাত্মা হয়ে ওঠার দর্শনমার্গ হিসেবে ব্যবহার করেননি। কেন? না, তার মধ্যে যৌনতার ইঙ্গিত ছিল, সেটাই কি ভারত সরকারের ভয়? যে একজন বিপত্নীক মানুষ কেবলমাত্র জৈবিক আবর্তনে যদি এক সুন্দরীর প্রতি আকৃষ্ট হন, সেটা কি তাঁর স্খলন?

আমরা জানি না, নেহরুর কোনও জন্মদিনে এডউইনা কোনও রক্তগোলাপ দিয়েছিলেন কি না তাঁকে, কোটের বোতামে লাগানোর জন্য। ভারত সরকারের এই অদ্ভুত নিষেধাজ্ঞা সেই চিরসুবাসিত গোলাপটিকে নিমেষে বর্ণগন্ধহীন করে দিল।

গতকাল নেহরুর জন্মদিন গেছে, এর থেকে সম্মানজনক উপহার কি ভারতবর্ষ তাঁকে দিতে পারত না?

১৫ নভেম্বর, ২০০৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা'র কাছে শোনা একটা ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে। মা'র তখন ছাত্রীবয়স—মা আর্ট কলেজে ছবি আঁকা শেখে।

মা'দের ব্যাচে মেয়ে বলতে মা তখন একা। বিভিন্ন ধরনের ছবি আঁকার প্রশিক্ষণের মধ্যে একটা অবধারিত বিষয় হত 'ন্যুড স্টাডি'। নগ্ন মডেল সামনে রেখে প্রত্যক্ষভাবে মানবশরীরের গঠন, প্রকৃতি, নানা বিভঙ্গ ইত্যাদি-র অনুরূপ রপ্ত করা। ঘটনাটা একটা দুপুরের। মা'দের সেদিন ন্যুড স্টাডির ক্লাস—যথারীতি একজন মহিলাকে সামনে রেখে ছবি আঁকবার অনুশীলনে মগ্ন ক্লাসের ছেলেমেয়েরা। মেয়ে বলতে এক্ষেত্রে মা একা।

ক্লাস চলছে। ছবি আঁকা এগোচ্ছে। কিছুক্ষণ পর মা'র খেয়াল হল যে সামনে বসা মডেল মেয়েটি আর স্থাণু প্রস্তরবৎ বসে নেই। অল্প উসখুস করছে। সাধারণত মডেলদের স্থির বসে থাকাটাই নিয়ম বলে ক্লাসের দু'একজন ছাত্র একটু বিরক্তও হচ্ছিল। কিন্তু মেয়েটির উসখুসানি কমে না। হঠাৎ কী একটা মনে হয়েছিল মা'র। স্কেচবুক ফেলে উঠে গিয়ে মেয়েটির সঙ্গে কথা বলল মা চুপিচুপি। তার পরে ক্লাসের সহপাঠী বন্ধুদের এসে বলল—

তোরা একটু ক্লাসের বাইরে যা তো।

অন্য ছাত্ররা তো অবাক!

—কী হল?

মা'র গলায় এবার অধৈর্য এবং বিরক্তি

—তোরা যাবি?

বিরসবদন ছাত্ররা ধীরে ধীরে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেল।

মা ক্লাসের দরজা বন্ধ করল। এগিয়ে গেল মেয়েটির কাছে। কাঁচুমাচু অপ্রস্তুত মডেল মেয়েটি এবার প্রথম মেলে ধরল মা'র কাছে। মেয়েটি হঠাৎ রজস্বলা হয়েছে। এবং অনাবৃত শরীর আর তার ঋতুস্রাবের লজ্জা লুকোতে পারছে না।

বিশেষ করে তার শরীরের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী অনেকগুলো অঙ্কনরত পুরুষের চোখের সামনে, আরও অনেক বেশি কুঁকড়ে গিয়েছে।

এরপরের ঘটনাটা মা আমাদের বিশদে বলেনি কোনওদিন।

তবে সেদিনের ক্লাসটা আর হয়নি, মেয়েটিকে যথাসম্ভব স্বাভাবিকতায় ফিরিয়ে এনে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

দুই

এবার আমার গল্পটা বলি।

চোখের বালির শুটিং চলছে। একটা দৃশ্য ছিল ছবিতে—গ্লোবে ডিরেকটর'স কাট বলে যেটা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখানো হত, সেই প্রিন্টে ছিলও দৃশ্যটা।

মেডিক্যাল কলেজে সাহেব শিক্ষক অ্যানাটমি ক্লাস নিচ্ছেন—অনেক ছাত্রদের মধ্যে মহেন্দ্র, বিহারীও রয়েছে, এবং তাদের সামনে টেবিলের ওপর শায়িত এক মৃতা নগ্নিকা।

অতএব খোঁজ পড়ল ন্যুড মডেল-এর। আমার ছবির শিল্প-সহযোগী সুশান্ত (পাল) সরকারি আর্ট কলেজের ছাত্র। তার কাঁধে দায়িত্ব পড়ল নগ্নিকা খুঁজে আনার। অনেক কষ্টে পাওয়াও গেল একজন মহিলাকে, ছবিতে মুখ দেখানো চলবে না এই শর্তে। সত্যিই ঝামেলার দৃশ্য। বিদেশি শিক্ষক, অতগুলো ছাত্র, (প্রত্যেকে কোটপ্যান্ট পরা) তার ওপর কেবলমাত্র নগ্নিকা মডেল নন, তাকে মৃতা দেখানোর জন্য আলাদা ফ্যাকাশে মেকআপ—সব মিলিয়ে বেশ খানিকটা ঝকমারি। ইউনিট-এর কারুরই মাথায় আসেনি যে ন্যুড মডেলিং যাঁরা করেন, তাঁরা অভিনেত্রী নন, তাঁদের মেক-আপ করতে হয় না। ফলে, যখন একজন পুরুষ মেক-আপ শিল্পী তাঁর সারা গায়ে সাদাটে রং মাখাচ্ছেন, তাঁকে ফ্যাকাশে মৃতদেহ বানাতে হবে বলে—তাঁর স্বাভাবিকভাবেই একটা অস্বস্তি শুরু হল।

আর কেবলমাত্র মেক-আপ-ই তো নয়। আলোয় মেক-আপ ঠিক আছে কি না, কোনওভাবে কৃত্রিম যাতে না দেখায় বারবার করে এনে টেবিলে শুইয়ে আলো ফেলে খালি শরীরটাকে পরীক্ষা করা। যে, সিনেমার আলোয় এই শরীর মৃতদেহের যাথার্থ্য পেল কি না। ফলত, মহিলাকে বারবার একটা আলগা চাদর জড়িয়ে (যাতে মেক আপ না উঠে যায়) ফ্লোরে আসতে হচ্ছে মেক-আপ রুম থেকে, শুতে হচ্ছে নির্ধারিত টেবিলে, আলোর নীচে। কোনওরকমে গায়ের চাদর সরিয়ে, আলো ফেলে পরীক্ষা করা হচ্ছে গাত্রবর্ণের পাণ্ডুরতা, তারপর আবার মহিলা চাদর জড়িয়ে ফিরে যাচ্ছেন মেক-আপ রুমে। ফেরার পথে যত আষ্টেপৃষ্ঠে চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নেন নিজের গায়ে, ইউনিটসুদ্ধ সবাই হাঁ হাঁ করে ওঠে—

মেক আপ, মেক আপ!!

তৈরি হতে সময় লাগছিল বেশ কিছুক্ষণ। তারই মধ্যে একজন সহকারী কাঁচুমাচু মুখ করে এসে বলল

—ঋতুদা, ওঁকে কিন্তু ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের কি দেরি আছে অনেক।

আমি তো অবাক। সবে বেলা তিনটে বাজে।

—ছেড়ে দিতে হবে মানে?

—ওঁকে চারটেয় ছাড়তে হবে।

আমি তো হতবাক। কেউ তো আমায় বলেনি যে উনি চারটের পর কাজ করতে পারবেন না। সুশান্তই যেহেতু যোগাযোগটা করেছিল, মহা খাপ্পা হয়ে ওকে চেপে ধরলাম।

তুই তো বলিসনি যে চারটেয় ছাড়তে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখলাম, সুশান্তও আমারই মতো অবাক। অর্থাৎ ও-ও কিছু জানে না।

এবার একটু বিরক্ত হয়েই গেলাম মেক-আপ রুমে।

—কই, আপনি তো আমাদের আগে বলেননি যে আপনাকে চারটের মধ্যে ছাড়তে হবে।

মহিলা অধোবদন। ধীরে ধীরে বললেন,

—ভেবেছিলাম তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। বলেছিল খালি শুয়ে থাকবার শট।

আমি রাগতভাবেই বললাম

—এভাবে ধরে নিলে তো মুশকিল। আপনি জিগ্যেস করতে পারতেন কাউকে।

মহিলা আরও সংকুচিতা

—ছাড়তে না পারলে ছাড়বেন না। আসলে আমার ছেলের স্কুল ছুটি হয় চারটেয়। না পারলে আমার বোনকে ফোন করে বলে দেব, ও গিয়ে নিয়ে আসবে।

বলা বাহুল্য, চারটের মধ্যে ওঁকে ছাড়তে পারিনি।

শুটিং নির্বিঘ্নেই হয়েছিল।

মহিলা বাড়ি ফিরে ছেলেকে কী বুঝিয়ে ছিলেন জানি না।

যদি সত্যি কথাটাই বলে থাকেন,

জানতে ইচ্ছে করে ছেলের কোনটা শুনে বেশি কষ্ট হয়েছিল।

যে, কিছুক্ষণের জন্য মা আজ মৃতা ছিল। নিস্পন্দ, অসাড়। না, কয়েকটা লোক আজ তার মায়ের নগ্ন ছবি তুলেছে।

AMARBOI.COM

২২ নভেম্বর, ২০০৯

ভাষা নাকি অনন্ত বেগবতী, আবহমানা।

তার চলার পথে কুড়িয়ে নেয়, নানা সদ্যসিক্ত ভাসমান কুসুমহার, আবার সহজেই বর্জন করে বহুদিনের বর্জ্য অর্ঘ্য।

নদীর নীচে যেমন পলিমাটি জমে, বহতা ভাষাও খুঁজে পায় সিক্ত পোক্ত ভূমি, তার পথভিত্তি।

স্কুলে যখন প্রথম আবিষ্কার করেছি যে কত তৎসম শব্দ দিয়ে সৃজিত হয়েছে বাংলা ভাষাভাণ্ডার, তখন আশ্চর্যও লাগত যেমন, হয়তো বা গোপন কোনও এক জাত্যভিমানের চাপা অহঙ্কারও থাকত, সিধে সংস্কৃত ঘেঁষা ভাষার উত্তরাধিকারী আমরা।

আজও যেমন নবজাতকের নাম রাখলে আমরা তার উৎস খুঁজতে অধিকাংশ সময়ে অভিধানে তার তৎসম রূপ এবং অর্থ খুঁজি—যেন আমাদের মেনে নিতে কষ্ট হয় বাংলাভাষার কোনও নাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবভাষা উদ্ভূত আর্যনাম নয়।

বাংলাভাষার সর্বনামের বা ক্রিয়ার কোনও লিঙ্গ নেই। হিন্দিতে আছে। তাই আমাদের জ্ঞানে এবং চেতনায় হিন্দিভাষা বাংলাভাষার থেকে কম সার্বভৌম।

সেখানে পুলিশ বা রেলগাড়ি নাকি স্ত্রীলিঙ্গ, অতএব সে ভাষা বিচক্ষণের ভাষা হতেই পারে না।

তাছাড়া, আমরা শিক্ষিত বাঙালি। জানি যে বাংলায় শুধু একজন বিদ্যাসাগরই নেই, বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ আছেন। বিভূতি-মানিক-তারাশঙ্কর আছেন। অন্য দিকে জীবনানন্দের অনন্যতার পাশাপাশি বুদ্ধদেব-সুধীন-বিষ্ণু আছেন। শক্তি-সুনীল-শীর্ষেন্দু আছেন।

হিন্দিতে কেবল আছেন এক প্রেম চন্দ আর কিষেণ চন্দ। কবিতায় কইফি আজমি আর হরবন্স রায় বচ্চন। শেষ দুজনের পরিচয় প্রধানত শাবানা আজমি এবং অমিতাভ বচ্চনের পিতৃপরিচয়ের অধিকারে।

ফলে একটা সময় অবধি, বাংলার শিক্ষিতমণ্ডলীর কাছে হিন্দিভাষাটা ব্রাত্য হয়ে রইল—এ যেন সুন্দরী, আলোকপ্রাপ্তা, সালঙ্কারা মায়ের পাশে কোনও এক অল্পশিক্ষিতা, ম্লানমুখী অপরের মাকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখা।

তার পাশে কলকাতা শহরের অহংকার যে, সেই যে পলাশীর যুদ্ধের পর ব্রিটিশরা এসে বাংলায় ধাঁটি গাড়ল আর ইংরিজি ভাষা এসে গঙ্গার জোয়ারের মত রোজ ছুঁয়ে যেতে লাগল কলকাতা শহর, তার পরে বাংলা ভাষাও তার সংগ্রহের অন্যান্য অনেক ভাষা থেকে কুড়িয়ে আনা ভালবাসার শব্দগুলোকে ছুড়ে ফেলে দিতে লাগল জানলা দিয়ে। পেয়ালা, পিরিচ, দেরাজ, কুর্সি ধীরে ধীরে কাপ-প্লেট, ড্রয়ার-চেয়ারের কাছে বিনম্র কুর্নিশ করে বিদায় নিল। হয় ঠাঁই নিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হলদেটে হয়ে যাওয়া বইগুলোর পাতায় পাতায়, কিংবা হারিয়ে গেল গভীর রাতের নির্জন পথের মতো সমবেত 'বল হরি-হরি বোলের' আড়ালে।

বাংলা ভাষা, আমাদের মাতৃভাষা, চলন্তিকা ও হরিচরণের কৃপায় অবিকৃত অবিচল রইল, কিন্তু সংস্কৃতের উৎসমুখ থেকে বাংলা ভাষার ভগীরথ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে যে বাংলা ভাষার সুরধুনী স্রোত ক্রমশ এক বেগবতী নদীর আকার ধারণ করেছিল, তাতে এখন আর কোনও ছই নৌকো, পানসি, ডিঙ্গি নেই, কেবল বিদেশি পালতোলা নৌকো।

একদিন যেমন হিন্দি ভাষাকে ব্রাত্য করে দিয়ে বাংলা ভাষার গৌরব হয়েছিল প্রতিষ্ঠিত। তেমনই আজ বাংলাভাষার অর্ধেকটাই জুড়ে আছে ইংরিজি শব্দ। আমরা বাড়ির কাজের লোকেদের সামনে নিজস্ব কথা বলতে হলে ইংরিজিতে বলি, অস্বস্তিকর শব্দ জনসমক্ষে ব্যবহার করতে হলেই ইংরিজি প্রতিশব্দ তাকে শোভন করে দেয়, নিত্য ব্যবহারিক ইংরিজি নামধারী যে দ্রব্যগুলি আমাদের কাছে রোজ এসে পৌঁছায় তারা তেমনই অটুট থেকে যায় সাগরপারের বৈভবে।

বাংলাদেশে অন্তত এই চেষ্টাটা চলে নিরন্তর। ওখানে মোবাইল ফোনের নাম 'মুঠোফোন'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওখানে দোকানের দরজায় Push বা Pull-এর বদলে থাকে 'টানুন-ঠেলুন'।

আমরা সেগুলো দেখে এসে মজা পাই। অনেকে ন্যাকামিও মনে করেন। কিন্তু বোধহয় ভাবেন না যে বিদেশি দ্রব্যসমৃদ্ধ এই দেশটা যদি বাংলাভাষাকে তার মূল বাকস্রোত হিসেবে নিষ্কলুষ ভাবে ধরে রাখতে পারে—সেটা নিঃসন্দেহে মাতৃভাষার প্রতি এক নিয়ত নম্রতার নিদর্শন।

তর্কটা হল, বাংলাদেশ একভাষী দেশ। ভারতের মতো সেখানে নানা ভাষা, নানা মত নয়। ফলে বহুভাষী দেশের বহু মাতৃভাষার যে আদান প্রদান, সেটার মধ্যে দিয়ে সত্যি যদি ভারতবর্ষের জন্য এক নতুন মাতৃভাষা সৃষ্টি হত সেটাই বোধহয় হত শ্রেয়, অভিপ্রেত।

সত্যি যখন বহুভাষাভাষী মানুষ একসঙ্গে দাঁড়িয়ে 'জনগণমন' গান, তারা বা বাংলাভাষী আমরাও কি সচেতন ভাবে স্মরণ রাখি যে এটা আদতে একটি মৌলিক বাংলা রচনা।

কিন্তু আমাদের মাতৃভাষা—সে যে প্রদেশেরই হোক না কেন নাবকলেবর পাচ্ছে একটাই ভাষা থেকে যার নাম—ইংরিজি। আর তার ফলে সনাতন আর আধুনিকের এক নিয়মিত গুরুচণ্ডালিতে বাংলা ছবির বিজ্ঞাপনে দেখছি

—চ্যালেঞ্জ, নিবি না শালা

এবং তার তলায়

'সগৌরবে চলিতেছে'।

'মা যা ছিলেন' তা নিয়ে সকলেরই স্মৃতিমেদুরতা থাকে। কিন্তু 'মা যা হইয়াছেন'-এর নমুনা যদি এগুলোই হয়, তা হলে আর দশ বছর পর একুশে ফেব্রুয়ারি 'মা যা হইবেন' সেটা আমাদের সহ্য হবে তো?

না কি অভ্যেসও শরীরের মত মহাশয়? যা সওয়াবে তাই সয়?

২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১০

জানলার ধারের সিটের বোধকরি একটা চিরন্তন অন্তর্লীন মায়া আছে।

আমার এক দিদির কথা জানি, যার ছোটবেলায় বিয়ে করার একমাত্র লোভ ছিল তার যে বর হবে সে চিরকালের মতো নির্বিবাদে তাকে জানলার ধারের সিটটা ছেড়ে দেবে। ভাইবোনদের মতো ঝগড়া করবে না।

আমার ছেলেবেলার বন্ধুদের মধ্যে আরেকজনের কথা আমি জানি যে বড় হয়ে ড্রাইভার হবে ভেবেছিল, কেবল জানলার ধারের সিটের লোভে।

আরও অনেকের মতোই জানলার ধারের সিটটা আমারও খুব প্রিয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাড়িতে যাতায়াত শুরু করার পর থেকে সেটার অধিকার নিয়ে দুশ্চিন্তাটা আর নেই, তা সত্ত্বেও একথা বলতে পারব না যে জানলার ধারের সিটের মায়া আমার কাছে কিছুমাত্র লঘু হয়েছে নিত্যাভ্যাসের জীর্ণতায়।

একটা মজার গল্প বলি। আমার ছোটবেলার গল্প। ছোটবেলা বলতে বছর বাইশ আগের। আমার চাকুরিজীবন শুরু হয়েছে সবে। টিভোলি কোর্টে অফিস।

তখন রেসপন্স বিজ্ঞাপন সংস্থায় সবে ঢুকেছি শিক্ষানবীশ হিসেবে। বাড়ির কাছ থেকে বৈষ্ণবঘাটা-নিমতলা রুটের মিনিবাস ছাড়ে। ল্যান্সডাউন রোডে ডায়শেসন স্কুলের কাছে নেমে গলির ভিতর দিয়ে মিনিট পাঁচেকের হাঁটা-পথ।

আর বাড়ির কাছ থেকেই যেহেতু মিনিবাসটা ছাড়ে, একটু সময় থাকতে পৌঁছে গেলে জানলার ধারের সিটটা খালি পাওয়া যায়। অতএব সেটুকু কষ্ট আর কষ্ট নয়, বেশ উপভোগ্যই।

এই করতে করতে জানলার ধারের সিটটা আমার বাঁধা হয়ে গেল।

একদিন উঠল এক স্কুলের বাচ্চা। হ্যাঁ আমি যদি 'ছোট' হই, তা হলে সে 'বাচ্চা' তো বটেই। বড়জোর হলে সাত আট হবে। কাঁধে ব্যাগ, ওয়াটার বটল। সঙ্গে মা।

দেশপ্রিয় পার্ক পার হলেই একঝাঁক স্কুল। সেখানেই কোথাও একটা নেমে যাবে।

বাসে উঠেই দেখল জানলার ধারের সিটে আমি বসে। পাশের সিটটা খালি। অমনি বায়না ধরল

—আমি জানলার ধারের সিটে বসব। বায়নাটা প্রধানতই মার কাছে। আর মা, সেটাকে আমার দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য প্রথমে নিরুত্তর রইলেন অনেকক্ষণ, তারপর দু-একবার মৃদুস্বরে বললেন

—না বাবু, ওরম করে না, দেখছ না কাকু বসে আছেন।

পরোক্ষ চাপটা হল—কাকু যখন এতক্ষণেও তোমার বিগলিত কাকুতি শুনে সিটটা ছাড়েনি, তা হলে তোমার আশা কম।

ক্রমশ বায়নাটা প্রায় কান্নাকাটির পর্যায়ে পৌঁছলো।

সারা মিনিবাসের যাত্রীরা ফিরে ফিরে আমায় দেখছেন।

অগত্যা, চক্ষুলজ্জার খাতিরে আমার জানলার ধারটা ছেড়ে দিতে হল।

বাচ্চাটা দুদ্দাড়িয়ে এসে বসে পড়ল এমনভাব করে যে জায়গাটা যেন আসলে ওরই।

আমি দখল করে রেখেছিলাম। আমাকে একটা 'থ্যাঙ্ক ইউ' অবধি বলল না।

ঠিক দু'দিন পরের ঘটনা। আমি যথারীতি আগে বেরিয়ে, হেঁটে, মিনিবাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে, আমার জানলার ধারের সিটে এবং বাস ছাড়ার মুখে মুখে কাঁধে ব্যাগ, হাতে ওয়াটার বটল, সঙ্গে মা সেই অকৃতজ্ঞ বাচ্চা এসে উপস্থিত। তার স্বভাবসিদ্ধ অনুযোগ নিয়ে। জানলার ধারের সিটটা তার দরকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেদিন দেখলাম তার মা কিঞ্চিৎ সাহসিনী। বললেন

—কাকুকে বল। ছেড়ে দেবেন।

আমি বাচ্চাটার দিকে ফিরে তাকালাম। বললাম

—না। আমি এই সিটটাতেই বসব। তুমি অন্য সিটে বোসো।

বাচ্চাটা অনুযোগ তখন হতবাক বিস্ময়ে পরিণত। সাধারণত এরকম ব্যবহার বড়দের কাছে বোধহয় ও আশা করে না। আমার যুক্তি অকাট্য—আগের দিন তুমি জানলার ধারে বসেছ।

আজ আমি বসব।

এবার বাসের লোকেদের মধ্যে আমার প্রতি বিরক্তি এবং বাচ্চার প্রতি অনুকম্পা মিশ্রিত গুঞ্জন শুরু হল।

—কি দাদা! একটা বাচ্চা...জানলার ধারে বসতে চাইছে

আমি সিটে এবং তর্কে অটল

—আমিও চাইছি। জানলার ধারে বসতে সবারই ভাল লাগে।

এরম কঠোর মানুষের সঙ্গে সত্যিই আর কোনও বাদানুবাদ হয় না। ফলে বাচ্চাটির গতি হল অন্য কোনও সমব্যথী সহৃদয় মানুষের ছেড়ে দেওয়া সিটে। আর আমি জানলার বাইরে তাকিয়ে যথারীতি অফিসে পৌঁছলাম।

AMARBOI.COM

আমার সেদিনের বাদানুবাদে ফল কি হল জানি না। কেবল বাচ্চাটা তারপর দিন থেকে আর কোনওদিন, শেষ মুহূর্তে বাসে উঠে, কেবল বয়সের অধিকারে জানলার ধারের সিট দাবি করেনি। যে সিট খালি পেত, সেখানে বসত।

১৪ মার্চ, ২০১০

মন্দির মসজিদ রায় বেরলো আঠেরো বছর পর।

রায় ঘোষণার প্রাক্কালে দেশের সমগ্র নাগরিকের বারম্বার শান্তির জন্য, নম্রতার জন্য আবেদন জানিয়েছেন দেশনেতারা, বিশিষ্ট মানুষেরা।

বারবার করে বলা হয়েছে—এ রায় কোনও পক্ষের জয়ও নয়, পরাজয়ও নয়।

আপাতত তিন মাসের স্থিতাবস্থা। দেশের সাধারণ মানুষ সসম্মানে মেনে নিয়েছেন আদালতের বিচার। কোথাও কোনও অসন্তোষ জমা হয়ে থাকলেও তা প্রকাশ পায়নি কোনওরকম হিংসাত্মকতায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার দেশের মানুষকে অভিনন্দন। আমরা আবার দেখিয়ে দিতে পারলাম যে আমরাও চাইলে বিনম্র, সহনশীল হতে পারি।

তবে মহামান্য আদালতের একটি রায় সম্পর্কে আমর মনে বিবিধ প্রশ্ন জমা হতে শুরু করেছে। আদালত স্বীকার করে নিয়েছেন যে রাম বলে একজন ব্যক্তি ছিলেন, এবং তিনি এই বিতর্কিত ভূমিস্থলে বা তার আশেপাশে কোথাও ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন।

আমি যতদূর জানি রামচন্দ্র একটি মহাকাব্যের নায়ক। যার রচয়িতা বাল্মীকি। অতএব সেই অনুসারে রামের জন্ম যদি আদৌ কোথাও হয়ে থাকে, তা কেবল বাল্মীকির মানসভূমিতে—যার সঙ্গে এই বিতর্কিত মন্দির মসজিদ প্রাঙ্গণের কোনও সম্পর্ক নেই।

তা হলে বাকি থাকে লৌকিক বিশ্বাস। বিশ্বাস বস্তুটিই একটি ব্যক্তিগত সত্য, সেটি বৃহত্তর মানুষের মধ্যে বিস্তৃত হলেও তা ব্যক্তিগতই রয়ে যায়। হৃদয়ের আকুতির দ্বারা নির্মিত এই বিশ্বাস প্রমাণসাপেক্ষ হওয়ার দাবি রাখে না। আদালত কি তা হলে মহাকাব্যকে পুরাণে এবং পুরাণকে লৌকিক বিশ্বাসে লেপ্টে দিলেন? সব থেকে আশ্চর্যজনক হল এই পারস্পরিক বিশ্বাসকে ইতিহাসের পাঠের সঙ্গে যুক্ত করা। রাম বলে একজন বিশেষ মানুষের মানবজীবনের অবস্থানকে ঐতিহাসিক সত্য বলে মেনে নেওয়া এবং সেই হেতু তাঁর জন্মস্থান নির্ণয়া করা-আমার তো ভারি আশ্চর্য ঠেকল! মহাকাব্যবিশারদরা বা পৌরাণিকরা এমনকী ঐতিহাসিকরা নিশ্চয়ই অনেক কথাই বলবেন, বা বলছেন। ভাবছেন তো নিশ্চয়ই।

আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন।

যে-মহাকাব্য তার প্রধান নায়িকার জন্মবৃত্তান্তকে এক অকস্মাৎ হলকর্ষণের মাধ্যমে উদঘাটিত করে, এবং অন্য মহাকাব্যটি তার প্রধানা নায়িকার জন্মকে বর্ণনা করে যজ্ঞাগ্নি সম্ভূতা এক পূর্ণ যুবতীর আবির্ভাবে (আমি দ্রৌপদীর কথা বলছি), সেখানে আমরা কি এটাও বুঝতে চাইব না যে তদ্দ্বারা মহাকবিরা নিজেরাই বুঝিয়ে দিচ্ছেন তাঁদের নায়ক-নায়িকার জন্ম আদতে এক কাহিনি-বর্ণনার উপলক্ষ।

তাকে ভৌগোলিক ভাবে কয়েক একর জমির মধ্যে সীমাবদ্ধ করলে মহাকাব্যের বিশালকায় নায়করা বড় ছোট হয়ে যান।

আজকের পৃথিবীতে আর নতুন করে কোনও মহাকাব্য লেখা সম্ভব কিনা বা আদৌ লেখা হবে কিনা জানি না।

কিন্তু যে দু'টি মূল্যবান মহাকাব্য আমাদের এতকালের দীর্ঘ সভ্যতাকে আলো দেখিয়েছে তার ধার্মিক বাস্তবীকরণ আমাদের অনেকের বিশ্বাসেই আঘাত করে। কারণ কল্পনার বিশ্বাসকে কোর্ট কাছারি দিয়ে ভুল বা ঠিক প্রমাণ করা যায় কি?

ধর্মপ্রাণ আস্তিকের বিশ্বাস যেমন মানবের ঈশ্বরায়ণে, তেমনই অনেক নাস্তিক কাব্যরসিকের বিশ্বাস কল্পনা ও রসনির্ভর। ভারতের এই চিরন্তন কল্পনাপ্রবণতা ও রসগ্রাহীতার বিশ্বাসকে যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রামচন্দ্রের জন্মস্থানের চৌহদ্দি এঁকে দিয়ে আহত করা হয়, তার দায়িত্ব কেউ নেবেন কি?

স্বাভাবিকভাবেই একদিস্তে পাতার রায় আমরা অনেকেই পড়িনি। কিন্তু কোনও প্রমাণিত সূত্র ধরে কল্পনার নায়ককে মানবজীবন দিলেন বিচারপতিরা, জানতে বড় ইচ্ছে করে। তা হলে শ্রীরামচন্দ্রেরও বার্থ সার্টিফিকেট দেওয়া যায়? আবার ভয়ও হয়, তাতে আমাদের কল্পনার মতো কোনও মহার্ঘ্য সম্পদকে নতুন করে ক্ষুণ্ণ হতে হবে কি না। তৈরি হবে কি না এক নতুন অভিযোগ? সারা দেশবাসী বিনা অভিযোগে এই রায় মেনে নিয়েছেন, সেখানে আমার কোনও অভিযোগ থাকার কথা নয়।

কিন্তু প্রশ্ন তো থাকতেই পারে।

১০ অক্টবর, ২০১০

রাজশেখর বসুর 'মহাভারত' বলছে 'অর্জুন নানা তীর্থ পর্যটন করলেন, তারপর মহেন্দ্র পর্বত দেখে সমুদ্রতীর দিয়ে মণিপুরে এলেন। সেখানকার রাজা চিত্রবাহনের সুন্দরী কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে দেখে অর্জুন তার পাণিপ্রার্থী হলেন। রাজা অর্জুনের পরিচয় নিয়ে বললেন, আমার বংশে প্রভঞ্জন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি পুত্রের জন্য তপস্যা করলে মহাদেব তাঁকে বর দিলেন, তোমার বংশে প্রতি পুরুষের একটিমাত্র পুরুষসন্তান হবে। আমার পূর্বপুরুষদের পুত্রই হয়েছিল কিন্তু আমার কন্যা হয়েছে, তাকেই আমি পুত্র গণ্য করি। তার গর্ভজাত পুত্র আমার বংশধর হবে—এই প্রতিজ্ঞা যদি কর তবে আমার কন্যাকে বিবাহ করতে পার।'

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ঘেঁটে দেখলাম যে, চিত্রবাহন একটি যজ্ঞ করেছিলেন। সেই যজ্ঞে তাঁর সদ্যোজাত কন্যাসন্তান পুত্রিকা পুত্র বলে রাজসিংহাসনের বৈধতাপ্রাপ্ত হলেন।

কিন্তু দু'টি মহাভারত-এই চিত্রাঙ্গদার ভূমিকা কেবলমাত্র নানা পুরুষ প্রজন্মের অন্তর্বর্তী এক অকস্মাৎ ব্যতিক্রম। তাঁর গর্ভে পুত্রসন্তান না-জন্মানো অবধি, আদিপুরুষ প্রভঞ্জনের মহেশ্বর প্রাপ্ত বরকে সফল করার জন্য তাঁকে লালন করা হচ্ছে।

চিত্রবাহন বলছেন—আমি আমার কন্যাকে পুত্ররূপে গণ্য করি। যজ্ঞানুষ্ঠান করে কন্যাকে পুত্রের বৈধতা দিয়েছেন।

মনে হয় না, চিত্রবাহনের হঠাৎ এত উৎকণ্ঠা কেন? কেবল সিংহাসনের পুরুষ উত্তরাধিকারীর জন্য?

কেন মহাদেবের দেওয়া বর, তাঁর ক্ষেত্রে মিথ্যে হল? তবে কি রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদা তাঁর ঔরসজাতা নন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মণিপুর মহিষীর অন্য কোনও সম্পর্কের অভিশাপ?

নইলে থাকত চিত্রাঙ্গদা অন্তঃপুরে—চিত্রবাহন তো অথর্ব হয়ে যাননি যে রাজ্যশাসনের জন্য তৎক্ষণাৎ কোনও যুবরাজকে অভিষেক না করালে চলছে না! কোনও সুপাত্র দেখে চিত্রাঙ্গদার বিবাহ দিয়ে নাতির জন্য অপেক্ষা করতে পারতেন।

অত ঘটা করে যজ্ঞ করে তাকে পুত্রিকা পুত্র করতে হল কেন? কেন বলতে হল—আমি তাকে পুত্র বলে গণ্য করি। তা কি কেবল রাজ-অন্তঃপুরের এক গোপন কলঙ্কের বিশুদ্ধিকরণ?

২

রবীন্দ্রনাথ গল্পটা অন্যভাবে বললেন, 'মণিপুর রাজার সেবায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব বর দিয়েছিলেন তাঁর বংশে কেবল পুত্রই জন্মাবে। তৎসত্ত্বেও যখন রাজকুলে চিত্রাঙ্গদার জন্ম হল রাজা তাকে পুত্ররূপেই পালন করলেন।

রাজকন্যা অভ্যাস করলেন ধনুর্বিদ্যা, শিক্ষা করলেন যুদ্ধবিদ্যা, রাজদণ্ডনীতি।

অর্জুন দ্বাদশবর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করতে করতে এসেছেন মণিপুরে। এখানে এই নাটকের আরম্ভ।'

মহাভারত-এর আদিপর্বে বনবাস পর্বাধ্যায়ের কাহিনিটিকে আমরা দেখি অর্জুনের দিক থেকে।

রবীন্দ্রনাথের রচনার ক্ষেত্র মণিপুর নগর (শোনা যায় মহাভারতের সময় এটি কলিঙ্গ নিকটবর্তী কোনও এক রাজ্য ছিল, আমাদের এখনকার চেনা উত্তর-পূর্ব ভারতের মণিপুর রাজ্য নয়)। সেখানে অর্জুন এক অতিথি মাত্র।

মহাভারতের চিত্রাঙ্গদা সুন্দরী, অর্জুন তাঁকে দেখে প্রণয়াসক্ত হয়ে তাঁর পাণিপ্রার্থী হন। রবীন্দ্রনাথের অর্জুনের কাছে বালকবেশী চিত্রাঙ্গদা উপহাসের পাত্রী। সে না সুযোগ্যা নারী, যার প্রতি প্রণয়দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, না সে যথার্থ, পুরুষ যার সঙ্গে যুদ্ধ করা যায়। তাই 'ক্ষমা দিয়ে অসম্মান' করাই তার প্রতি যোগ্যতম প্রত্যুত্তর।

কিন্তু 'ক্ষমা দিয়ে' অর্জুন 'অসম্মান' করলেন কাকে? অর্জুনের কি সে বোধ ছিল? না নেহাতই পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিলেন তৃতীয় পাণ্ডব? অসম্মানের গ্লানিময়তা কিন্তু গভীরভাবে বিদ্ধ করেছে চিত্রাঙ্গদাকে, সে আঘাত অর্জুনের গাণ্ডীবঞ্চনিক্ষিপ্ত যে কোনও বাণের থেকে অনেক তীব্রতর। সেই গ্লানি সেই অসম্মান এমনই যে, মৃগয়াপটিয়সী, যোদ্ধা চিত্রাঙ্গদা অনঙ্গের শরণাপন্ন হলেন, ঠিক 'চণ্ডালিকা'-য় যেমন প্রকৃতি ছুটে গিয়েছিল মায়ের কাছে মায়াবলে আনন্দকে ফিরিয়ে আনতে।

মদন বা অনঙ্গ রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় কাব্যদেবতা। যত দূর বুঝি, বা ভাবতে ভাল লাগে যে, মদনের এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা উনি কালিদাসের কাছ থেকে পেয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলে রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন 'পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কী সন্ন্যাসী, বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!'—তখন যেন প্রায় মনে হয় 'কুমারসম্ভব' রচয়িতার নাট্যবর্ণনাকে ব্যাহত না করে আজকের কবি লুকিয়ে গোপনাক্ষরে লিখে দিচ্ছেন এক অমূল্য টীকা।

মদন কাব্যের দেবতা, ফলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সে প্রণয়ের চিকিৎসা করতে পারে। যদিও পুরাণ তার সঙ্গে মদন-সঙ্গিনী রতি-কে গেঁথে দিয়েছে, কবির মদন যেন নিজের প্রণয়ের প্রতিমূর্তিধারী এক অর্ধনারীশ্বর। চিত্রাঙ্গদা-কে তিনি রূপ দিলেন, মোহিনী মায়া দিলেন—কিন্তু সময়টা বেঁধে দিলেন এক বছরে। বিদেশি রূপকথার সিন্ডারেলা-র থেকে চিত্রাঙ্গদা সেদিক দিয়ে ভাগ্যবতী; রাত বারোটার থেকে গোটা একটা বছর অনেক বেশি সময়। কিন্তু পুরো সময়টা ব্যবহার করতে পারলে না চিত্রাঙ্গদা। মায়া-লাবণ্যের আকর্ষণ তারই মধ্যে নিরাসক্ত করেছে অর্জুনকে, সে খুঁজছে সেই ধনুর্ধারিনী চিত্রাঙ্গদাকে।

মদনের চরণতলে মায়াআবরণ বিসর্জন দিতে-দিতেই বুঝি মণিপুর রাজকন্যা হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, তাঁর যদি সত্যিই কোনও উজ্জ্বল আবেদন থাকে, তবে তা জন্মগত শৌর্যদীপ্ত নারীশরীরে। নারীর লাস্য অর্জুন খুঁজে পাবেন উলূপী, সুভদ্রা, পাঞ্চালী, উর্বশী অনেকের মধ্যে—কিন্তু আজ যার জন্য অর্জুনের এই ব্যাকুল অনুসন্ধান-সেই পৌরুষদৃপ্ত নারী—সেটা সেই সঙ্গেই বুঝি অতীতের অবহেলার সেই খেদোক্তি 'ক্ষমা দিয়ে, কোরো না অসম্মান' আজ এক স্বাধীন সগর্ব উক্তি হয়ে সবথেকে বড় যুদ্ধঘোষণা ছুড়ে দিল বহুনারীগামী ধনঞ্জয়ের সামনে। 'নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী। আমি চিত্রাঙ্গদা রাজেন্দ্রনন্দিনী'-র মধ্যে কুলগৌরব নেই, রাজ আভিজাত্যের অহংকার নেই, স্বশাসিকা এক নারীর আত্মসম্মানের উচ্চারণ আছে—যিনি অনন্যা, যিনি স্বতন্ত্র, যিনি পিতার শাসন এবং অনঙ্গের মায়ার ভিতর থেকে খুঁজে পেয়েছেন নিজের সম্পূর্ণতাকে। চিত্রাঙ্গদা জন্মেছেন নারী হয়ে, বড় হয়েছেন পুরুষ হয়ে, আবার মদনের আশ্রমে পুনর্জন্ম নিয়েছেন লাস্যের লোভে এবং সেই বর স্বেচ্ছায় ফিরিয়ে দিয়েছেন, গভীর আত্মানুসন্ধানে এবং চরম আত্মপরিচয়ের উপলব্ধিতে।

রবীন্দ্রনাথের আখ্যান এখানেই শেষ।

কিন্তু 'মহাভারত' অর্জুনের জন্য যে একবছরের বৃহন্নলার ভূমিকা নির্ধারিত করে রেখেছিল, তা আদিকাণ্ড-র বনবাস পর্বাধ্যায়ে, আমাদের এখনও অজানা।

আবার সেই একবছর। অজ্ঞাতবাসে বিরাটসভায় বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন বেণীধারিণী নৃত্যশিক্ষক, তবে কি এ-ও মহাভারতকারের poetic justice?

যে, আদতে নারীত্ব এবং পৌরুষের সামনে সমানভাবে আনত না হলে মানবজন্ম সম্পূর্ণ হয় না?

৬ মার্চ, ২০১১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লন্ডনে রওনা দেওয়ার প্রাক্কালে লিখতে বসলাম। আপনারা যখন এটা পড়ছেন, তখন আমি বিলেতে।

কলকাতা ছাড়া আমার অন্য কোনও প্রিয় শহর বলে যদি কিছু থাকে—সে দু'টো হল লন্ডন আর নিউ ইয়র্ক।

নিউ ইয়র্কে আবার শুধু ম্যানহ্যাটান অঞ্চলটাই ভাল লাগে, আর লন্ডনের গোটা শহরটা।

মনে আছে প্রথমবার যখন লন্ডন যাই, আমার মনে হয়েছিল, নতুন করে যেন আমি কলকাতাকে আবিষ্কার করছি। কোনও বাড়ি দেখে জিপিও, কোনওটা রাজভবন, কোনওটা আবার রাইটার্স-এর লালবাড়ির মতো, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, টাউন হল—কত বলব। এমনকী, বহুদিন যে বুঝিনি ভবানীপুর থানার সামনে যে-দেওয়ালে উৎকীর্ণ করা আছে 'POLICE HOVSE'; সেখানে 'হাউস' লিখতে কেন যে 'ইউ'-এর জায়গায় 'ভি' ব্যবহার করা হয়েছে; এই চিরকালীন কৌতূহলেরও সহজ একটা উত্তর পেয়ে গেলাম ওখানে গিয়ে। বুঝলাম এটা Welsh বানানের ধরন।

লন্ডনের একটি চলচ্চিত্রোৎসবে 'আরেকটি প্রেমের গল্প' আর 'মেমরিজ ইন মার্চ' দেখানো হবে, আর আমার সঙ্গে ওয়েস্টমিস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের একটা লম্বা কথোপকথনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেশ মজাই লাগছে সব মিলিয়ে।

যাওয়ার দিন কাগজে পড়ছি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী গুলাম নবী আজাদ সমকামিতাকে 'পশ্চিম থেকে আগত একটি ব্যাধি' বলেছেন।

খবরটা পড়ে কেবলমাত্র তাঁকে পুরাতনপন্থীই মনে হল না, সাম্প্রদায়িকও মনে হল—ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খাজুরাহো বা কোনার্ক মন্দিরের (নানা থিমমূর্তির মধ্যে) সমকামিতা সম্পর্কে এতটা অজ্ঞ, সেটা ভাবিনি। এ কেবল অপ্রশস্ত মন নয়, সাংস্কৃতিক সংকীর্ণতা।

আসলে ধর্ম আর মানব-প্রকৃতির স্বরূপ—দু'টো বস্তুকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না বলে, নিজেদের তৈরি তকমা লাগাই।

তাতে সভ্যতার ইতিহাসের দেবতা অলক্ষ্যে হাসেন, এবং সময়মতো এই মানবক্রটি শুধরেও দেন।

দিল্লি হাই কোর্টের রায় বেরনোর পর বাবা রামদেব-ও সমকামিতা সম্পর্কে একই কথা বলেছিলেন—বলেছিলেন যে—তিনি এই ব্যাধি সারিয়ে দিতে পারেন।

বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে ঠাট্টা করে তখন বলেছিলাম—আমি তা হলে যাই, রামদেবের কাছে চিকিৎসা করিয়ে আসি বরং। তাতে আরোগ্য কত দূর হবে জানি না, কিন্তু কয়েকদিন পর বাবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রামদেব সম্পূর্ণ সমকামী হয়ে উঠবেন, এটুকু হলফ করে বলতে পারি।

সে-যাত্রা আর হয়নি। ভাবছি, লন্ডন থেকে ফিরে এসে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কয়েকদিন কাটিয়ে আসব।

১৭ জুলাই, ২০১১

অনেক দিন পর মুম্বই গেলাম কয়েক দিনের জন্য। 'চিত্রাঙ্গদা' ছবির শব্দ মিশ্রণের কাজটুকুর তদারক করতে।

এই ভরা শ্রাবণে মুম্বইয়ের রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি সবই কেমন অবাসযোগ্য হয়ে উঠতে থাকে। পথে হাঁটা যায় না। গাড়ি চাপলে বিশাল ট্র্যাফিক জমে দু'পা অন্তর। বাড়িতে এয়ারকন্ডিশন না বসালে ভ্যাপসা গরম—চালালে এমন আর্দ্রতা, যে মেঝে থেকে আয়না সবই বাষ্পাবৃত।

যে হোটেলটায় ছিলাম এবার, আগে কখনও সেখানে থাকিনি। প্রযোজকরাই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন—আর আমার কাজের জায়গা থেকে হেঁটে গেলে হোটেলটা মোটে তিন মিনিটের রাস্তা। কিন্তু রাস্তার যা অবস্থা, খানাখন্দে ভরপুর—আর তার সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি, আমাকে হোটেলের গাড়িই ছেড়ে দিয়ে আসত।

হোটেলটা ছিমছাম, আধুনিক হওয়ার চেষ্টা—বেশ আড়ম্বরহীন। রুচিসম্পন্ন আসবাব, অনেকটা মার্কিন ধাঁচের—আবার সঙ্গে রিসেপশনে প্লাস্টিকের মালা পরানো সিরিডি সাঁইবাবার ছবি, এবং স্টিলের একটা ধূপদানি।

এইটুকু অবধি মার্কিন প্রভাব থাকলেই ভাল ছিল—ঘরে ঢুকেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। কোনও সিলিং ফ্যান নেই। আমি আজও বুঝতে পারি না যে, সাহেবদের নকল করতে গিয়ে আমাদের মতো ট্রপিকাল দেশে পাখা বাতিল করে দেওয়া হল কেন?

আমার আবার গরম-বাতিক। ফলে বকে, বলে-কয়ে ধমকে ঘরে একটা টেবিল ফ্যান আনালাম। কিন্তু টেবিল ফ্যানের মুশকিল হচ্ছে—যে সেটা চালালে মেঝের বাষ্প শুকোয় না। বা স্যাঁতস্যাঁতে কিছু রৌদ্রাভাবে অনেক সময় আমরা পাখার তলায় রেখে শুকিয়ে নিই—কারণ, বৃষ্টির জন্য জানলা খোলা যাচ্ছে না।

কাজ শুরু হল। প্রথম দু'দিন অনেকটা এগিয়েও গেল। তৃতীয় দিন ঠিক হল, একটু বেলায় শুরু করব। এমনিতেই মুম্বইয়ের মানুষরা একটু বেলা করে ওঠেন, আমার তাড়নায় সাত-সকালে উঠে কাজে আসতে হচ্ছে—তাই একবেলার সামান্য বিশ্রাম।

সেদিন আমার বারোটার আগে বেরনোর নেই। আর এই অঝোর বৃষ্টিতে কোথায়ই বা যাব?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোটেলেই আছি। কিছুক্ষণ পর রিসেপশন থেকে ফোন আসতে লাগল যে আমার ক'টায় গাড়ি লাগবে। আমি বলে যাচ্ছি বারোটার আগে দরকার নেই, তেমন প্রয়োজনে এক ঘণ্টার নোটিশে জানিয়ে দেব। হঠাৎ আমার ফ্লোরের সব আলো নিভে গেল। কিছুক্ষণ জেনারেটরের জন্য অপেক্ষা করে করিডরে বেরোলাম। প্রায় অন্ধকার, তারই মধ্যে একটা মেঘলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে একজন হোটেল কর্মচারী হাউস কিপিং ট্রে নিয়ে দাঁড়িয়ে। আলোয় ঠাহর করার চেষ্টা করছে কী কী জিনিস কোন বাস্কেটে রাখবে, ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। আমি তাকে ডাকলাম। কোনও সাড়া নেই। তারপর আবার ডাকলাম। ফের নিরুত্তর। তখন ভাল করে বোঝার চেষ্টায় কাঁধে গিয়ে টোকা দিতে ফিরে তাকাল। ফিরেই ইশারায় বলল যে ও মূক—বধির। আমিও ইশারায় অন্ধকারটা দেখিয়ে প্রশ্ন করলাম আলো কখন আসবে। ওর একমাত্র ইশারা টেলিফোনের ভঙ্গি—মানে ঘর থেকে ফোন করে জেনে নিতে।

ঘরে ফেরত আমি। আর বিদ্যুৎ-ও ফেরত প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। বাসিবিছানা ঘরে পড়ে আছে। মেঝে স্যাঁতস্যাঁতে—আমি রিসেপশনে ফোন করলাম যে ঘরটা পরিষ্কার করার জন্য নির্দিষ্ট কর্মচারীদের পাঠিয়ে দিতে। ওরা আবার জিজ্ঞেস করল আমি কখন বেরবো। উদ্দেশ্য আমি বেরিয়ে গেলে তারপর ওরা নিশ্চিন্তে ঘর পরিষ্কার করবে, আমার অসুবিধে হবে না। আমি জোর দিয়ে বললাম,

—না, এখনই পাঠান—আমার অসুবিধে হবে না। বাসি ঘরে থাকতে আমার ভাল লাগছে না।

কিছুক্ষণ পর। আমি কী একটা বই পড়ছি—দরজায় মৃদু টোকা। আমি দরজা খুলতেই দেখি তোয়ালে, চাদর, বালিশের ওয়াড়, ঝাঁটা, তরল সাবান—সব নিয়ে দু'জন দাঁড়িয়ে, দু'টি অল্পবয়সি ছেলে। বুঝলাম এরা ঘর পরিষ্কার করবে। আমি আবার বইয়ে নিমগ্ন। হঠাৎ খেয়াল হল গতকালের কাচতে দেওয়া জামাকাপড় আসেনি এখনও। ওদের ডাকলাম খোঁজ নেব বলে, দু'জনের কেউ সাড়া দিল না। একটু অবাক আমি। আবার ডাকলাম, এবারও কোনও সাড়া নেই। আমার দিকে পিছন ফিরে ক্ষিপ্র অভ্যস্ত হাতে বিছানার চাদর পাল্টাচ্ছে।

আমার কিছুক্ষণ আগের অভিজ্ঞতা আমায় জানান দিচ্ছে যে এরা বোধহয় কথা বলতে পারে না। দেখা গেল বাস্তবিকই তাই। মুহূর্তের জন্য অধৈর্য লাগল। লন্ড্রি আনেনি। বাথরুমের একটা আলো জ্বলছে না, আরও কী কী—এতসব এখন বোঝাব কী করে?

মুহূর্তখানেকই, ব্যস। নিজেকে বোঝাতে ওইটুকুই সময় লেগেছিল। বুঝলাম আর কিছু না—স্বাভাবিক কথোপকথনের থেকে একটু বেশি ধৈর্য, তা হলেই হয়ে যাবে। একজনকে কাছে ডেকে আগের দিনের লন্ড্রির বিলটা দেখিয়ে আস্তে আস্তে আমার মতো করে সাইন ল্যাঙ্গোয়েজে জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করলাম। ছেলেটির মুখ মুহূর্তের জন্য আলো হল। ছুটে গিয়ে আলমারি থেকে একটা লন্ড্রি ব্যাগ এনে দিল। আমি যে সেটা চাইনি এটা বোঝাতে যাব। দেখলাম আবার সেই আলো মুখে অসহায়তার এবং অপারগতার মেঘ। আমি হেসে বললাম—ঠিক আছে, ধন্যবাদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওরা চলে গেল। আর আমি চুপ করে মেঘলা ঘরে বসে ভাবছি, এ কোন হোটেল, যারা সাহস করে মূক-বধির কর্মীদের কাজ দিয়েছে। ভাবলাম বেরবার সময় এদের একটা ধন্যবাদ দিয়ে যাব।

গাড়ি এসে গিয়েছে। রিসেপশনে চাবি রাখতে গিয়ে সেই সুবেশী রিসেপশন-তরুণীকে বললাম, যে হাউজ কিপিং-এর যে দু'টি ছেলে আমার ঘরে এসেছিল তাদের বোঝাতে পারিনি যে আমার গতকালের লন্ড্রিটা এখনও পাইনি, ওটা এলে যেন আমার ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

সদাহাস্যমুখী মেয়েটির ভুরু কুঁচকে গেল। প্রায় রণচণ্ডীর মতো কোনও এক অধস্তন কর্মচারীকে ডেকে মারাঠি ভাষায় ভীষণ গালমন্দ করতে লাগল। একসময়ে ঘন ঘন মুস্থই যেতাম বলে মারাঠি ভাষাটা কিছুটা বুঝি। বুঝলাম, মহিলার উদ্বেগ আমার লন্ড্রি নিয়ে নয়, কেন আমার ঘরে, আমার উপস্থিতিতে ওই দু'টি ছেলেকে পাঠানো হয়েছে তাই নিয়ে। তারপর নিজেকে সামলে আমার সেই বিজ্ঞাপনী হাসি ফেরত এনে বলল,

—চিন্তা করবেন না স্যর। আপনার লন্ড্রি ঘরে পৌঁছে যাবে এক্ষুনি।

আমি গাড়িতে উঠলাম। যে সাধুবাদটুকু দেব ভেবেছিলাম মনে মনে সেটা ফিরিয়ে নিলাম। বুঝলাম, এই মানুষগুলোকে হোটেলের কাজে নিয়োগ করার পিছনে কোনও বড় সামাজিক উদ্দেশ্য নেই। ওদের দিয়ে তুলনায় অনেক সস্তায় কাজ করানো যাবে। এবং তাই এরকম বেশ কয়েকজনকে রাখা হয়েছে—যারা নিজেরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে কাজ করে নেবে। আমি নেহাত বেলা অবধি ছিলাম বলে এদের সাক্ষাৎ পেয়েছি—সাধারণত গেস্ট বেরিয়ে গেলেই এদের ঘরে পাঠানো হয়।

রাস্তায় অঝোরে বৃষ্টি। সব মানুষের মুখ ছাতার আড়ালে। মনে হল এটা মার্কিন প্রভাবের কী বদহজম—আসবাবে আর শোষণে। কতগুলো মানুষকে, বৈধ জীবনে যাদের সম্পূর্ণ অধিকার, তাদের অন্তরালে সস্তার ক্রীতদাস করে রেখে হোটেলের মহাজনী ব্যবসা চলছে ভারতের বাণিজ্যিক রাজধানীতে।

আমরা ইন্টারনেট যুগের বাসিন্দা। ই-মেল-এর দৌলতে শো-ডিটেল্‌স আর হাইড ডিটেল্‌স শব্দ দু'টো আর আমাদের অপরিচিত নয়।

কিন্তু কম্পিউটারের বাইরে প্রাত্যহিক চলমান জীবনে তার এরকম অভূতপূর্ব প্রয়োগ অনেকদিন পরে নাড়া দিল।

হোটেলের নামটা ইচ্ছে করে বলছি না। কারণ, আমার বিশ্বাস পদ্ধতিটা কেবল তাদের মস্তিকোদ্ভূত নয়। হাইড ডিটেল্‌স-এর এই নিদর্শন নিশ্চয়ই নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

৭ আগস্ট, ২০১১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রামায়ণ', 'মহাভারত'-এ পড়েছি 'প্রায়োপবেশন'-এর কথা। মানেটা জানতাম না, নৃসিংহদা বুঝিয়ে দিলেন।

'প্রায়' কথাটার অর্থ করলে দাঁড়ায় 'প্রকৃষ্টভাবে গমন'—যেমন 'অয়' অর্থ 'গমন' এবং 'অয়ন' গতি। তাই সূর্যের একদিন যেতে অন্য দিকের পরিক্রমা-গতিকে আমরা উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ণ বলি। কি অদ্ভুত না। কেবল একটা কথার মানে বুঝতে গেলে কত কি শেখা হয়ে যায়।

যাক গে, রামায়ণে প্রায়োপবেশনের উল্লেখ কতিপয় বানরসেনার গল্পে পাই, যাঁরা সুগ্রীবের নির্দেশে সীতাকে খুঁজতে বেরিয়ে এবং অবশেষে অকৃতকার্য হয়ে ফিরে আসে এবং নৃপ-আজ্ঞা পালনের অকৃতার্থ অনুশোচনায় প্রায়োপবেশনে বসার সংকল্প করেন।

একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, এই স্বনির্বাচিত আত্মহননের মূলে রয়েছে বিবেকের বা কর্তব্যস্খলনের এক তীব্র গ্লানি। যে সীতাকে তারা কোনওদিন চোখেও দেখেননি, যে রাম এবং লক্ষ্মণ সদ্য পরিচিত রাজ-অতিথি, কেবল রাজা সুগ্রীবের আজ্ঞা পালনে অপারগতাই তাদের মূল লজ্জা ও আত্মধিক্কার।

অন্যদিকে ইন্দুমতীর মৃত্যুতে তাঁর রাজপতি দশরথপিতা অজ বিলাপ করতে-করতে বলেন, যেমন অট্টালিকা ভেদ করে বৃক্ষচারা নির্গত হয়, তেমনই ইন্দুমতীর বিচ্ছেদ আমার হৃদয়ে শোকশঙ্কুর (দুঃখের পেরেক) মতো বিঁধছে—আমি প্রায়োপবেশনে বসব।

যে সহমরণকে আমরা চিরকাল পুরুষের অত্যাচার বলে জেনে এসেছি। কবি বুঝি সহধর্মিণীর প্রতি পতির কর্তব্য এবং প্রেমকে মিলিয়ে দিলেন সহমরণের এক বিপ্রতীপ অনুজ্ঞায়। পত্নী বিরহিতা অজ পুত্র দশরথের হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করে প্রায়োপবেশনের সংকল্প করলেন।

এই গেল একটি মহাকাব্যের দু'টি দৃষ্টান্ত। একদল প্রজার আত্মধিক্কারের, আর এক পত্নী-বিরহিতা রাজার শোকমজ্জিত হৃদয়ের সংকল্প। আমরণ অনশন।

মহাকাব্যের এই দু'টি উদাহরণ হয় আমাদের অজানিত থেকে গিয়েছে। বা হয়তো আমরা ভুলেই গিয়েছি।

তৃতীয় একটি তীব্র উদাহরণ উঠে আসে মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রায় অন্তিম পর্বে। আগের রাত্রেই পঞ্চপাণ্ডব সন্দেহে অশ্বত্থামা হত্যা করেছেন পাঁচজন পাণ্ডবপুত্রকে, পুত্রশোকাতুরা দ্রৌপদী বসলেন প্রায়োপবেশনে—তাঁর পুত্রহত্যার প্রতিশোধ কামনা করে।

অথচ, পাঞ্চালির জীবনের নানা বিপর্যয়ের পর্বে, এই চির নিপীড়িতা রাজ্ঞীর নারীত্বের বিবিধ অপমানের সময়ও দ্রৌপদী নিজে বারবার ঘোষণা করেছেন যে তিনি মহাপরাক্রমশালী দ্রুপদকন্যা, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বীররা তাঁর স্বামী, অথচ প্রায় কোনওদিনই বলেননি যে তিনি পঞ্চপুত্রের মা। ফলে পুরুষের চোখে পঞ্চস্বামীগামিনী এই রমণী ভোগ্যা হয়েই রয়ে গিয়েছেন আজীবন—তাদের লালসাকে কখনও ধিক্কার জানায়নি দ্রৌপদীর মাতৃরূপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুরুসভায় দ্যূতক্রিড়ার পরের লাঞ্ছনার সময়ও দ্রৌপদী পঞ্চস্বামীকে নানাভাবে দোষারোপ করেন, ভর্ৎসনা করেন ধৃতরাষ্ট্রদের কিন্তু কখনও মুখ ফুটে বলেন না যে—আমি পাঁচ-পাঁচটা ছেলের মা, আমার সঙ্গে এই দুর্ব্যবহার কোরো না।

জানি না, মাতৃহৃদয়ের এই আকুতি হয়তো দুর্যোধন, কর্ন বা দুঃশাসনকে কোনওভাবে অন্তত সাময়িক একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলেও করতে পারত। হয়তো তার ফলে বদলে যেত মহাভারতের বাকি অধ্যায়।

কেবল চরম লাঞ্ছনার পর আপাত অনুতপ্ত। ধৃতরাষ্ট্র যখন দ্রৌপদীকে বর দিতে চান, দ্রৌপদী বলেন,

—প্রতিবন্ধের পিতাকে মুক্তি দিন। আমার সন্তান দাসপুত্র হয়ে থাকবে, এ আমার সহ্য হবে না।

বাক্যটি অবশ্যই যুধিষ্ঠিরকে উদ্দেশ করে বলা, এবং তার অন্তর্নিহিত শ্লেষ যাতে ধর্মরাজকে বিদ্ধ করে সেটাও দ্রৌপদীর অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু এই অভিঘাত নির্মাণ করার জন্য একবার তাঁর পুত্রের উল্লেখকে তিনি ব্যবহার করেছিলেন।

সেই দ্রৌপদী পুত্রবধের পর যেটা করলেন, আগে তাঁকে কখনও করতে দেখা যায় না। তাঁর প্রায়োপবেশন। এর আগে কৃষ্ণের কাছে ঘন কালো চুল দেখিয়ে বলেছেন—যখন শান্তিপ্রস্তাব করতে হস্তিনায় যাবে, মনে রেখো কেশব, এই কেশ আকর্ষণ করে আমায় রাজসভায় টেনে এনেছিল দুঃশাসন।

দ্রৌপদীর মধ্যে একটা প্রতিশোধপরায়ণতা আমরা দেখতে পাই। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই সেটা প্রকাশিত হয়েছে স্বামীদের প্রতি তাঁর কটু ধিক্কারে। নিজেকে শেষ করে দেওয়ার পণ নিয়ে অনশনকে আলিঙ্গন করা, এ যেন এক অন্য দ্রৌপদী।

২

দ্রৌপদীর এই প্রায়োপবেশন তার মহাকাব্যিক অনুষঙ্গ বর্জিত হয়েও ক্রমশ হয়ে উঠেছে ভারতসভ্যতায় নারীদের এক নিঃশব্দ প্রতিবাদ অস্ত্র।

গোঁসাঘরে খিল দেওয়া বা ভাতের থালা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলা যতদিন না অসুখ হচ্ছে এ অন্ন আমার মুখে রুচবে না, এটা ভারতীয় নারীর এক অভিমানী আত্মপ্রকাশ।

যে দেশে মেয়েরা স্বামীপুত্রের মঙ্গলকামনায় সপ্তাহের বেশিরভাগ দিনই উপবাসে কাটান, তাঁরা খেলেন কি না খেলেন তা দিয়ে বাড়ির ব্যাটাছেলের খুব একটা কিছু এসে যেত না, এমনকী অভিমান করে খাওয়া বন্ধ করে দিলে তাঁদের সে খবর জানারও কথা নয়।

তাই ক্রোধ বা আক্ষেপবশত, চরম দুঃখে বা অপমানে তাঁরা প্রায় 'কখনওই বাড়ির পুরুষদের সামনে বঁটি হাতে এসে দাঁড়াননি। অবলার প্রতিশোধ ছিল তার একান্ত উপবাস, কেবল তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই

'ন্যাকা' শব্দটির অর্থ আমরা, বেশির ভাগ বাঙালিই বোধহয় বুঝি না। তাই, অপপ্রয়োগ করি। কিংবা এমনও হতে পারে, একেকটি শব্দ মানবজিহ্বা-পথে বহুদিন পিচ্ছিল হতে হতে তার আদি অনুষঙ্গ ভ্রষ্ট হয়। 'ন্যাকা' শব্দটিরও সেই ধরনের কোনও বিবর্তন ঘটে থাকবে।

'ন্যাকা' শব্দটির প্রচলিত প্রয়োগ থেকে একটা মানে করে নেওয়া যায়—বাহুল্য-বিশিষ্ট কপট ভনিতা-সর্বস্বতা।

অর্থাৎ যিনি সবসময়েই, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও, এক ধরনের অতিরিক্ততার আশ্রয় নিচ্ছেন। বেশি-বেশি লজ্জা পাচ্ছেন, বেশি-বেশি রেগে যাচ্ছেন, বা বেশি স্পর্শকাতরতার ভাব দেখাচ্ছেন।

'চলন্তিকা'-র অর্থটা যদি কেতাবি বলে ধরি, এবং আমার উপরিউক্ত বর্ণনাটিকেও; তা হলেও কিন্তু দেখব 'ন্যাকা' শব্দটির প্রয়োগের পরিসর যথার্থভাবেই এই দু'টি অর্থে সীমিত নয়। অপভ্রংশ হতে-হতে এই শব্দটি তার আপেক্ষিক ভিন্নতর প্রয়োগের গুণে বা দোষে আরও অবাঞ্ছিত কোনও অর্থের প্রলেপ পেয়েছে।

ছোটবেলায়, জ্ঞানত মনে আছে, যখন স্কুলে যেতে আরম্ভ করলাম, আমাকে খ্যাপানোর সুনির্বাচিত শব্দটিই ছিল : 'ন্যাকা'।

আমার বাচনভঙ্গি, আমার হাত-পা নাড়া ইত্যাদি যে আমার সহপাঠীও আর পাঁচটি পুরুষছাত্রর থেকে আলাদা; সে-কথা আমার শিশুমনও বুঝতে পারত।

তাই, আর সবাইকে ছেড়ে 'ন্যাকা' শব্দটি যখন আমাকে আক্রমণ করার জন্যই বেছে রাখা হয়েছিল—তখন মনে-মনে মানে করে নিয়েছিলাম যে, 'ন্যাকা' মানে বোধকরি আলাদা। বা ব্যতিক্রমী।

তখন বোঝার বয়স হয়নি। বা বুঝলেও বলার সময় তো আসেইনি যে, 'ন্যাকা' শব্দটি gender mimicry-র একটি নিষ্ঠুর অপপ্রয়োগ, শব্দটির কেতাবি অর্থের মতো, আমাকে ন্যাকা বলার উদ্দেশ্য 'অজ্ঞ' বা 'কপট' বলা নয়। নারীসুলভ বলেই যে আমি 'ন্যাকা' সে-কথাটা অভিধান বলে দেয়নি।

একটু যখন বড় হলাম, গলায় সামান্য হলেও প্রতিবাদের সুর ফুটল, তখন কয়েকবার প্রত্যুত্তরে বলেছি বলে মনে আছে—'আমি ন্যাকা নই। আমি মেয়েলি। তোমরা দু'টোর তফাত জানো না।'

তিন

আমার কথা যাক। যত বড় হচ্ছি, চারপাশে 'ন্যাকা' শব্দটির যথেচ্ছ ব্যবহার আমাকে বিভ্রান্ত করে এসেছে। এবং বিশেষ করে যখন এই বিশেষণের লক্ষ্য হতে দেখেছি আমার নানা বন্ধুবান্ধবদের, ন্যাকামির বিন্দুমাত্র যাদের মধ্যে নেই। কলকাতা শহরের একটি নাম প্রথমেই মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসছে। মুনমুন সেন।

বিশ্বসুদ্ধ প্রায় সকলেই, যাঁরা তাঁকে চেনেন না, তাঁদের কাছে ন্যাকামিই মুনমুন সেনের একমাত্র পরিচয়।

তাঁর আপাত একটা চরিত্র-বৈশিষ্ট্যর কারণে হয়তো-বা তাঁকে এই বদনামটি বহন করে বেড়াতে হয়—তাঁর স্বাভাবিক আধো-আধো ভাবে কথা বলা, কিংবা তাঁর ইঙ্গ-সংকর বাংলা ভাষা।

তবে, সেটাকে যদি অভিযোগের কারণ বলে ধরি; তা হলে তো বর্তমানের বেশ কয়েকটি প্রজন্মের গায়ে ইতিহাস এই ব্যঙ্গচিহ্ন মেরে দেবে?

আমরা যারা মুনমুনকে চিনি এবং জানি তাঁর শীলিত ব্যক্তিত্বের কথা, তাঁর শাণিত বুদ্ধি, অগাধ পড়াশোনা, অপূর্ব ছবি আঁকার হাত, সূক্ষ্ম নান্দনিকবোধ, আপামর জনসাধারণের প্রতি প্রায় নির্বিচারে এক পরম আন্তরিক উষ্ণ ব্যবহার, এবং সর্বোপরি তাঁর নির্ভীক স্পষ্ট কথা—এগুলোর কোনওটাই যে ন্যাকামির মধ্যে পড়ে না!

তবে কি 'অপরিণত কণ্ঠস্বর' ন্যাকামির একটি নতুন সংজ্ঞা হল?

চার

AMARBOI.COM

ন্যাকামির আরেকটি বহুলপ্রচারিত শিকার অবশ্যই রবীন্দ্রসংগীত।

এর পিছনে দীর্ঘদিনের নানা শিল্পীর গায়কি, কোটি-কোটি পাড়ার ফাংশন, এবং স্বরবিতান-এর শাসন ছাড়াওছিল এক ব্রাহ্ম শুদ্ধিবাগিশতা, এবং সেটাই হয়তো রবীন্দ্রসংগীতকে 'ন্যাকা' বলার কারণ হবে। বাঙালি দোল, দুর্গোৎসবে ফাগ-সিঁদুরে রঙিন হতে চান, সেটাই তাঁদের মোনোক্রোম দৈনন্দিনতা থেকে মুক্তি। রবীন্দ্রসংগীত কেবল দুর্বোধ্য বাণী, 'একঘেয়ে' সুর নিয়ে আসে না, সঙ্গে অনেক গায়ক-গায়িকার জন্য এক শুভ্রবেশ এবং খোঁপার সাদা ফুল। ফলে রবীন্দ্রসংগীত ন্যাকা না-হয়ে যায় কোথায়? এখানে হয়তো আমার শিশুমানসের অভিধানের 'ন্যাকা' অর্থে 'আলাদা' মানেটা মিলে যাচ্ছে!

ধীরে-ধীরে রবীন্দ্রসংগীত ছেড়ে তথাকথিক রাবীন্দ্রিক সংস্কৃতিই একঘরে হল 'ন্যাকা' বলে।

মনে আছে, সত্যজিৎ তারুণ্যে শান্তিনিকেতনে ভর্তি হতে আপত্তি করেছিলেন, সেখানকার ছেলেরা 'ন্যাকা' বলে। 'এই গরু সরে যা, নইলে ফুল ছুড়ে মারব'—শান্তিনিকেতন ছাত্রদের এই তথাকথিত বৃহন্নলা-বাণী কার আবিষ্কার জানি না, তবে কথাটির মানে বুঝলে দেখতে পাই, এখানে প্রকাশভঙ্গির পাশাপাশি যেটিকে ব্যাঙ্গাত্মক বলে ধরা হয়েছে, তা আদতে অহিংসার এক অতিরঞ্জন। যে-বাঙালি জীবনে যুদ্ধ করল না, কেবল সামরিক পোশাক পরিহিত বলে নেতাজি-কে চরম নায়ক বলে মেনে নিল, এবং বাড়িতে বউ পিটিয়ে ক্ষাত্রধর্ম পালন করল, সেই আজন্ম করণিক অফিসযাত্রী-বাঙালি বীরপুঙ্গবদের কাছে এটা গ্লানিময় বইকি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নইলে এই বাংলার, নবদ্বীপের, পরমপুরুষ শ্রীচৈতন্য তাঁর কালের দোর্দণ্ড দুরন্তপনার ইতিহাস, ন্যায়বিদ্যার দণ্ড অতিক্রম করেও কেবল অহিংস কৃষ্ণভক্তির জন্য বাঙালিরই মুখে 'ন্যাকাচৈতন্য' হন?

পাঁচ

তা হলে দাঁড়ালটা কী? অজ্ঞতার ভানকারী মানুষ মানে 'ন্যাকা'? সে তো গোটা পৃথিবীটাই! তা হলে 'বাঙালি ন্যাকা' বলে পড়ে রইলেন কারা? আমি, মুনদি (মুনমুন সেন) ইত্যাদি। আর যাঁরা এখনও ভাল বাংলা বলেন, সঠিক উচ্চারণে বাংলা বলেন, যাঁরা এখনও অকারণ অশ্লীলতাকে সহজে গ্রহণ করতে পারে না, এখনও মদ্যপানের সভায় সসংকোচে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, কিংবা নিজের dignity বজায় রেখে পরের বাড়ির গল্প শুনতে বা নিজের হাঁড়ির গল্প করতে পছন্দ করেন না—তাঁরা। আর চটুল ভনিতাসর্বস্ব কপটতা—সেটা তো কবে সিনেমার Property হয়ে গিয়েছে। শাহরুখ খান থেকে মল্লিকা শেরওয়াত-এর কল্যাণে।

৬ মে, ২০১২

AMARBOI.COM

সাধারণত 'ফার্স্ট পার্সন'-এ তারিখ লেখায় আমি বিশ্বাস করি না। কারণ অধিকাংশ সময়েই আমার 'ফার্স্ট পার্সন' এতটাই কালনিরপেক্ষ যে, কেবল লেখার তলায় একটা তারিখ গুঁজে দেওয়া অবান্তর লাগে।

মাঝে-মাঝে অবশ্য এই নির্লিপ্ততা বিভ্রান্তির সৃষ্টিও করেছে। সাম্প্রতিক কালের নিউইয়র্ক ভ্রমণ-সংক্রান্ত 'ফার্স্ট পার্সন'-টিই যদি ধরি।

যেহেতু 'ফার্স্ট পার্সন', বা সে-অর্থে 'রোববার'-এর যে কোনও লেখাই, জমা পড়ে যায় অন্তত এক সপ্তাহ আগে—অর্থাৎ এই 'রোববার'-এর যাবতীয় রচনার পাণ্ডুলিপি আগের সপ্তাহে জমা পড়েছে দপ্তরে—অতএব কাল নির্ধারণের কাজটুকু পাঠকের কাছে অনেক সময়ই দুরূহ হয়ে ওঠে।

ফলে আমি নিউ ইয়র্ক গিয়ে ফিরে আসার পর লেখাটি বেরল। এবং অজস্র বিস্ময়-প্রকাশকারী এসএমএস আমার মোবাইল যন্ত্রটিকে ছেয়ে ফেলল।

আমার আজকের 'ফার্স্ট পার্সন'-এর একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। এটি একজন সাংবাদিকের একটি লেখা পড়ে আমার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া। তবে মূল রচনাটি যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ এবং বর্তমান বাঙালি সম্পর্কে একটি নির্বোধ প্রতিবেদন, তাই আমি এটা নিয়ে কথা না-বলে পারছি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখিকার নাম সাগরিকা ঘোষ। CNN-/BN চ্যানেলের কারণেই তাঁর মূল পরিচিতি বা খ্যাতি। বুধবার, অর্থাৎ ১জুন, 'হিন্দুস্থান টাইম্‌স'-এ তাঁর একটা লেখা পড়ে বেশ অস্বস্তি হল।

রচনাটির সাহিত্যমূল্য কতখানি, বা সেটি যথাযথ ভাবে বিশ্লেষণী কি না, সেই তর্কে যাচ্ছি না। লেখাটি ইংরেজিতে এবং রবীন্দ্রনাথের 'মন মোর মেঘের সঙ্গী'-র উদ্ধৃতি ছাড়া আর কোনও বাংলা শব্দ আমার অন্তত চোখে পড়ল না। মনে হল, লেখিকা অত্যন্ত গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে জানেন, ভারতবর্ষের যে কোনও আঞ্চলিকতাকে ভৎর্সনা করতে গেলে ইংরেজি ভাষাই অমোঘ চাবুক, এবং নির্দ্বিধায় তিনি সেই পথটিই বেছে নিয়েছেন।

যে-আলোচনা সততা এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে করতে গেলে প্রায় একটা গোটা বই হতে পারে, সেই বিষয়টাই হঠাৎ করে একজন টেলিভিশন সাংবাদিক কেন বেছে নিলেন এক দৈনিক পত্রিকার সংক্ষিপ্ত পরিসরে—তা আমি জানি না। অনুমান করতে পারি, কোনও বৃহৎ বিষয়ের সংকীর্ণ আলোচনার জন্য সংবাদপত্রের ওই সীমিত পরিসরটুকুই যথেষ্ট ছিল—কারণ সুচিন্তিত নিবন্ধ আর খামখেয়ালের ওপর-চালাকি, একই মাত্রায় এবং এক কলেবরে প্রকাশিত হতে পারে না।

নিবন্ধটির মূল বিষয় 'বাঙালির অবক্ষয়'। ইতিউতি অন্যান্য প্রদেশের তুলনামূলক উন্নয়ন পরিসংখ্যান উল্লেখ করে, এবং কয়েকজন প্রাতঃস্মরণীয় বাঙালির নামোল্লেখ করে আজকের পশ্চিমবঙ্গ এবং বাঙালিকে হ্যাটা করে একটা লেখা যে 'আসলে তোমরা কিস্যুটি পারো না—এবার গিয়ে অন্যান্য জায়গায় ঝি-গিরি করো গে।' বস্তুত এই লাইনটির আক্ষরিক ইংরেজি অনুবাদটিই আমি ওই প্রতিবেদন থেকে উদ্ধৃত করছি।

'The state is now so poor, that soon Bengal will be the main supplier of domestic servents to the rest of India...'

বঙ্গবাসী শিক্ষিত 'ভদ্রলোক-রা' এই উক্তিকে অপমানজনক মনে করতে পারেন। আমার কাছে এই সরলীকৃত সংজ্ঞার এক উন্নাসিক elitist ব্যাখ্যা এসে পৌঁছয়। যেন বাড়ির কাজের লোকদের সমাজে কোনও গৌরবের ভূমিকাই নেই! মনে রাখতে হবে, বাঙালিরা 'ঝি-চাকর' কথাটিকে একটা আন্তরিক অসমর্থনে যুক্ত করে নিয়ে 'কাজের মাসি' বলে নতুন একটা শব্দও তৈরি করে নিয়েছে। ইংরেজিতে পলিটিকালি কারেক্ট 'domestic help'-এর থেকে যা অনেকাংশে উষ্ণ ও মধুর।

প্রতিবেদনে পশ্চিমবঙ্গের 'দারিদ্র'-এর কথা এখানেই শেষ নয়। কেন বহু বুদ্ধিমান, মেধাবী মানুষ বাংলা ছেড়ে অন্যত্র যাচ্ছেন জীবিকা ও প্রতিষ্ঠার সন্ধানে—সেটাও দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখিয়েছেন লেখিকা। অকাট্য যুক্তি। কিন্তু কেবল যাঁরা বাংলা ছেড়ে চলে গেলেন তাঁরাই বাংলার একমাত্র মূলধন, আর এই বাংলায় বসে যাঁদের জীবনচর্চা আজও ঋদ্ধ করে চলেছে বাংলাকে তথা ভারতকে, তথা সমগ্র বিশ্বকে—সেটার কোনও উল্লেখমাত্র নেই। যেন, সম্পূর্ণ আকাশকুসুম এই বাস্তব।

বাংলা কেন আরেকজন রবীন্দ্রনাথ দিতে পারল না—এইটা লেখিকার অভিযোগ। কোন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথের কথা বলছেন তিনি? কবি, দার্শনিক, সমাজচিন্তাবিদ না আন্তর্জাতিক আলোকস্তম্ভ? লেখিকার উদ্ধৃতি থেকে মনে হল হয় ইংরেজিতে অনূদিত রবীন্দ্রকাব্য বা রেকর্ড, সিডি-তে রবীন্দ্র-প্রতিকৃতির বাইরে রবীন্দ্রনাথকে তিনি বড় একটা চেনেন না, ফলে তাঁর প্রতিবেদনে জীবনানন্দের কোনও উল্লেখ নেই। উল্লেখ নেই বাংলা কবিতার স্বতঃউর্বর ভূমির—যেখানে প্রতিনিয়ত সোনার ফসল ফলান শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং জয় গোস্বামী।

রামমোহন রায়ের পর আর কোনও রেনেসাঁ-মানব কেন জন্মাল না বাংলায়? এই আবদারের আদিখ্যেতা বুঝতে পারলাম না। রামমোহন তাঁর সময়ের অগ্রণী মহামানব নিঃসন্দেহে। কিন্তু সাগরিকার কি এমনতর প্রত্যাশা ছিল যে, রাজস্থানের রূপ কানোয়ারের সহমরণের সময়ও স্বয়ং রামমোহনই আবির্ভূত হবেন মূর্তিমান প্রতিবাদের রূপে?

বাংলা যে দৃষ্টান্তের জন্ম দিয়েছে, তার পুনরাবৃত্তির দায় কি কেবল বাংলার? ভারতবর্ষের অন্য কোনও রাজ্য কেন রবীন্দ্রনাথ বা রামমোহনের জন্ম দিল না, এই প্রশ্নও তো ন্যায়সংগত ভাবেই উঠে আসে, তা হলে?

কয়েকজন মাত্র প্রাতঃস্মরণীয় বাঙালির নাম লেখিকা জানেন, তাঁর মূল্যায়নের মাপকাঠিতে বাদ পড়ে যান অনেক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। একটা নাম সহজেই মনে আসছে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সাগরিকা ঘোষের আক্ষেপ-তালিকার প্রতিপক্ষের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

এবং তাঁকে নিয়েই এই 'রোববার'।

পু : সাগরিকা ঘোষের মূল রচনাটি পড়তে গেলে এই সূত্রটি ব্যবহার করুণ http://m.ibnlive.com/blogs/sagarikaghose/223/63610/sagarika-ghoses-blog-after-tagore-who.html.

২৪ জুন, ২০১২

মধ্যে সাতদিনের জন্য বিদেশ গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, এর মধ্যে অন্তত সব চুকেবুকে যাবে। ফিরে এসে দেখলাম—মোটেই না। পুরোটাই আমার কল্পনা। কোনও নিষ্পত্তি হয়নি। সমস্তটা এখনও সেই কলঙ্ক-পঙ্কেই নিমজ্জিত।

আমি পিঙ্কি প্রামাণিকের কথা বলছি।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের খবর নিয়ে এখন প্রতিনিয়ত আন্দোলিত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ—কোনও এক বঙ্গসন্তান এবার রাষ্ট্রপ্রধান হবেন কি না, পাশাপাশি আরেক সফল বঙ্গসন্তানের কুৎসা-চর্চা চলছে রাতদিন-ভর। সমস্ত মিডিয়া জুড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিঙ্কির ক্ষেত্রে, অভিযোগটা ছিল ধর্ষণের বা যৌননিগ্রহের। ন্যায়দণ্ড ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমান, নারী-পুরুষ কাউকে ভিন্ন চোখে দেখে না বলেই জানি।

সেক্ষেত্রে, এ-যাবৎকাল যত ধর্ষণকারী বা যৌন-নিপীড়নকারীর যা শাস্তি হতে পারত, সাক্ষ্যপ্রমাণ সাপেক্ষে সেভাবেই বিচার হওয়ার কথা ছিল পিঙ্কি প্রামাণিকের—অন্তত ন্যায়বিচার তো তাই বলে।

কিন্তু এখানে এসে বাধা হয়ে দাঁড়াল পিঙ্কির লিঙ্গ-পরিচয়। তিনি পুরুষ না নারী—তার নির্ণয়ই যেন এই বিচারের প্রধান বিবেচ্য।

নারী হয়ে অন্য নারীকে যৌনপীড়ন করার অপরাধ যেন অলীক এবং অবান্তর। পীড়নকারীকে যেন ভিন্ন লিঙ্গের হতেই হবে। অতএব সেটার প্রকাশ্য-নিষ্পত্তি দেখার জন্য গোল-গোল চোখ করে তাকিয়ে রইল সারা পশ্চিমবঙ্গ। এবং এই বিষয়ে একেকটি বোমা ফাটাতে থাকল মিডিয়া, যার তলায় ক্রমশ তলিয়ে যেতে লাগল ন্যায়-অন্যায়ের বিচার। এবং কদর্যভাবে জাগ্রত হয়ে রইল পিঙ্কি প্রমাণিকের লিঙ্গ-পরিচয়ের কৌতূহল।

অন্যায় যদি প্রমাণিত হয়, তা হলে পিঙ্কির অপরাধ যতটা নিন্দনীয়, নিজের যৌন-পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকাটা ততটাই গৌরবের।

পিঙ্কি সেই গৌরব ধারণ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কারণ জীবনের নানা ওঠাপড়া ও সাফল্যের আলো-ছায়ার মধ্যে তিনি বিচরণ করেছেন দীর্ঘদিন। তাঁর কোনও 'অপরাধ' নিন্দাজনক বলে ওঁর একান্ত ব্যক্তিগত পরিচয়ও সর্বজনসমক্ষে প্রকাশিত হতে হবে—এমন কোনও বাধ্যবাধকতার কথা তো আমরা শুনিনি!

তবে কেন প্রতিদিন পিঙ্কির শরীরের ডাক্তারি পরীক্ষার অনুপুঙ্খ নিয়ে ব্যস্ত হবে মিডিয়া আর এই তথ্য-নির্ণয়ে নিযুক্ত চিকিৎসা বিভাগই বা কেন এত ন্যক্কারজনক ভাবে উদার হবে মিডিয়ার সামনে?

কোনও মানুষই কোনও অপরাধের ঊর্ধ্বে নন। তবে সেই কারণে তাঁকে অন্যভাবে নগ্ন করাও সমান অপরাধ।

Subjudice কেস-এর এই নির্মম প্রকাশ আদালত কীভাবে দেখছেন জানার ইচ্ছা রইল।

ছিঃ!

৮ জুলাই, ২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোটবেলায় একটা গল্প শুনেছিলাম। গল্প না বলে রামায়ণী উপকথা বলাই ভাল। দস্যু রত্নাকরের বাল্মীকি হওয়ার এক গল্প। তখনও আমার রবি ঠাকুরের 'বাল্মীকি-প্রতিভার'-র সঙ্গে পরিচয় হয়নি। আর রামায়ণ বলতে উপেন্দ্রকিশোর ।

জানি না, গল্পটি আজকের প্রজন্মের মধ্যেও বেঁচে আছে কিনা? সে-গল্প কালীভক্ত দস্যু সর্দারের মৈথুনাবদ্ধ ক্রোঞ্চদম্পতির একজনের হত্যা দেখে আচম্বিত মুখনিঃসৃত পুণ্য সংস্কৃত শ্লোকের নয়। বা সেই শব্দ কল্যাণে দস্যুর ঋষিজন্ম লাভেরও নয়।

গল্পটা অনেকটা বোধহয় এরকম। পথিমধ্যে কোনও এক জ্ঞানীকে আক্রমণ করেছিল রত্নাকর। সর্বস্ব অপহরণ করে যখন তাঁর প্রাণ নেওয়ার উদ্যোগ করল, তখন ওই জ্ঞানী পথিক তাঁকে বলেছিলেন,

—"আমাকে এখানে গাছের গায়ে বেঁধে রেখে একবার নিজের বাড়ি যাও। গিয়ে জিগ্যেস করো তোমার পিতা, মাতা, স্ত্রীকে—তারা তোমার এই পাপের ভাগ নিতে রাজি আছেন কিনা। যদি একজনও 'হ্যাঁ' বলেন, তুমি ফিরে এসে আমাকে হত্যা কোরো। আমি অপেক্ষা করব।"

তাই করেছিল রত্নাকর। বাড়ি ফিরে এসে পিতা, মাতা, স্ত্রীকে জিগ্যেস করেছিল জনে জনে। কেউ রাজি হয়নি তার পাপের ভাগ বহন করতে। মজার কথা, কেউ বাধাও দেয়নি দস্যুবৃত্তি করে সংসার প্রতিপালন করতে!

ছোটবেলার শোনা সেই গল্পের কথা আজ যখন মনে পড়ে, তখন ভাবি 'পাপ' বলতে কী বুঝেছিল রত্নাকরের পরিবার? কর্মফল না সামাজিক লজ্জা?

আসলে ভারতীয় চিন্তাধারায় সমাজ সংস্কারের প্রতি বিনম্র দায়বদ্ধতা নিয়ে আমরা যখন বড় হই, আমাদের কাছে সমাজের একটাই প্রত্যাশা থাকে—সেটা বোধহয় সামাজিক সম্মানরক্ষার। দরিদ্র বা মধ্যবিত্তের তো অর্থের অহংকার থাকতে পারে না। অতএব আঁকড়ে ধরার মতো একটি বস্তুই তার অমোঘ অবলম্বন—সম্মান। সেই সম্মান হারালে যে গভীর গ্লানি, সেটাকেই ভয় পায় বুঝি সাধারণ মানুষ!

এই লজ্জা নিতান্তই পারিপার্শ্বিকের কাছে। সমাজ-নির্ধারিত নিয়মের সামনে প্রাত্যহিক নতিস্বীকার।

এর সঙ্গে 'শ্যামা'-র বজ্রসেনের ক্ষমাহীনতার দ্বন্দ্বের চরম আত্মগ্লানির মহৎ অনুশোচনার কোনও তুলনা হয় না। এটা কেবলই সামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি অস্তিত্বের নিজস্ব নিভৃত অপারগতার গ্লানি।

সমাজ বা সভ্যতা হয়তো ক্রমশই সার্থক মানব হওয়ার শর্তগুলো কঠিন করে তোলে আমাদের জন্য। ফলে সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ার লড়াইটাও চলে এগিয়ে।

ভারতবর্ষের অগ্রণী দু'টি মহাকাব্য যখন পড়ি, প্রায় যেন মনে হয় সমগ্র মানবজীবনযাত্রাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে লজ্জার এক অদৃশ্য কুয়াশা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিবার কারও-না-কারও মুখে 'ধিক্' শব্দটি উচ্চারিত হয়। আর সেই আচ্ছাদনে আঘাত করে কোনও এক গ্লানিময় দীর্ঘশ্বাস, আর অমনি সেই কুয়াশাক্ষরণে লজ্জাসিক্ত হন কোনও-না-কোনও চরিত্র।

যিশুখ্রিস্টের কথাতেও যদি আসি, ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় তাঁর অন্তিম বাক্যটি নিয়ে যে পুরাণ নির্মাণ, তার মধ্যেও চরম ক্ষমার আড়ালে লুকিয়ে আছে এক সুতীব্র লজ্জাধিক্কার। 'প্রভু, এদের ক্ষমা কোরো। এরা জানে না, এরা কী করছে।'

কখনও অবশ্য মনে হয় এ কেবলই যেন কোনও অসহায় ঈশ্বরের করুণার আর্তি। নিজের মহিমার অব্যক্ত প্রকাশ।

এক জননেতা হিসেবে যদি আমরা যিশুকে দেখতে চাইতাম, তা হলে জীবিত অবস্থায় ক্রুশবিদ্ধ করার নির্মম বর্বরোচিত প্রথাটিরই তীব্র ধিক্কারই শুনতাম হয়তো। কারণ সেই মর্মান্তিক অবস্থায় যিশু একা ছিলেন না সেই শুক্রবার। তাঁর দু'পাশে আরও দু'জন ছিল—যারা নিতান্তই সামান্য দুই তস্কর।

অতএব যিশুর সেই অন্তিম ধিক্কার কোনও নিন্দিত সামাজিক প্রথার সমালোচনায় নয়, কেবল ঈশ্বরিত এক মহামানবের অসহায় বিলাপ।

যখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধশেষে ধৃতরাষ্ট্র-মহিষী সক্ষোভে, নিদারুণ অভিমানে শ্রীকৃষ্ণকে সেই ভয়ংকর অভিশাপ দেন, যদ্দারা যদুবংশ ধ্বংশের সংকেত শুনতে পাই, মহাকাব্যের চিন্তানায়ক কেশব কেবল সলজ্জ নতমস্তকে সেই অভিশাপ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন—যেন এমনটাই হওয়ার ছিল।

তা হলে মহাকাব্য কি এ কথাই বলতে চায় যে, যে কোনও মহাপ্রলয় বা চরম ধ্বংসের পূর্বে নেমে আসুক এক প্রবল লজ্জা, অবিরত বৃষ্টির মতো সিক্ত করুক সকলকে। এবং সেইখান থেকেই কি এক মহান সমাপ্তির যাত্রা শুরু?

১৫ জুলাই, ২০১২

আবার 'লজ্জা'।

গত সংখ্যার পর আবার আরও গাঢ়, ঘন, লজ্জা ফিরে এল এক অদ্ভুত আকৃতি নিয়ে।

আমাদের এতদিনের চেনা-জানা সম্পর্কগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে সমস্ত বিশ্বাসের ভিত নাড়িয়ে, সমগ্র শৈশবকে নিষ্পেষিত করে—পর্যায়ক্রমে বিচ্ছিন্নভাবে আমাদের ওপর রোজ-রোজ নেমে আসছে গভীরতর লজ্জা। যাকে আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে দূরে সরিয়ে রাখা যাচ্ছে না। সে যেন তার সমস্ত অপবিত্রতাকে নিয়ে আমাদের জীবনের অংশীদার হতে চাইছে ক্লিন্ন অশ্লীলতায়।

পিঙ্কি প্রামাণিকের যৌন-পরিচয় নিয়ে মিডিয়ার মুখোরোচক খবর তৈরি করা ঘোরতর নিন্দনীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলেও, তার জন্য সেই সংবাদের ধারাবাহিক পরিবেশক এবং পাঠক-দর্শকের এক অজ্ঞাত নির্বোধ কৌতূহল কাজ করছিল।

যে-সমাজ আজীবন মানুষমাত্রকেই 'পুরুষ' বা 'নারী'-র বাইরে ভাবতেই পারে না, তাদের কাছে এই সহসা-উন্মোচিত অর্ধনারীশ্বরের সঙ্গে সহজ স্বীকৃত বন্ধুত্ব কাম্য ছিলও না—তা হয়ওনি। তার জন্য প্রধানত দোষ দেওয়া যায় আমাদের মূলধারার শিক্ষা থেকে যৌন-শিক্ষার নির্বাসনকে।

হিগ্‌স-বোসন ঈশ্বরকণা-র থেকেও যেন অভিনব পিঙ্কি-র এই যৌন-পরিচয়ের রহস্য।

প্রথমটা অর্থে God particle, কঠিন বিজ্ঞান এবং তার সঙ্গে আমাদের নিত্যকার ধ্যানধারণার কোনও সরাসরি সংঘাত নেই বলে সেটা চাঁদে মানুষের প্রথম পদার্পণের মতো এক সুদূরের সত্য হয়ে রয়ে গেল।

কিন্তু পিঙ্কি প্রামাণিক, বাংলার 'সোনার মেয়ে', হঠাৎ পুরুষ-নারীর মাঝামাঝি এক অদ্ভুত রহস্যময়তায় প্রকাশিত হয়ে কেবল সস্তা speculation-এর শিকার হয়ে রইলেন দিনের-পর-দিন।

কেউ পিঙ্কির যৌন-পরিচয়কে বৈজ্ঞানিক সত্য বলে মানতে পারলেন না। ফলে এই 'আজব জীব'-টির জন্য কোনও নিঃশর্ত সহানুভূতি তৈরি হল না। এই লজ্জা আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার, আমাদের বড় হওয়ার এবং মূলস্রোতকেই 'একমাত্র' বলে চেনার।

ধরে নিতে পারি, এটা মূলস্রোতের চিরকালীন সমস্যা। এই 'অভূতপূর্ব'-কে 'সাধারণ বর্তমান' করে নিতে আমাদের আরও সময় লাগবে। আরও ধৈর্য লাগবে, লাগবে আরও অনেক অচেনার আনন্দ। সামাজিক নিদান দেওয়ার আমি হয়তো কেউ নই। এটা আমার অনুমান—আপনাদের সঙ্গে share করতে ইচ্ছে হল।

দুই

যে-প্রসঙ্গে কথা বলার জন্য এই ভূমিকা, সেখানে সরাসরি পৌঁছে যাওয়াই ভাল।

শিক্ষাজগতের academic details নিয়ে কথা বলার যোগ্যতা আমার নেই, অতএব বলবও না। কিন্তু শিক্ষাপ্রাঙ্গণের মধ্যে শিক্ষকের ব্যবহারে যে অচেনা নিষ্ঠুরতার খবর পাচ্ছি ইদানীং, সেগুলো সত্যিই নিষ্করুণ ভাবে নিন্দনীয়।

বিশ্বভারতী-র পাঠভবনের ছাত্রীর মূত্রপান ও হেনস্তা বা গাইঘাটার বিনোদবিহারী বিদ্যালয়ের ছাত্রীকে ক্লাসরুমে জোর করে পোশাক খোলানো—এগুলো আমাদের কাছে অভিনব ভাবে shocking।

মনে আছে, বেশ কয়েক বছর আগে শুভঙ্কর চক্রবর্তী যখন ছাত্রী / শিক্ষিকাদের শাড়ি পরে কলেজে আসা নিয়ে ফতোয়া দিয়েছিলেন, তখন আমরা সকলেই তাঁর সমালোচনা করেছি। কিন্তু তাঁর অভিপ্রায়ের একটা চেনা-সূত্র পাওয়া গিয়েছিল—তাঁর রক্ষণশীলতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা, বেশ কয়েকদিন আগে এক শিক্ষকের চপেটাঘাতে আহত এক ছাত্রর কথা যদি মনে করি, সেখানেও শিক্ষকের ক্রোধের একটা অতিরতি অভিব্যক্তি আমরা দেখতে পাই। কিন্তু ছাত্রকে শাস্তিমূলক কারণে প্রহার করার আচরণবিধির সঙ্গে আমরা সনাতন ভাবে পরিচিত। বিদেশি / সহবতের অনুকরণে এখন হয়তো শিশু/ কিশোরদের গায়ে হাত তোলাটা সামাজিক অপরাধ বলে পরিগণিত হচ্ছে, পিতামাতারাও আজকাল সন্তানকে ভিন্নভাবে শাসন করেন। সেটাও আমরা সুশীল ব্যবহার বলে মেনে নিয়েছি।

কিন্তু প্রত্যেক সমাজের নিজস্ব আচরণবিধি যেহেতু কোনও কোনও এক বিশেষ জীবনযাত্রার প্রেক্ষাপট-নির্মিত, শিক্ষকের শাসন সেখানে সম্পূর্ণভাবে অবান্তর হতে সময় লাগতে পারে, এও বুঝি। তবে, ইদানীং ছাত্রপীড়নের যে অভিনব পন্থাগুলো দেখতে পাচ্ছি, তার সত্যিই কোনও পূর্বপরিচিত আদল নেই। ভারতবর্ষে কিংবা বিদেশে কোথাও নয়।

কোথা থেকে তা হলে উঠে আসছে এই অপার্থিব আচরণের কুশ্রীতা? কোন আচরণবৃত্তি নানাভাবে প্ররোচিত করছে শিক্ষকদের অপরাধীর আচরণকে আত্মস্থ করে নিতে?

'প্রশাসন কেন নীরব'—এমনটাও শুনছি। অভিযোগটি মোটেই অনস্বীকার্য নয়। কিন্তু একটা কথা তো সত্যি, ঘটনা ঘটাচ্ছেন তো একজন ব্যক্তি। তাঁর এই বিকৃত আচরণের দায় তো ঘটনার মুহূর্তে অন্য কেউ নিতে পারে না। পরবর্তী কালে তাঁর শাস্তি লঘু, গুরু, কিংবা যথার্থ হল কি না, সেটা নয় আইন বলে দেবে।

কিন্তু আমাদের দেশের আইনজীবীরাও কি জানেন যে শিক্ষাপ্রাঙ্গণের এই অদৃষ্টপূর্ব ব্যবহারকে কোন আইনবিধি দিয়ে বিচার করবেন?

অপরাধ চেনা বা অচেনা, আইনের কাছে সমান শাস্তিযোগ্য। কিন্তু একে তো প্রচুর চেনা অপরাধের দৃষ্টান্ত চারপাশে ছড়িয়ে থাকছে প্রভূত পরিমাণে। প্রতিদিন।

তার ওপর নতুন-নতুন অপরাধ দেখলে সত্যিই ভয় করে।

তা হলে, সত্যিই কি আমার এক বিপ্রতীপ বিবর্তনের দিকে রওনা দিলাম?

২২ জুলাই, ২০১২

'পতাকা' শব্দটা এমনি উচ্চারণ করলে কেমন যেন বিচিত্রবর্ণ বস্ত্রখণ্ডের কথা মনে হয়—যারা বাতাস-সাঁতরানো নৌকোর পালের মতোই সদাচঞ্চল।

যেন আমাদের অন্তরের ধরে রাখতে না-পারা আনন্দগুলোকে আমরা মেলে ধরেছি আকাশের গায়ে।

মানুষের মন কোনও একটা অনুভূতিতে নির্ভেজাল ভাবে নিবিষ্ট থাকতে পারে না বহুক্ষণ, তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পতাকা যেন আমাদের ভিতরকার সদাজাগ্রত আনন্দের উড়ন্ত রূপক।

আবার যেইমাত্র 'পতাকা' শব্দটির সামনে 'জাতীয়' কথাটি পড়ল, অমনি তার উদ্বেল সঞ্চরণ আমাদের মনে থিতু হয় এক সংস্কারাচ্ছন্ন গাম্ভীর্যে।

সেই বস্ত্রখণ্ড, সমানই ঝলমলে—কিন্তু জাতির বা দেশের প্রতিনিধি হয়ে গিয়ে সে যেন এক অনাবশ্যক গুরুভার বহন করে ফেলেছে।

আবার আমরাই অন্য দেশের জাতীয় পতাকা দেখে কেবলই তার নান্দনিক বিচার করি। সেখানে দেশভক্ত হওয়ার দায় নেই যে বড়! সেখানে কেবল যেন রং-রেখার বিন্যাস, হয়তো সময়ে সময়ে তার নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। বা সেই দেশের জাতীয় দর্শনের ইতিহাসের চিত্ররূপ হিসেবে আমরা দেখতে চেষ্টা করি এবং সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যাই যে এ এক বিশাল বিশ্বনিরীক্ষার চিত্রপ্রদর্শনী।

আর তখনই মনে হয়, কেবল নিজের দেশের পতাকাকে এক সদাগম্ভীর ত্রিবর্ণ হিসেবে প্রণাম না-করে সারা বিশ্বের, সব দেশের জাতীয় পতাকাগুলোর সম্মেলনে কেন বিশ্বনাগরিক হিসেবে আমরা এক 'সব পেয়েছির আসর'-এর আনন্দ পাব না মনে-মনে?

১২ আগস্ট, ২০১২

AMARBOI.COM

সকাল : এক

সেদিনও ছিল এমনই এক সকাল সকালের কাগজ বয়ে এনেছিল এক 'নিষ্কলঙ্ক' (?) হত্যা সংবাদ।

ফ্রন্ট পেজ জুড়ে বিশাল একটি ছবি। একজোড়া পায়ের পাতা। আর তার সঙ্গে বিশাল হরফে এক হেডলাইন।

ফোন গেল 'হয়ে গেছে, স্যর।'

ধনঞ্জয়ের ফাঁসি নিয়ে উত্তাল ছিল কলকাতা ফাঁসিই যাতে একমাত্র শাস্তি হয় এই ধর্ষণকারীর তাই নিয়ে পথে নেমেছিলেন কলকাতার বেশ কয় বিশিষ্ট নাগরিক।

কেমন করে ফাঁসি হবে, তার পদ্ধতি কী, ফাঁসির আগেকার নানাবিধ টেকনিক্যাল প্রস্তুতি, ফাঁসুড়ে নাটা মল্লিকের সাক্ষাৎকার, ততদিনে ছেয়ে ফেলেছে মিডিয়া।'

যদি টিকিট কেটে ফাঁসি দেখাবার কোনও ব্যবস্থা করা যেত, তা হলে হয়তো প্রমাণ হয়ে যেত যে, কোনও ভারত পাকিস্তানের ওয়ান ডে ম্যাচের থেকেও 'দর্শকানুকূল্য অনেক বেশি পেত এই পরিকল্পিত মানব হত্যা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর টিভিতে দ্যাখানো হলে, কেবল সেই অনুষ্ঠানের টিআরপি-তেই সারা সপ্তাহের জন্য বিজয়োল্লাস করতেন চ্যানেল কর্তৃপক্ষরা।

ধনঞ্জয়ের এই ফাঁসির উদ্দেশ্য ছিল ধর্ষণ নামক অপরাধে এক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। যাতে ভবিষ্যতে কোনও সম্ভাব্য ধর্ষক কাণ্ডজ্ঞান রহিত হবার পূর্বমুহূর্ত অবধি মনে রেখে দেন সেই নিশ্চল জোড়া পায়ের বিজ্ঞাপন চিত্রটি।

আচ্ছা সেই দৃষ্টান্ত কি কোনওভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে ধনঞ্জয় নিধনের এই এত বছর পরেও?

সকাল : দুই

এবার আরও এগিয়ে আসি ক্যালেন্ডার ধরে। শীত তখনও প্রবেশ করেনি বাংলার বুকে। ভোরবেলাগুলো কেবল ধোঁয়াটে কুয়াশায় আচ্ছন্ন।

এক হিমশীতল বার্তা বয়ে আনল খবরের কাগজ। আজমল কাসভের ফাঁসি হয়ে গিয়েছে মহারাষ্ট্র।

নিশ্চুপে, যথাসম্ভব গোপনীয়তা বজায় রেখে।

ভারতবাসী এই ফাঁসির আয়োজন দেখতে পেল না বলে। বা তার বিশদতম বিবরণ জানতে পারল না বলে কিছুটা মনক্ষুণ্ন হল নিশ্চয়ই। কিন্তু পাশাপাশি এক কল্পিত ঔচিত্যবোধের গরিমায়, গা সেঁকে নিল সমস্ত ভারতবর্ষ—যেন কাসভের ফাঁসির এই দৃষ্টান্ত দিয়ে সমস্ত ভারতবাসীর নিরাপত্তা সক্রান্ত সমস্ত উদ্বেগের অবসান করলেন ভারত সরকার। —ভারতের জাতশত্রু পাকিস্তানকে তবে খুব একটা টাইট দেওয়া গিয়েছে।

২৬ নভেম্বর মুম্বই নাশকতার বীভৎস ধ্বংশলীলার যে ব্যাপ্তি, একজন আতঙ্কবাদীর প্রাণদণ্ড নিশ্চয়ই তার তুল্যমূল্য নয়।

ধৃত আজমল কাসভের প্রাণনাশ করতে ফিরে আলে নিষ্ঠুর নাশকতায় শহিদ কোনও প্রাণ, কেবল আরেকটি প্রাণ নিভে যায় পৃথিবীর বুক থেকে।

আমরা সবাই জানি আজমল কাসভ সিনেমার গব্বর সিং নন, বা কোনও উন্মত্ত রক্তপিপাসু ভারসাম্যহীন বিকৃতমস্তিষ্কও নন। তিনি বিরাট একটি ব্লু প্রিন্টের কেবল একটি ঘুঁটি মাত্র।

সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি ধরা পড়েছিলেন বলে। ভারত সরকার সমস্ত অধিকার বলে তাঁর জন্য কঠিনতম প্রাণঘাতী শাস্তি রচনা করতে পারলেন।

কিন্তু, তাতে করে যদি আমরা মনে করি যে ভবিষ্যতের যে কোনও আতঙ্কবাদীই কাসভের দুর্ভাগ্যের দৃষ্টান্তে কোনও হিংসা ছড়িয়ে দেবে না—ভারতের বুক জুড়ে, সেটা কি নিতান্তই আকাশকুসুম নয়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকাল : তিন

গত ২৯ ডিসেম্বরের সকাল আমাদের কাছে আনল একটি গভীর দুঃসংবাদ—দিল্লির গণধর্ষণের নিগৃহীতা ১৩ দিনের জীবন মরণ লড়াই শেষে প্রণত্যাগ করলেন।

তারপর টুইটার, ফেসবুক, টেলিভিশন, খবরের কাগজে নানারকম মতামত উঠে আসতে লাগল সমাজের নানা স্তর থেকে।

প্রায় সবাই দাবি করছেন ছ'জন দুষ্কৃতীর প্রাণদণ্ড।

আমি সমাজতত্ত্বের ছাত্র নই। যে কোনও সামাজিক বিশ্লেষনের পথে কতকটা এগিয়েই বড় অসহায় লাগে আমার। উচিত আর অনুচিতের পার্থক্যটা মরীচিকার মতো মায়াময় মনে হয়।

তবে, যেহেতু আমি একজন গর্বিত ভারতবাসী, এবং এই দেশে বড় হয়ে ওঠার সুযোগটাকে এখনও পরম সৌভাগ্যের মনে করি—তাই আর পাঁচজনের মতো চারপাশের সত্যগুলিকে বুঝে ওঠার চেষ্টায় হাল ছাড়িনি এখনও।

দিল্লির এই গণধর্ষণ নিয়ে যে বিপুল জনপ্রতিবাদ উঠে এল। তার ক্ষমতা অপরিসীম। তার সদিচ্ছার পবিত্রতাকে অসম্মান করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই আমার। তবু যেন উনপঞ্চাশের চোখজোড়া আরও কিছু যেন খুঁজে বেড়ায়।

প্রথম প্রশ্ন যেটা মনে জাগছে বারবার করে—যে ধর্ষণ কি কোনও শাস্তিযোগ্য অপরাধ? যদি 'অপরাধ' বলে এটাকে মেনেও নিই, তা হলে একথাটাও কি একবার ভাবব না, যে এই সুবিশাল অপরাধের বিচার করার মতো ব্যাপ্তি বা শক্তি আমাদের আদালতের দণ্ডবিধি বা কোনও আইন বই-এ আছে কি না? কারণ, প্রতিটি ধর্ষকের মধ্যে একই সঙ্গে উদ্‌সারণ হয় যে কামনা ও বলপ্রয়োগেচ্ছার—মানবতার এই চরম অবমাননার কি সত্যিই কোনও আনুষ্ঠানিক বিচার সম্ভব?

দিল্লির গণধর্ষণের নজিরটি যেন জনসাধারণের সমবেদনাযোগ্য একটি নিখুঁত template। একটি তেইশ বছরের ফুটফুটে মেয়ে তার প্রণয়ীর সঙ্গে রাজধানীর একটি বাসের মধ্যে অমানবিকভাবে অত্যাচারিতা হন। ফলে যে বার্তাটি আমাদের কাছে এসে পৌঁছোয় তার মধ্যে 'অনাঘ্রাতা' পুষ্পের নিষ্ঠুর নিধন আছে, একটি প্রস্ফুটিত প্রেমের ভয়াবহ বিনাশ আছে, এবং সর্বোপরি যেটা আছে, সেটা এক সুসংবদ্ধ মানবিকতার নিরাপত্তার বিপন্নতা।

এই ঘটনাটাই যদি ঘটল রাজধানীর সীমানার বাইরে, তেইশ বছরের বদলে ছেচল্লিশ বছরের মধ্যবয়স্কা। যেমন ঘটে চলেছে আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে—দিনের পর দিন রাতের পর রাত। তখন কেন একটা প্রতিবাদও করি না আমরা? তখন কি ধর্ষিতাকে এতটাই অচেনা লাগে যে তাঁর দুর্দশা কোনও ভাবেই স্পর্শ করতে পারে না আমাদের নাগরিক চেতনাকে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্প্রতি দেখছি প্রতিবাদে মুখর হচ্ছেন এক যুবসমাজ যাঁরা যেন সংকট-সন্ধানী। তাঁরা এককথায় বিশ্বাস করেন, রাজনীতি খারাপ ও অনৈতিক, নিরপেক্ষতা—উদার ও সহানুভূতিশীল। তাঁরা এককথায় সরকার নামক এক অদৃশ্য প্রতিষ্ঠানের দিকে কতগুলি ধিক্কার ছুড়ে দিয়ে এক পবিত্র বিবেকচর্চার আনুষ্ঠানিকতায় বিশ্বাস করেন—তাঁরা জানেন এতে কোনও ঝুঁকি নেই। কোনও বিপদ নেই। বরং আছে পলিটিক্যাল কারেক্টনেস-এক অদৃশ্য পিঠচাপড়ানি।

ধর্ষিতা নাগরিকা। এবং দুষ্কৃতীরা সমাজের নিম্নতলার মানুষ। তাঁদের কোনও বিশেষ যোগাযোগ বা সামাজিক প্রতিপত্তি নেই। তাঁরা এমনই এক শ্রেণি, যাঁদের রাজধানীতে বাস করতে গেলে অকিঞ্চিৎকর বা বহিরাগত হয়েই বেঁচে থাকতে হয়। এবং কারণে, অকারণে প্রমাণ-সাপেক্ষে বা অভাবে, যাঁদের গায়ে অপরাধীর তকমা এঁটে দেওয়া খুব সোজা। তাঁরা 'ভিন্ন', অতএব অভিন্ন ভারতবাসীর অভিশাপযোগ্য।

টেলিভিশনের পর্দায় প্রধানত রাজনীতিবিদদের বাগবিতণ্ডা, আর নইলে বলিউডের অনুভূতিমালা।

ফাঁকে ফাঁকে প্রতিবাদী যে জনতাকে দেখছি বারবার, তাঁরই মধ্যে একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করলাম। নানা চ্যানেল-এর ক্যামেরা ভিড় পরিদর্শন করতে করতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াচ্ছেন অবধারিত কোনও সুন্দরী যুবতীর ওপর।

অবচেতনের উদ্দেশ্যটা কী? নিগৃহীতার প্রতিলিপিতে দৃষ্টান্ত হিসেবে স্থাপন করা; না, কোনও আকর্ষণীয়াকে ক্যামেরা দিয়ে আদর করার ইচ্ছে?

পুরুষদের, যাঁদের দেখলাম, তারা বারবারই নিগৃহীতার আড়ালে 'মা', 'বোন' বা 'মেয়ের' কথা বলছেন। 'স্ত্রী'-র কথা কেউ বলছেন বলে তো কানে এল না।

কারণ তারা অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে জানেন যে ভারতবর্ষের অধিকাংশ পরিবারে কীভাবে নিয়মিত ঘটে দাম্পত্য ধর্ষণ। কারণ স্বামী-স্ত্রীর শয়নকক্ষে আদালতের প্রবেশাধিকার নেই—সেখানে দ্বাররক্ষী হয়ে অবস্থান করছেন 'বিবাহ' নামক এক দুর্মদ বিধান।

জানি না, যতক্ষণে এই লেখাটা পড়ছেন আপনারা, দুষ্কৃতীদের ফাঁসির হুকুম বা ফাঁসি—দু'টোই হয়ে গিয়েছে কিনা।

কিন্তু আমরা তো ভারতবর্ষের মানুষ। আমার তো দেখেছি কুরুসভায় অপমানিতা যাজ্ঞসেনী, দুঃশাসনের বুকের রক্তে বেণী বাঁধবেন বলে অপেক্ষা করেছিলেন তেরো বছর।

তারপর, সেই দ্রৌপদী, আর্যাবর্তের সম্রাজ্ঞী হস্তিনাপুর ত্যাগ করে কেন রওনা দিয়ে ছিলেন মহাপ্রস্থানের পথে?

প্রতিহিংসা আর রক্তক্ষয়ই যে জীবনের পরম প্রাপ্তি নয়, শাশ্বতের সামনে নতিস্বীকারই অন্তিম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংকল্পের সংকেতটুকু যাতে বাড়ির কর্তাদের কানে পৌঁছয়, তার জন্য তাঁরা বেছে নিতেন একটি নাটকীয় ঘোষণা। সশব্দে বন্ধ হত গোঁসাঘরের দরজা, বা শান বাঁধানো মেঝেতে ধাতব আওয়াজ করে পিছলে যেত ঠেলে দেওয়া আহার্যভরা কাঁসার থালা। তারপর, একসময় এটা ভারতীয় সভ্যতায় অন্তঃপুরিকাদের রাগ দেখানোর পদ্ধতি হয়ে দাঁড়াল।

৩

স্বদেশি আন্দোলনের সময় গান্ধীজি অন্তঃপুরের এই অভিমানী কৌশলটি চুরি করলেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণায়। অহিংস আন্দোলনের প্রতিভূ। যিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ক্ষাত্রবীর্যের প্রকাশকে সমানে সংযত করছেন—তাঁর নিজের প্রতিবাদ পন্থাটি যে বিশিষ্ট এবং স্বকীয় হবে এটা অনুমান করাই স্বাভাবিক।

অবলা অন্তঃপুরিকাদের নিরস্ত্র বিদ্রোহ ছিল এক সনাতন পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে, গান্ধীজি সেই পন্থাটি কাজে লাগালেন দেশব্যাপী এক ঔপনিবেশিক পুরুষ-শাসকতন্ত্রের উদ্দেশে।

তাঁর এই উদ্ভাবন অভাবনীয় ছিল নিঃসন্দেহে, ব্রিটিশ শাসকরা না খেয়ে মরে যাওয়ার সংকল্পে যতটা না বিচলিত হতেন, তার থেকে বেশি হতচকিত হতেন—এবং তড়িঘড়ি আলোচনায় বসতেন এক ক্ষুদ্র, শীর্ণ মানুষের উপবাসভঙ্গের জন্য। একটা ঘটনা মনে পড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ বারবার গান্ধীজিকে লিখছেন অনশনভঙ্গ করতে, নিস্তেজ শরীরে নেতৃত্ব দেওয়া যায় না বলে এবং নিজে পৌঁছে যাচ্ছেন আশ্রমে। গান্ধীজি অনশন ভাঙছেন, তাঁর হাতে কমলালেবুর রসটুকু নিজে তুলে দিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজির অনুরোধে কবি গেয়ে শোনাচ্ছেন মহাত্মার প্রিয় গান

—জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণাধারায় এসো।

এবারের প্রচ্ছদপ্রসঙ্গ এবং এত বড় একটা শিবের গীত ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই আপনাদের মনে এগিয়ে দিয়েছে এক সাম্প্রতিক প্রাসঙ্গিকতা অভিমুখে। রামলীলা ময়দানে আন্না হাজারের অনশন, এবং তা দিয়ে বিব্রত, চিন্তিত কেন্দ্রীয় সরকার। গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে প্রত্যেকের নিজের ভাষায় কথা বলার অধিকার আছে—আন্নাও অনশনকে তাঁর ভাষা করেছেন প্রতিবাদের উচ্চারণে—এই প্রতিবাদ দুর্নীতির বিরুদ্ধে, দেশের কলঙ্কমোচনের জন্য। এবং এই প্রসঙ্গে বারবার মহাত্মা গান্ধীর অনশন প্রসঙ্গের উল্লেখ এসেছে।

গান্ধীজির প্রতিবাদ ছিল ভিনদেশি শাসকের বিরুদ্ধে, যাঁরা উড়ে এসে জুড়ে বসে এক প্রলম্বিত প্রভুত্বের আসন কায়েম করে বসলেন—তাঁদের সঙ্গে এদেশের মানুষ কোনওভাবে সম্পৃক্ত নন।

কিন্তু আন্না হাজারের প্রতিবাদ দেশের গণতান্ত্রিক প্রথায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে—এবং তার জন্য তিনি তাঁর মহারাষ্ট্রের নিজের গ্রাম ছেড়ে এসে বেছে নিলেন দিল্লির রামলীলা ময়দান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরা যুবসমাজের এক বিশাল অংশ। যাঁরা অরাজনৈতিক থাকতে পছন্দ করেন,—তাঁরা হঠাৎ এই অনশনকে সমর্থন করে তাঁদের ভেতরকার নিরাপদ সমাজসচেতনতাকে একবার পালিশ করে নিলেন টুপি প্ল্যাকার্ড আর নানান ফেসবুক, টুইটারের মাধ্যমে। বলিউডও যোগ দিলেন—তাঁরা গণতান্ত্রিক দেশের স্বাধীনচেতা মানুষ, তাঁরা নিজমতানুসারে অনেক কিছুই করতে পারেন। একজন অভিনেতা আবার হুমকি দিলেন তিনি রামলীলা ময়দানে এসে বিবস্ত্র হবেন। এই কি ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রায়োপবেশনের গৌরব।

দিল্লির রামলীলা ময়দানে টিভি-ক্যামেরারা জটলা করল। দিন কয়েক প্রবল উত্তেজনায় কাটল আন্না রামলীলা উৎসব।

তার মধ্যে একটা ক্যামেরাও একটা দিনের জন্য ধরে রাখল না মণিপুরের শর্মিলা চানুর দিনলিপি, যিনি আজ না জানি কতদিন ধরে প্রায়োপবেশনে বসেছেন নারীত্ব ও জ্ঞাতি অপমানে। ভারতের সনাতন সত্য হারিয়ে গেল মণিপুরের প্রত্যন্তে, আর মহাকাব্যের হস্তিনা, আজকের দিল্লি উদ্‌যাপন করতে রইল এ বছরের আন্না উৎসব।

যতক্ষণ না মেসি এসে মিডিয়ার দৃষ্টি ফেরালেন নতুন উন্মাদনার দিকে।

১১ সেপ্টেম্বর, ২০১১

AMARBOI.COM

অভিধানে 'ন্যাকা' শব্দটির অর্থ দেখলাম—ন্যাকা, নেকা (কা, নেক = সাধু) অজ্ঞতা, সরলতা বা সাধুতার ভানকারী।

পড়ে বেশ মজার লাগল।

কতগুলো শব্দের নানারকম অপ্রত্যাশিত অনুষঙ্গ থাকে আমাদের জীবনে।

'নেক' (সাধু) শব্দটিকে আমি যেমন চিনতে শিখেছি হিন্দি ছবির খলনায়ক প্রাণ যখন বিগতযৌবন অবস্থায় নানারকম সজ্জন চরিত্রাভিনয় করতে লাগলেন, এবং চিত্রনাট্যকাররাও তাঁর এই সদ্য পরিবর্তনকে দর্শকের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য করার জন্য তাঁর সংলাপে ঘন ঘন ধ্বনিত করতে লাগলেন এই বাক্য,

—ম্যায় এক নেক আদমি হুঁ।

যে 'নেক' শব্দটিকে আমি ওই দীর্ঘকায় উত্তরভারতীয়, গরগরে কণ্ঠস্বরের মানুষটির সঙ্গে এতদিন মিলিয়ে ফেলেছিলাম, পরে জানলাম সেটাই নাকি 'ন্যাকা'-র উৎপত্তি-শব্দ। আশ্চর্য!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেখানে তুচ্ছ হয়ে যায় ধর্মাধর্মের সব বাদানুবাদ—পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতা কি আমাদের সেটুকুও শেখাবে না কোনও দিন?

এরপরেও শুভ ২০১৩ লিখতে আর ইচ্ছে করছে না।

৬ জানুয়ারি, ২০১৩

বহু বছর পর এবার বইমেলা যাওয়া হয়ে উঠল। বক্তৃতা দিতে নয়, সঞ্চালনা করতে নয়, এমনকী বই বা স্টল উদ্বোধন করতেও নয়। কেবল একজন শ্রোতা হিসেবে।

দে'জ পাবলিশিং থেকে একটি সুন্দর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল—কাগজে পড়ে লোভ সামলাতে পারলাম না।

তিনটি বইয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন একই মঞ্চে। গ্রিক নাটক সংগ্রহ, বুদ্ধদেব বসু নাটক সমগ্র এবং 'সুন্দরম' নাট্যগোষ্ঠী গত দু'দশক ধরে যে মৌলিক নাট্যরচনার প্রতিযোগিতার আয়োজক, তার থেকে বাছাই করা একগুচ্ছ নাটক—'সুন্দর নাট্যসমগ্র'।

একে তো এমন লোভনীয় বইয়ের বিষয়, তার ওপর বক্তার তালিকায় প্রায় সবাই সুপারস্টার। শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন মুখোপাধ্যায়, কৌশিক সেন, দময়ন্তী বসু সিং আর মঞ্জরী মিত্র। বেস্টসেলার প্লাস ব্লকবাস্টার—এমন সুযোগ আর রোজ-রোজ পাই কোথায়?

অমনি অপুকে ফোন—এবং যথারীতি পরম আশ্বস্ত আহ্বান। সুধাংশুদাও (দে) মঞ্চে ছিলেন, তবে ইদানীং তাঁকে সবাই 'অপুর বাবা' বলে ডাকছেন। একপ্রকার ছদ্ম-অভিমান করে বসে রইলেন মঞ্চে। তবে সুধাংশুদা যেহেতু অভিনেতা হিসেবে তেমন পাকা নন, পুত্রগর্বের আন্তরিক আনন্দ অজান্তেই উজ্জ্বল করে দিচ্ছিল তাঁর মুখখানি বারবার। আর আমরা ঠাট্টা করে নিজেদের মধ্যে তিনটি গ্রন্থসমগ্রকে 'অপু ট্রিলজি' বলে অপুকে বেজায় খ্যাপাতে লাগলাম।

গ্রিক নাটকের পর্বে একটি সংক্ষিপ্ত, গভীর বক্তব্য রাখলেন ড. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। নাটকের জগতে কবিতাকে আহ্বান করলেন, বললেন, কেন গ্রিক ট্র্যাজেডি-র অভিনেতারা ছোট রণপা পরে অভিনয় করতেন—এই গদ্যময় পৃথিবী থেকে কবিতার উচ্চতায় পৌঁছতে...।

আন্তিগোনে-র প্রসঙ্গ অবশ্যই এল। শিশিরকুমার দাশ মহাশয়, গ্রিক নাটকগুলোর যিনি অনুবাদক, তাঁর সংকলনে 'আন্তিগোনে' রয়েছে বলেও কিছুটা। আর তা ছাড়া, অলোকদা একসময় হান্স গুন্থার হাইমে নামক এক জার্মান নাট্য পরিচালকের জন্য 'আন্তিগোনে'-র বাংলা অনুবাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিলেন—তখন আমরা সবে স্কুলের গণ্ডি টপকাচ্ছি।

আন্তিগোনে-র গল্প—সে তো প্রায় সকলেরই জানা। দেশদ্রোহী ভাইয়ের মৃতদেহের সসম্মান সৎকার—এটাই চেয়েছিল মেয়েটা। তার মামা, রাষ্ট্রপ্রধান ক্রেয়নের বিরোধিতা করেছিল এক স্বাধীন ইচ্ছের জোরে, যে, রাষ্ট্রশক্তির শাসনের পাশেও সমান্তরাল শক্তিতে বয়ে চলে ভাইবোনের রক্তের পবিত্র বন্ধন।

এই নাটকে কোনও oracle নেই। নেই কোনও ঈশ্বরের নির্দেশ। কেবল রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্ব। নিজেই ভাবিনি সেদিনের সেই নাট্যালোচনাটি একটা দৈববাণী হতে চলেছে অবিলম্বে।

'রাষ্ট্রদ্রোহী' আফজল গুরু-র মৃতদেহ রাষ্ট্রীয় অবহেলায় সমাহিত হল তিহার জেলের অভ্যন্তরে।

গুরুর পরিবার না সময়মতো খবর পেলেন, না পেলেন মৃতদেহের অধিকার।

আর সেই মুহূর্তে, গ্রিক অঞ্চলের প্রাচীনতা থেকে আন্তিগোনে একেবারে সমসাময়িক হয়ে এসে দাঁড়াল দিল্লির আদালতের দ্বারে।

তার বিদ্রোহ সফল হবে কি না জানি না, তবে তার নির্ভীক প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে কী উত্তর দেবে ভারতবর্ষ?

'কিন্তু আমি আমার ভাইয়ের শেষকৃত্য করবই
তার জন্য যদি মরি, সেও সুখ।
পবিত্র কাজের জন্য দণ্ড মেনে নেব।
জীবিতকে তুষ্ট করার মতো সময় আমার বেশি নেই,
মৃতকে ভালবাসার সময় আমার অনন্তকাল।'

অনুবাদক : শিশিরকুমার দাশ

২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

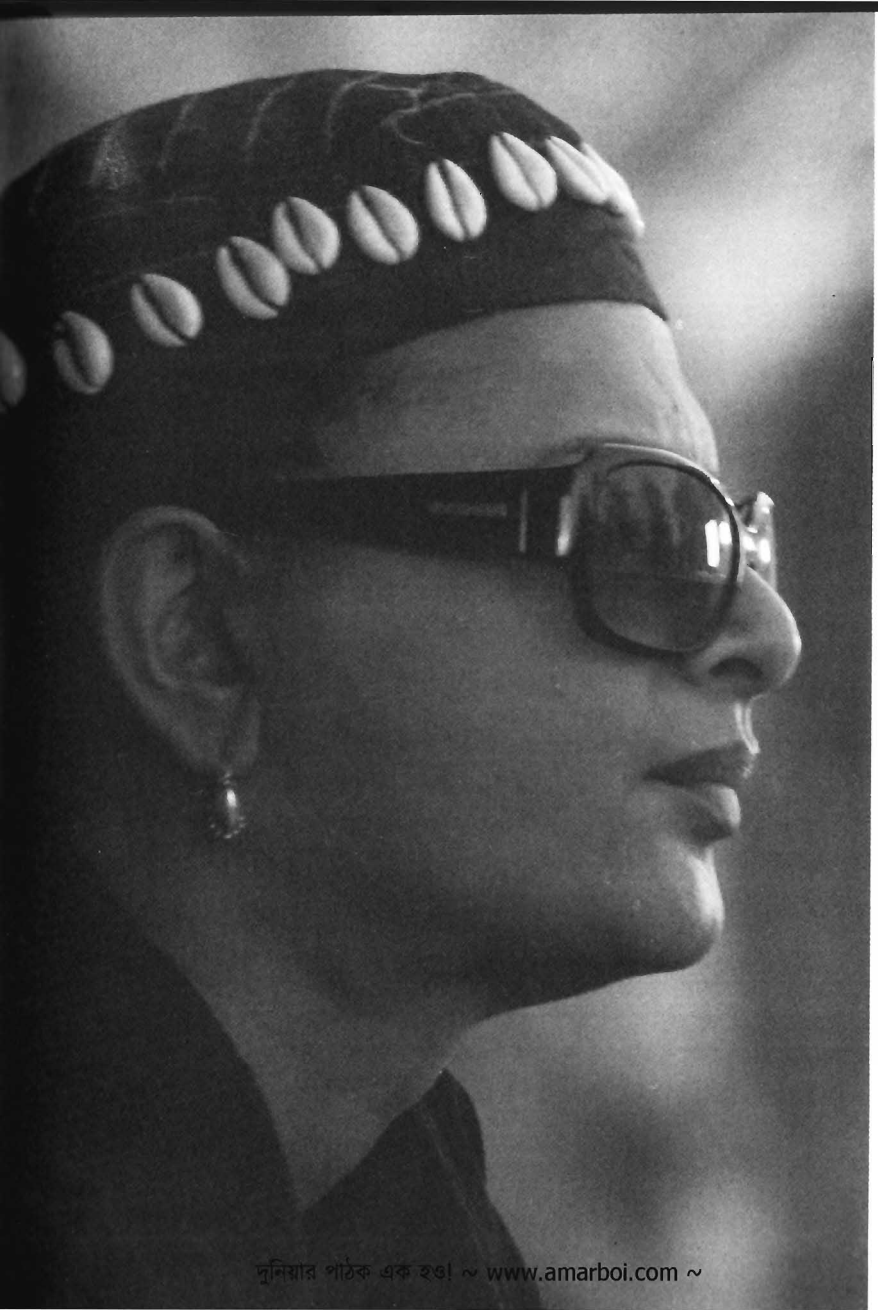

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বাদশবর্ষ পূর্বকার কথা।

হিন্দি চলচ্চিত্রে তখন ডিম্পল কাপাডিয়া নায়িকা হিসাবে একটি অতি সুবিদিত নাম। 'রুদালি' ছায়াছবির জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্তি তাঁহার অভিনেত্রী সত্তাকে সদ্য এক অনাবিকৃত দ্যুতিতে ভূষিত করিয়াছে, আর নয়নলোভনা সুন্দরী হিসাবে তাঁহার খ্যাতি তো বরাবরই অপ্রতিরোধ্য।

অতীতের নায়ক, তাঁহার পূর্বতন স্বামী, রাজেশ খান্না তাঁহার হৃদয়পটে তখন এক ভঙ্গুর স্মৃতিমাত্র। অথচ আদালতের কানুন অনুযায়ী তাঁহারা তখনও অবধি বিবাহিত দম্পতি। যে সময়কার কথা বলিতেছি, ডিম্পল তখন মুম্বইয়ের বান্দ্রাস্থ কার্টার রোডের বাটীতেই বসবাস করেন।

আমাদের সাক্ষাতের সময় পূর্ব হইতেই নির্ধারিত ছিল—সায়াহ্নে, সাড়ে ছয় ঘটিকায়। ডিম্পল তখন গোবিন্দ নিহালনির 'দৃষ্টি' ছায়াছবিতে ডাবিং কার্যে ব্যাপৃত। বলিয়াছিলেন, 'ফিরতে ফিরতে ছ'টা হবে। তুমি তারপরে এসো। সাড়ে ছ'টা নাগাদ।'

সন্ধ্যা ছ'টা মুম্বাইয়ের সূর্যকে ঈষৎ ক্ষণপ্রভ করিতে পারে মাত্র। মহারাষ্ট্রের গোধূলি আর পশ্চিমবঙ্গের সূর্যাস্তের মধ্যে এক দুস্তর ব্যবধান। সন্ধ্যা ছ'টার আকাশের দিকে চাহিলে উত্তর-মধ্যাহ্নের উষ্ণ পীতাভ রৌদ্রালোক ব্যতীত কিছুই নজরে আসে না।

মুম্বইতে আমার বাসা ছিল বান্দ্রার নিকটেই কোনও একটি অতিথিশালায়। ফলে পদব্রজে এই সামান্য দূরত্ব সহজেই অতিক্রম করিলাম।

দ্বাদশ বর্ষকাল পূর্ব। তখনই মুম্বই অনেক পরিবর্তিত। বৈকালিক স্বর্ণাভার ক্রিকেট ক্রীড়ারত বালক নাই, রোয়াকে যুবক নাই, সমুদ্রতীরস্থ ব্যান্ডস্ট্যান্ড ভিন্ন কোথাও কোনও অবকাশকামী মানুষের সন্ধান মেলে না। মুম্বাই শহর সদা ধাবমান, তথায় বিশ্রামের কোনও স্থান নাই। ডিম্পলের বাড়িতে যখন অবশেষে পঁহুছিলাম, তখন সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছয় ঘটিকা হইবে।

বিশাল গেটের সম্মুখে দীর্ঘকায় প্রৌঢ় গৃহরক্ষী। গম্ভীর হিন্দিতে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছিলেন —কী আমার পরিচয়? কোথা হইতে আসিতেছি?...ইত্যাদি।

সদ্য হয়তো নাম, এবং কলিকাতা নিবাসী এতটুকু বলিয়াছি এমন সময় একটি অতিবৃহৎ মনোহরদর্শন গাড়ি আসিয়া থামিল। ডিম্পল কার্যসমাপনান্তে গৃহে ফিরিয়াছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গৃহরক্ষীর জেরা হইতে মুক্ত করিয়া আমাকে গৃহ অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন।

ডিম্বল কাপাডিয়ার বৈঠকখানা সুপ্রশস্ত ও সসজ্জিত। বরাবরই ডিম্পলের এক বিশেষ সুচারু অন্দরসজ্জাপ্রীতি লক্ষ করিয়াছি। কক্ষমধ্যে খ্রীস্টীয় মধ্যযুগীয় ম্যুরালশোভিত একটি বিশালকায় দারুনির্মিত বিভাজনখণ্ড।

বাহিরের দিকের দেওয়ালটি কাচের। তাহার মধ্য দিয়া দেখিলাম মুম্বাইয়ের সাড়ে ছটার সূর্য অতীব অনিচ্ছায় ধীরে ধীরে ম্লান হইতেছে।

ক্রমে দিবালোক মুমূর্ষু হইল। ব্যাঘ্র যেমন শিকারকে, এবং ব্যাধ যেমন ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করে, ঠিক তেমনই অন্ধকার আসিয়া দিবসকে পরাভূত করিল।

বৈঠক খানার কাচের দেওয়ালের বাহিরের অন্তিম রবিরেখা নিকষনিমজ্জিত। কেবল কক্ষের বাতিসকল সেই অরূপ কৃষ্ণতায় দীপালোকের ন্যায় প্রতিফলিত হইতেছে।

কাজকর্মের আলোচনা যত না হইল—তাহা হইতে অধিক হইল অলস বিশ্রম্ভালাপ। ডিম্পল কখনও মানুষ হিসাবে সতর্ক বা অতিসচেতন নহেন, ফলে আড্ডা জমিতে সময় লাগে না।

অবশেষে আটটা। এইবার উঠিতে হয়। নতুবা, গৃস্বামিনী খানিক অনুরোধ খানিক জবরদস্তি প্রয়োগ করিয়া কোথাও নৈশভোজে লইয়া যাইবেন—এ সম্ভাবনা প্রবল। আর তাহা হইলে ভোজ সম্পন্ন হইতে হইতে উত্তর মধ্যরাত্রি। মুম্বইতে সূর্য বিলম্ব করিয়া ডুবিলেও উদিত হইতে তত বিলম্ব করেন না। অতএব গুটি গুটি প্রস্থান করাই শ্রেয়।

গেটের বাহিরে তখন গৃহরক্ষী বদল হইয়াছে। অপরাহ্নের সেই দীর্ঘকায় প্রৌঢ়ের স্থানে এখন এক অন্য মানুষ।

তারকাগৃহের নিয়মই এমন। ঢুকিবার সময়ই যত জবাবদিহি করিতে হয়। বাহির হইবার সময়ে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত—অন্দরের অতিথিকে তাঁহারা অতি সহাস্যে বিদায় জানাইয়া থাকেন।

গেট পার হইয়া, রক্ষীদের অভিবাদন গ্রহণ করিতে করিতে নির্গত হইতেছি— কোথা হইতে আসিয়া পথরোধ করিলেন সেই দীর্ঘকায় প্রৌঢ়।

অধুনা তাঁহার রক্ষীবেশ পরিবর্তিত। খাকি উর্দি যে কোনও সাধারণ মানুষকে যে কতখানি নিষ্ঠুর ও নৈর্ব্যক্তিক করে, অন্য পোশাক মুহূর্তে যেন তাহা সুনির্দিষ্টভাবে দেখাইয়া দেয়।

তাঁহার পরনে এখন নীল টেরিকটনের একটি মলিন শার্ট এবং ছাইরঙা ধূসর প্যান্ট। বুঝিলাম, মানুষটি আমার নিমিত্তই অপেক্ষা করিতেছেন। অন্যদের উপস্থিতিতে সামান্য অস্বস্তি লক্ষ করিলাম। ফলে ঈষৎ ব্যবধানে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

ভদ্রলোকের ভঙ্গুর মুখ যেন এক অদ্ভুত কৃতজ্ঞ হাসিতে উজ্জ্বল হইল।

বৈকালিক জিজ্ঞাসাবাদের অসমাপ্ত জেরটুকু হইতেই যেন পুনর্সূচনা করিলেন —আপনি কলকাতা থেকে এসেছেন? অপরাহ্নের শোনা উত্তরভারতীয় হিন্দিতে এবার অল্পদিনের বাংলা শেখার আত্মীয়তা। অনুমান করিলাম, ভদ্রলোক কিছুকাল হইলেও বাংলায় বসবাস করিয়াছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললাম—হ্যাঁ

ব্যাস। গৌরচন্দ্রিকা শেষ। এইবার সোজা প্রশ্ন। কণ্ঠস্বর অনেক মিহি শোনাইল।

'টিটাগড় পেপার মিল খুলেছে কিনা, জানেন?'

আরবসাগরের সূর্য ডুবিতে চাহে না বটে, কিন্তু ডুবিলে যে এমন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার হয়—কে জানিত? কে জানিত, যে ডিম্পলের দোতলার বৈঠকখানার কাচের দেওয়ালের ভেতর আলোকিত অন্দরের প্রেক্ষাপটে সেই দীর্ঘকায় পিতা এমন অসহিষ্ণু, অধৈর্য হইবেন? গৃহরক্ষীর জিজ্ঞাসাবাদ হইতে ইহা অনেক বেশি সূচীভেদ্য, কঠিন ও নৈর্ব্যক্তিক। যেন উত্তর তাঁহার এক্ষুণি প্রয়োজন।

বলিলাম—কেন? ছেলে আছে?

নিকষ দীর্ঘদেহ অন্ধকারে অল্প একটু নড়িল। বুঝিলাম—হ্যাঁ।

সত্য স্বীকার করিতেই হইল—জানি না, গিয়ে খোঁজ করে জানিয়ে দিতে পারি।

আজ এতদিন পরে হঠাৎ মনে পড়ল সেই ঘটনাটার কথা। ডিম্পল এখন আর কার্টার রোডে থাকে না। রাজেশ খান্নার সঙ্গে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হওয়ার পরে জুহুতে বাস্তু বলে একটা অ্যাপার্টমেন্ট-এ উঠে গেছে। সেই লম্বা মতন ভদ্রলোক নিশ্চয়ই এখন আর নেই। কার্টার রোড-এর বাড়িটা শুনেছি নীলাম হয়ে গেছে।

ইস্! কত খবর দিতে পারতাম নইলে, বলতে পারতাম— পেপার মিল, জুটমিল বন্ধ হয়েছে তো কী হল? তোমার ছেলেকে খবর দাও। সেও তার বেকার বসে থাকা বন্ধুবান্ধবদের জানাক। সিঙ্গুরে নতুন গাড়ির ফ্যাক্টরি হবে, শালবনীতে জিন্দালের কারখানা হবে, বারুইপুরে ক্ষেত উপড়ে ফেলে বাড়ি তৈরির কাজে অনেক মিস্ত্রী লাগবে।

পশ্চিমবঙ্গে যে উন্নয়ন আসছে গো!

অবশ্য এসব কারখানায় মিস্ত্রি মজুর কতটা লাগবে জানি না। তবে, কারখানা গেটে দারোয়ান তো লাগবে।

২৮ জানুয়ারি, ২০০৭

(লক আউট প্রসঙ্গে একটি সংখ্যায় ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ লেখাটি পুর্ণমুদ্রিত হয়।)

টালিগঞ্জের যে রাস্তাটার প্রায় ওপরেই আমাদের বাড়ি, তার নাম প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড। ওই রাস্তাতেই আমাদের পাড়ার মোড় শুরু। ওইখানেই আমার স্কুলবাস আসত ছেলেবেলায়। আজকের ছেলেবেলার তুলনায় অনেক বেশি ভীরু সারল্যের বয়স অবধি ওই রাস্তাটাকে আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোশাকি নামে কোনওদিন ডাকিনি। ওটা ছিল আমাদের 'বড় রাস্তা।'

যে রাস্তায় অহরহ গাড়ি চলে। যে রাস্তার দু'ধারে নানা মণিহারি দোকান। যে রাস্তা একা একা ছোটরা নাকি পার হয় না। যে পার হয়ে যায় অবলীলায় অগোপনে, তক্ষুনি সে নাকি বড় হয়ে যায়।

তখন প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড অনেক বেশি নির্জন। আমার জ্ঞানত, নিতান্তই ছোটবেলায়, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড-এর সবথেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল নবীনা সিনেমা।

নবীনা সিনেমা তৈরি হওয়াটা মনে নেই আমার। মনে আছে প্রথম সিনেমা রিলিজ করল 'খামোশি।' অসিত সেনের হিন্দি ছবি। আমি তখন কী 'খামোশি', কে বা অসিত সেন—কিচ্ছু জানি না। কেবল মনে পড়ে, পাড়ার একটু বড় দিদিরা মুখ বেঁকিয়ে বলেছিল—এটা নাকি 'দীপ জ্বেলে যাই'-এর হিন্দি। আর সুচিত্রা সেন যা ফাটিয়ে পার্ট করেছিল, ওয়াহিদা রেহমান তার ধারে কাছেও যেতে পারেনি।

আমাদের ওই অঞ্চলটা নকশাল-উপদ্রুত ছিল বলে নবীনায় কোনও নাইট শো ছিল না। ছিল রমরমে নুন শো।

সেখানে উপচে পড়ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজের ছেলেমেয়েদের ভিড়। আর আমার বড় হওয়ার শব্দকোষে ক্রমে প্রবেশ করল নতুন দু'টো শব্দ—'কলেজ কাটা' আর 'লাইন মারা'। 'লাইন মারা' কথাটার দু'টো মানে ঠিকঠাক অব্যর্থভাবে তখনও ব্যবহার করতে শিখিনি। যতদিনে শিখলাম, ততদিনে নিজে নিজেই বড় রাস্তা পার হতে পারি—কেউ আর বকে না।

আমার ছেলেবেলার প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডে সাইকেল রিকশা ছাড়া আর কিছু চলত না।

প্রথম যে বাসরুটটা চালু হ'ল, সেটার নাম থার্টি সেভেন। তখন আমি নিতান্তই শিশু। থার্টি সেভেন বাসটা ছাড়ত ঢাকুরিয়া থেকে, যেত হাওড়া অবধি।

আমাদের বাড়ির স্টপটার নাম চিরাচরিতভাবে 'কলেজ'। মানে, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজ।

থার্টি সেভেন বাস এসে আমার বাবাকে এক নিরুপায় ক্লান্ত সান্ধ্যভ্রমণ থেকে মুক্তি দিয়েছিল। বাবাকে আর অফিস ফেরত ট্রামলাইনে নেমে হেঁটে বাড়ি ফিরতে হত না।

গোটা ভারতের কাছে স্বাধীনতার সংখ্যা যেমন ফিফটিন, আমার তেমনই থার্টি সেভেন। ওই বাসরুটটাই আমার প্রথম নিজে নিজে বাসে চড়তে শেখায়, শেখায়, নিজে পয়সা দিয়ে টিকিট কাটার স্বাবলম্বিতা। স্কুলবাস ছাড়ার পর আমরা তিনবন্ধু রাহুল, হিরণ্ময় আর আমি স্কুল থেকে হেঁটে ফিরতাম ঢাকুরিয়া অবধি। সেখান থেকে থার্টি সেভেন চেপে বাড়ি।

প্রথম প্রথম ভাড়া ছিল দশ পয়সা। কবে যেন, সেই দশ পয়সার মেয়াদ এসে দাঁড়াল কেবল লর্ডস বেকারি অবধি। লর্ডস পার হলেই এবার পনেরো পয়সা।

ভাড়া বাড়ার পরেও আমার জেদ ছিল দশ পয়সার টিকিটই কাটব। কন্ডাক্টরকে পাঁচ পয়সা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফাঁকি দেওয়ার রোমাঞ্চই বোধহয় জ্ঞানত আমার প্রথম অপরাধ।

যথারীতি 'কলেজ কলেজ' বলে কন্ডাক্টর চেঁচাত, আর আমি বাড়ির কাছে এসে সুড়ুৎ করে নেমে পড়তাম। আর দিনের পর দিন আমার জমানো অপরাধগুলোই হত আমার স্কুলের শেষের বিটনুন দেওয়া আমড়া বা হজমিগুলি।

ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম, আমার বড় রাস্তার কোনও কদর নেই বহির্জগতে। গোটা নামটা পরিষ্কার করে বলতেও পারতাম না সবসময়। কিছুটা বোধহয় ভয় পেতাম তার অকৌলীন্যকে।

এমন একটা জিনিস ছিল না গোটা রাস্তাটা জুড়ে, যার ইঞ্চিখানেক পর্বের সঙ্গেও জুড়ে দিতে পারি আমার ঠিকানার গৌরব। প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড নামটার মধ্যে একজন রাজপুত্তুর বাস করলে কী হবে, আদতে রাস্তাটা বরাবরই ছিল কেমন যেন নিশ্চুপ, নিরহংকার, সাদামাটা।

কোনও বড় দুর্গাপুজো হত না আমাদের বড় রাস্তায়। কোনও জাঁকালো বাড়ি ছিল না, যেটার সূত্র ধরে ছিটেফোঁটাও গর্ব করা যায়।

থাকার মধ্যে ছিল, একটা বড় মসজিদ। আর একটা মাজার। তাই স্কুলের দাদা দিদিরা ঠাট্টা করে বলত 'তোরা তো মোল্লাপাড়ায় থাকিস।' ভাবতাম, সে বুঝি বা বড় গ্লানির আত্মপরিচয় হল!

আর মনে মনে রাগ হত সেই বড়দের ওপর, যারা শুনতাম হ্যারিসন রোড, আমহার্স্ট স্ট্রিট-এর নাম বদলে বদলে চেনা চেনা সব প্রাতঃস্মরণীয়দের নামে নাম রাখছেন। ক্ষোভ হত, আমার বড় রাস্তার একটা সম্মানজনক নাম তো তাঁরা ভাবতে পারতেন!

প্রিন্স আনোয়ার শাহকে কেমন দেখতে আমি জানি না। কেবল জানতাম তিনি টিপু সুলতানের ছেলে। সেদিন উইকিপিডিয়ায় ছবি খুঁজলাম প্রিন্স আনোয়ার শাহর—পেলাম না। অনেক সময় ছোট করে বলার সময় মা যখন কাউকে বলত—'ওই তো আমরা আনোয়ার শাহ রোড-এ থাকি'—আমার বড় দুঃখ হত 'প্রিন্স' কথাটা বাদ পড়ল বলে। না হয় লোকটা শুনতে পাচ্ছে না, তাই বলে রাজপুত্তুরকে রাজপুত্তুর বলব না?

বড় রাস্তার মোড়ে একটা বড় মসজিদ তার ভেতরে অনেক গাছ। সন্ধে হওয়ার আগে সেই গাছের পাখিরা আমাদের জানান দিত—এবার রাস্তার আলো জ্বলবে। পরীক্ষার আগে মসজিদের ভোরের আজান ডেকে দিত ঘুম থেকে—পড়তে বোসো।

আর মহরমের দিন আমাদের বড় রাস্তা সাদা পাঞ্জাবি আর ফেজ টুপিতে সেজে সাদা আর গোলাপি ডোরা ডোরা রেউড়ির মেলা বসিয়ে দিত। সে ছিল আমাদের বড় রাস্তার উৎসব।

আমরা রাস্তার ধারে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতাম, কখন দুলদুল ঘোড়া আসবে। তার পিঠের ওপর জরির কাজ করা মখমলের আসন। বছরের পর বছর পড়ে থেকে থেকে জরির কাজে জং ধরে গিয়েছে। তবু দুলদুলই যেন ছিল আমাদের বড় রাস্তার গরিব রাজকুমারের যোগ্য প্রতিনিধি।

বাড়ি ফিরে ভাবতাম আমার যে বন্ধুরা যারা নামকরা রাস্তায় থাকে, তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি দুলদুল যায়? দুপুরের জ্বলন্ত রোদে এক অনুপম রাজকাহিনীকে পিঠে সওয়ার করে?

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজটা নাকি ছিল টিপু সুলতানের নাচঘর। 'টিপু সুলতান' সিরিয়ালটা হওয়ার আগে একথা বলে আমার কোনও বন্ধুকে কোনওদিন ইমপ্রেস করতে পারিনি।

তারপর একদিন দেখলাম, থার্টি সেভেন বাসের কন্ডাক্টরের ঘোষণার মতোই যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজটাও আমার ঠিকানার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছে।

কুরিয়ারকে ঠিকানা লিখতে হলে লিখছি 'Next to Jogeshchandra Chowdhury College'। কাউকে বাড়ির ডিরেক্শন দিতে হলে বলছি—ওই তো! যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজটা...!

সেদিন কী একটা ফর্ম ভর্তি করছি। ঠিকানার পরেই রয়েছে Closest landmark। অভ্যাসবশত Jogesh Chandra দিয়ে শুরু করেছি, যিনি ফর্মটা ভর্তি করাচ্ছিলেন বললেন—

—দাদা, লেক গার্ডেন্স ফ্লাইওভার লিখুন। চিনতে সুবিধে হবে।

বুঝলাম, আমার বাড়ির ল্যান্ডমার্ক বদলে গিয়েছে।

সেদিন বাবাকে দেখে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরছি। যোধপুর পার্ক পোদ্দারনগরের মাঠ থেকে অচল গাড়ির মিছিল।

গোবিন্দ বলল—সাউথ সিটি মল খুলেছে, তার ভিড়।

মনে হল যেন দুর্গাপুজো হচ্ছে গোটা রাস্তা জুড়ে। সার সার গাড়ি। কত কত মানুষ। তাদের জ্বলজ্বলে চোখ, চকচকে মুখ।

আমরা যেটাকে বরাবর ঊষা কোম্পানি বলতাম, যার বিশ্বকর্মা পুজো নাকি আমাদের বড় রাস্তার সবথেকে দেখবার মতো পুজো ছিল, সেখানে একটা বিরাট ঝাঁ চকচকে বাড়ি। আলোয় আলো। বিদেশে যেমনটি দেখেছি। চোখের সামনে আলোর ভিড়। মানুষের ভিড়। গাড়ির ভিড়।

রাস্তা জুড়ে উৎসব চলছে। সবাইর মুখ জুড়ে আলো। আমাদের বড় রাস্তা হঠাৎ কেমন যেন বড়লোক কুলীন হয়ে গিয়েছে।

সেই আলোর ভিড়ে বসে বসে বাইরের দিকে তাকালাম।

আর কেউ দেখতে পেল কি না জানি না। আমি যেন এতদিনে দেখতে পেলাম টিপু সুলতানের বংশধর, সেই ভাগ্যহীন রাজকুমারকে। মরচে ধরা জরির আসনে চেপে দুলদুল ঘোড়ার পিঠে দিশেহারার মতো অন্ধকার খুঁজছে। মুখ লুকোবে বলে।

৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক

তখনও আমাদের বাড়িটা দোতলা হয়নি।

মেজনাইন ফ্লোরের পশ্চিমমুখো ঘরটায় একটা ছোট্ট লাগোয়া বারান্দা ছিল।

সকালগুলো ছিল ছায়াঢাকা, বিকেলের পর বারান্দা ঘেঁষে হেলে পড়ত বেলাশেষের কমলালেবু রোদ।

দুপুরের পর থেকেই বারান্দাটা নিকোনো, চকচকে, শান্ত। কেবল আচারের বৈয়াম আর শুকোতে দেওয়া বড়ি ঘিরে কাক চড়ুইয়ের জটলা।

আর দুপুরের ঘুমে ঝিমিয়ে পড়া ঠাকুমার থেকে থেকে হাতপাখা ঠোকা।

সকালবেলার বারান্দায় বসত ঠাকুমার রান্নাঘর।

ঠাকুমা তখনকার দিনে বিধবা—স্বপাক আহার ছাড়া খেত না।

মা অনেক বলেছিল, লাভ হয়নি। বহু চেষ্টা করেও সারাজীবন ঠাকুমাকে চটিজোড়া পরাতে পারেনি মা। শীত-গ্রীষ্ম, কাদা-মাটি—ঠাকুমা খালি পা।

একাদশীর দিনটাকে আমি এখনও মনে মনে চিনি ঠাকুমার বড় কাঁসার জামবাটিটা দিয়ে। ওতে করে খই দুধ খেত ঠাকুমা।

তা ছাড়া মাসের বাকি দিনগুলো চান করে সকাল ন'টা-সাড়ে ন'টার মধ্যে ঠাকুমার রান্না বসে যেত।

আতপ চালের ভাত ফুটত বাড়িময় এক অপূর্ব সুবাস ছড়িয়ে। তার সঙ্গে কাঁচকলা আর মুগডাল সেদ্ধর গন্ধ ম-ম করত আমাদের পশ্চিমের বারান্দা জুড়ে।

আমি এককোণে একটা ছোট্ট মোড়ায় বসে ঠাকুমার রান্না দেখতাম।

মা পইপই করে বারণ করত

—কাছে যাবে না কিন্তু।

প্রথমে ভাবতাম উনুনের ভয়ে। পরে বুঝেছি পাছে ঠাকুমাকে ছুঁয়ে দিই। একগাল হেসে জড়িয়ে ধরবে আমায়, বলবে না কিচ্ছু—চুপটি করে গিয়ে আবার চান করে আসবে। মধ্যে থেকে রান্নাটা ফেলা যাবে পুরো।

ছোট্ট একটা শিলে বাটনা বাটত ঠাকুমা। আর কড়ির বৈয়ামের মধ্যে থেকে পলা দিয়ে তুলে আনত গুঁড়ো করা খয়েরি দানা। অনেক কষ্টে নামটা জেনেছিলাম—সৈন্ধব লবণ। আমার মহাভারত পাগল শিশুমন কেমন করে যেন সৈন্ধব কথাটার 'ন্ধ'টা বেছে নিয়ে সদ্যশেখা 'গন্ধর্ব' শব্দটার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিল। আর আমার কল্পনায়, সৈন্ধব লবণ বা চালের দিব্যগন্ধ অন্ন কেমন করে যেন দেবতার আহার মনে হত।

ঠাকুমার খাবার থালাটি ছিল কাঁসার। নিয়মিত ছাই-তেঁতুলে ঝকঝকে সোনার বরণ। মনে মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবতাম, দেবতারাই কেবল বুঝি এমন সোনার থালায় খান।

ঠাকুমার রান্নার জোগাড় দেখাটা ছিল বড় আনন্দের। মোচার খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে, তারই এক কোণে গুছিয়ে রাখত লাল আর সবুজ লঙ্কা কুচি।

এর থেকে ভাল আলপনা দেওয়া আমি আর দেখিনি।

একদিন ঠাকুমা জোগাড় করতে করতে পাশে কোথাও একটা গিয়েছে, আমি ক্যাসাবিয়াঙ্কার মতো মোড়াতেই বসে আছি—হঠাৎ পশ্চিমের বারান্দার দমকা বাতাসে ছত্রখান হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ঠাকুমার লঙ্কা কুচি। কিছু উড়ে গেল, কিছু পড়ল মেঝেতে, কিছু এদিক-সেদিক।

নেহাত লঙ্কা ঝাল—আমার হাত দেওয়ার সম্ভাবনা কম। নইলে আমার কপালে নির্ঘাত মা'র পিট্টি লেখা ছিল।

রান্না করতে করতে গল্প বলত ঠাকুমা। মনসামঙ্গলের গল্প, কাঠুরের গল্প, রূপবান কন্যা, শঙ্খমালী রাজকুমারীর গল্প। গল্পগুলো তেমন আহামরি কিছু লাগত না তখন। ঠাকুমা যে চমৎকার গল্প বলিয়ে ছিল তাও নয়। কিন্তু সেই গল্পের মাঝখানে কোনও রান্না বা খাওয়ার ঘটনা আসত, ঠাকুমার বর্ণনায় সেই জায়গাগুলো কেমন যেন জীবন্ত হয়ে যেত। কেমন করে বড়রানি যত্ন করে 'পাক করে' হিঞ্চে শাকের বড়া পাক করে দেন রাজকুমারের জন্য, কেমন করে ফুল্লরার পান্তাভাত স্বাদু হয়ে উঠল কাগজি লেবু আর লাল টুকটুকে লঙ্কার গুণে—এই ছিল আমার সঙ্গে অন্দর-আখ্যানের প্রথম সম্পর্ক।

আমার ঠাকুর্দা মারা যাওয়ার পর ঠাকুমা বেঁচেছিল প্রায় তিরিশ বছর। আমিষের ছায়া না মাড়িয়ে।

একদিন মনে আছে, আমি তখন আরেকটু বড়, সকালবেলা বাবা বাজারে যাবে; ঠাকুমা দ্বিধার পায়ে দরজায় এসে দাঁড়াল।

—একটু চিতল মাছ আনস তো?

আমরা সবাই অবাক,

মা বাবাকে বাজারের টাকা দিচ্ছিল, খোলা হাতব্যাগ বন্ধ না করে তাকিয়ে রইল ঠাকুমার দিকে।

—কাল স্বপ্ন দেখছি, চিতল মাছ রাঁদ্দতাছি। দিনের অবচেতনই নাকি রাতের স্বপ্ন। সেই অবচেতনের সঙ্গে কত অবদমন মিলে থাকে আমরা জানি?

দুই

ঠাকুমা মারা গিয়েছে বছর দুয়েক হল। আমি প্লাস টু শেষ করে সবে কলেজে। মেজনাইন ফ্লোরের পশ্চিমমুখো ঘরটা এখন আমার দখলে।

তবু ওটার নামটা, ঠাকুমার ঘর'ই রয়ে গিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই বারান্দায় বসে একদিন বিকেলবেলা একটা গল্পের বই পড়ছি। তখন সবে বই পড়ার পোকা আমার মাথার ভেতর সারাদিন কিলবিল।

বাংলা একটা উপন্যাস—প্রথম প্রতিশ্রুতি।

এর আগে আশাপূর্ণা দেবীর ছোটদের গল্প অনেক পড়েছি। বড়দের লেখা বোধহয় এই প্রথম।

পশ্চিমের বারান্দায় কমলালেবু রোদ। সেখানে আমার সামনে পিঠ ছড়ানো চুল শুকোচ্ছে ছোট্ট সত্যবতী।

খুন্তি নাড়ার সত্যিটা, ভাত ফুটোনোর গন্ধ ভর করে যে হেঁসেল থেকে কোনও কল্পনার অমরায় যাওয়া যায়, একদিন শিখিয়েছিল ঠাকুমা। আবার নতুন করে শিখলাম আশাপূর্ণার কাছে। আশাপূর্ণা নামটা আমার কাছে বড় রূপকী। কত না বলা কথা, কতদিনের সঞ্চিত অন্দরমহলের কান্না ধীরে ধীরে শার্সি খুলে পাখা মেলতে শিখছে আশাপূর্ণার কলমে।

নিভে যাওয়া সব আশা জেগে উঠছে আবার। পূর্ণতা পাচ্ছে পশ্চিম বারান্দার কমলালেবু আলোয়।

আর তারই মাঝে যেন স্পষ্ট দেখলাম এককোণে বসে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম জপতে জপতে চিতল মাছ রাঁধছে ঠাকুমা।

ভীরু স্বপ্নে নয়, যাদা যানের গ্লানিতে নয়, জীবনের নিত্য উৎসবের আয়োজনে।

২৬ অক্টবর, ২০০৮

AMARBOI.COM

শুক্রবার। রাত আটটা। বা শনিবার। দুপুর তিনটে। তখন আমি নেহাত ছোট। বার বা সময় কোনওটাই মনে রাখবার বয়স নয়।

তবু মনে থেকে গেছে।

রোববার সকালের শিশুমহলের মতো, শুক্রবার সন্ধেবেলার রেডিও-নাটকটাও যেন শৈশবের সাপ্তাহিক ক্যালেন্ডারে একটা রক্তিমাক্ষর সময়পঞ্জি।

সব নাটক যে শুনতাম তা নয়, শুনতে দেওয়া হত তাও নয়।

কেবল সময়ের গুরুত্বটা জানতাম, কারণ ওই সময়টা মা বা পিসিমণি রেডিওতে মগ্ন। পড়ায় ফাঁকি দিলে বকবার কেউ নেই।

মা-পিসিমণি সব গলা চিনত, এমনকী কখনও বিকাশ রায় বা দিলীপ রায়ের গলা ধরা পড়লে প্রায় হঠাৎ ফিল্মস্টার দেখার আনন্দ পেত। আর আমি ভাবতাম, এটা বোধহয় বড়দের একটা বিশেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুণ। গলা শুনে চিনতে পারা। আমি যেমন বহুদিন অবধি লতা-আশা সবসময়ে আলাদা করতে পারতাম না, আমার বাল্যবন্ধু রাহুল আর হিরঞ্জিৎ অনায়াসে করে দিত, আমাকে 'দুয়ো'-ও দিত সেই নিয়ে।

কিছুটা বড় হয়ে মনে আছে শারদীয়া আনন্দমেলার মতি নন্দীর 'কোনি' উপন্যাসটা বেরল। তার কিছুদিন পর ওটা রেডিও-র নাটকে শুনলাম। এ-ও শুনলাম কোনির পার্টটা করেছেন শাঁওলী মিত্র—তিনি শম্ভু এবং তৃপ্তি মিত্রের কন্যা।

তারও বহুদিন পর কোনও একটা বেতার জগতে শাঁওলিদি'র ছবি দেখেছিলাম। একটা ছোট গামলায় মুখ ডুবিয়ে, বড় বড় দু'টো চোখ। ততদিনে 'বঙ্গবালার' কল্যাণে চোখ দু'টো আমার চেনা।

ছবিটার তলায় লেখা ছিল—'কোনি' অভিনয়ের সময় শাঁওলি মিত্র, কিন্তু আমি যেন কেমন স্পষ্ট শুনতে পেলাম—ক্ষিদ্দা আমি আর পারছি না।

ছবিটা দেখে যে খুব আহ্লাদ হয়েছিল সে কথা বলতে পারি না। বেতার নাটকের হাঁড়ির খবর বেরিয়ে গিয়ে যেন অভিনয়ের মায়াটাও সরে গেছিল মন থেকে।

রেডিও নাটক যে কল্পনার জগতটা মেলে দিত চোখের সামনে। সামান্য কতগুলো আওয়াজ আর সংলাপ দিয়ে তৈরি হত একটা অন্য জগত।

আমাদের নিওন লাইট জ্বলা সন্ধেবেলার রেডিও-র টেবিলটা জুড়ে কখন যেন ছড়িয়ে পড়ত গ্রামের রাস্তা। ঝরনার ধার, কোনও আলো ঝলমলে শীতের সকাল—নিজেও জানতাম না।

পরে অবশ্য, টেলিভিশন জাঁকিয়ে বসার পর, রেডিও-শোনা যখন সেকেলে বাতিল হয়ে গেল, তখন অনেকগুলো রেডিও নাটক শ্রুতিনাটক হিসেবে মঞ্চে অভিনীত হয়ে দেখেছি। তার মধ্যে কল্পনার সেই ডানা মেলবার জায়গাটা খুঁজে পাইনি আর।

তখন পুজোয় লংপ্লেয়িং রেকর্ড বেরত আলিবাবা, ঠাকুমার ঝুলি।

তারপর কোনও সিনেমার মর্জিনাকে আমার আর ভাল লাগেনি। মনে হত এঁদের গল্পটা কেন শ্রাবন্তী মজুমদারের মতো নয়।

এমনকী 'কোনি' যখন ছবি হল, এবং তাতে 'কোনি'র পার্ট করল আমারই স্কুলের বন্ধু শ্রীপর্ণা, আমি ওই লাইনটাতে গিয়ে কেমন যেন আটকে গেলাম।

এখন সম্প্রতি যখন শাঁওলিদি'র লেখা পড়ি—প্রতিবাদের লেখা, আমি যেন সেই বেতার জগতের বড় বড় চোখওয়ালা মেয়েটাকেই দেখতে পাই কেবল।

গত ১৪ নভেম্বর মিছিলে হাঁটার পর শাঁওলিদি'র শরীরটা ভাল লাগছিল না। বাড়ি ফিরতে চাইছিলেন। আমি ফিরছিলাম, নামিয়ে দিলাম।

রোদে-পোড়া মুখ ক্লান্ত চোখ শাঁওলিদি বাড়ি ফিরছেন আমার সঙ্গে।

আমার 'নাথবতী অনাথবৎ' মনে পড়ল না, 'কথা অমৃত সমান' মনে পড়ল না। মনে পড়ল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোটবেলায় শোনা নেই লাইনটা। জলের মধ্যে ডোবানো মুখ একটা মেয়ে দমবন্ধ গলায় বলছে,

—ক্ষিদ্দা আমি আর পারছি না।

৩০ নভেম্বর, ২০০৮

আমি এখন আর চশমা পরি না।

গত একবছর হল লেজার অপারেশন করে আমার চোখ দু'টোর পাওয়ার মোটামুটি কারেক্ট করে নিয়েছি। ফলে এখন খালি চোখে বাসের নম্বরও পড়তে পারি। আবার এসএমএস দেখতেও অসুবিধে হয় না।

এই অপারেশনটার কথা প্রথম আমায় বলে টোটা—আমাদের অভিনেতা বন্ধু টোটা রায়চৌধুরী।

ও বহুদিন অবধি বেশি পাওয়ারের চশমা পরত, একজন অভিনেতার জন্য সেটা সত্যিই অসুবিধেজনক।

'চোখের বালি'র পর যখন 'সানগ্লাস'-এর শুটিং করতে এল, দেখলাম টোটার চোখে আর চশমা নেই। একগাল হেসে বলল,

—ঋতুদা, এখন তুমি আমায় চশমা ছাড়া চরিত্রেও ভাবতে পারবে।

আমার যেহেতু চশমাবাতিক, অন্তত আমার অভিনেতা অভিনেত্রীরা তাই মনে করে, 'উনিশে এপ্রিল'-এর দেবশ্রী থেকে 'তিতলি'-র মিঠুন চক্রবর্তী বা 'রেনকোট'-এর অজয় দেবগণ—সবাইকে আমি চশমা পরিয়ে ছেড়েছি, আমি অবধারিত ভাবে 'সানগ্লাস'-এও টোটাকে চশমা পরিয়ে দিলাম।

কিন্তু এই ল্যাসিক অপারেশন-এর (চোখের লেজার অপারেশনটার এটাই বোধহয় টেকনিক্যাল নাম) ব্যাপারটা আমার মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকল।

আমি চশমা নিয়েছিলাম বেশ ছোটবেলায়। ন'বছর বয়সে।

তখন আমার চোখের পাওয়ার সাড়ে তিন।

এর জন্য একটা মানুষই দায়ী—তার নাম অপর্ণা সেন।

তখন সেই ছোটবেলায় হল-এ গিয়ে সিনেমা দেখার ঢালাও অনুমতি ছিল না বাড়িতে। বাছাই করা কয়েকটা ইংরেজি ছবি, কালেভদ্রে দু-একটা বাংলা ছবি, আর হিন্দি ছবি নৈব নৈব চ।

আমার বাড়ির কাছে নতুন সিনেমা-হল হল নবীনা। তাতে দুপুরের শোয়ে সিনেমা দেখানো হত। সেই সত্তরের গোড়ার দিকে, কলকাতা শহর হঠাৎ করে আর ততটা নিরাপদ নয়—বিশেষ করে আমাদের অঞ্চলটা। ফলে নবীনা সিনেমায় নাইট শো ছিল না কোনওদিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা, এহেন নবীনা সিনেমায় একটা বাংলা ছবি এল। 'জয় জয়ন্তী'। সাউন্ড অফ মিউজিক-এর বাংলা বলে বাড়িতে আপত্তি হল না। পিসিমণির সঙ্গে আমাদের দু'ভাইকে 'জয় জয়ন্তী' দেখতে পাঠানো হল।

মনে আছে সাদা কালো পর্দায় কোনও একটা দৃশ্যে বিষণ্ণ, বিভ্রান্ত উত্তমকুমার পায়চারি করছেন, হাতের গেলাসে কালোরঙা পানীয়।

পিসিমণিকে ফিসফিস করে জিগ্যেস করেছিলাম,

—ও কোকা কোলা খাচ্ছে কেন?

তখনও অবধি বাঙালি মধ্যবিত্ত বাড়িতে পটেটো চিপস আর কোকা কোলা ভাঁড়ারে মজুত থাকত না। সেটা কেবল হল-এ গিয়ে সিনেমা দেখার সঙ্গী। আমার মনে আছে, পিসিমণি ততোধিক ফিসফিস করে উত্তর দিয়েছিল,

—ওটা কোকা কোলা নয়। মদ।

তা, সেই 'জয় জয়ন্তী'তেই ছিলেন আমাদের সেই বয়সের কিশোর-কিশোরীদের প্রিয় একজন গৃহশিক্ষিকা—জয়ন্তী বসু। পার্ট করেছিল রিনাদি।

আমার সেই বয়সে, সিনেমা হল-এর চৌহদ্দি না-ডিঙানো জীবনে উত্তমকুমার বা অপর্ণা সেন—কারুরই তেমন গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু এই স্নেহময়ী হাফ দিদি—হাফ আন্টি গোছের মহিলাটি কেমন করে যেন আমার খুব প্রিয় হয়ে উঠল।

আমি মোটেই পিতৃমাতৃ স্নেহবঞ্চিত অভাগা বালক নই, কিন্তু বাবা-মা আর আমার প্রজন্মের মধ্যে, আমার চাওয়া-পাওয়া এবং বাবা-মার বৈধ শাসনের মধ্যে যে কল্পনার মানুষটি সেতু বেঁধে দিল তার নাম বোধকরি জয়ন্তী বসু, ছবি দেখার পর জানলাম, তাঁকে দেখতে অপর্ণা সেনের মতো।

ছবিতে রিনাদি একটা কালো ফ্রেমের ভারি চশমা পরেছিল। হতে পারে, সেটা সেই সময়ের তরুণী রিনাদিকে পাঁচটা বাচ্চা সামলানোর গুরুদায়িত্ব দেওয়ার জন্য একটা আলাদা ব্যক্তিত্ব ধার করতে হয়েছিল কালো শেল-ফ্রেমের মোটা চশমার কাছ থেকে।

একে সিনেমা দেখার অভ্যেস মোটে নেই, তার ওপর সদ্য কৈশোরে পা দেওয়া আমি কোনও নরনারীর চাপা প্রণয়াচ্ছাদিত টানাপোড়েন চোখের সামনে এই প্রথম প্রত্যক্ষ করছি। এবং সেইসঙ্গে আমার সঙ্গে মিলে রয়েছে পর্দায় আমারই কাছাকাছি বয়সের নানা কিশোর-কিশোরী, যাদের কাছে একসময়ে নিজেদের মামার থেকেও প্রিয় হয়ে যায় এই অপরিচিতা শিক্ষিকা—কোথায় যেন প্রায় সমস্তটা মেলে দিয়েছিলাম পর্দার জয়ন্তী বোসের কাছে।

ইস্কুলে প্রিয় শিক্ষক-শিক্ষিকারা যেমন অজান্তেই মডেল হয়ে যান কোনও সময়ে, যে, তাঁদের হাতের লেখা বা বাচনভঙ্গি নকল করতে ইচ্ছে হয়। মোটা কালো ফ্রেমের চশমা পরা সেই সুন্দরী, শিক্ষিতা, রুচিবতী সমব্যথিনীও মনের মধ্যে এমন করে এসে জায়গা জুড়ল যে, ইচ্ছে হল তাঁকে নকল করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি যেহেতু নকল করতে চাইলেও তাঁর মতো শাড়ি পরতেও পারি না, খোঁপা বাঁধতেও পারি না ফলে জয়ন্তী প্রতিকৃতির একটাই মোক্ষম উপাদান আমার কাছে অনুকরণীয় হয়ে উঠল। একটা কালো মোটা ফ্রেমের চশমা।

সেই বয়সে একটা চশমা জোগাড় করা খুব সহজ ছিল না। এবং ওই দশ বছর বয়সের ক্লাসে চশমা পরা ছেলেমেয়েরা প্রায় এখনকার Special Children-এর যত্ন পেত।

শিলাজিৎ আর নীলাজিৎ বলে দুই যমজ ভাই পড়ত আমাদের ক্লাসে। তাদের দু'জনেরই চোখে চশমা এবং বেশ উঁচু পাওয়ার-এর। ওদের কারুর কাছে একটা বাড়তি চশমা ছিল—যদি ভেঙে-টেঙে যায়, নতুন চশমা না হওয়া অবধি একেবারে চোখে দেখতে পাবে না, এই আশঙ্কায়।

অনেক পটিয়ে-পাটিয়ে ওদের সেই বাড়তি চশমাটা আদায় করলাম এবং যখন-তখন ওই চশমাটা পরে বসে থাকতাম।

আসলে উদ্দেশ্যটা ছিল চশমা পরার থেকেও কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে চশমাটা অবলীলায় খুলে ফেলবার ক্ষমতাটা রপ্ত করা।

ছবিতে, রিনাদি ওরফে জয়ন্তী কথা বলার ফাঁকে চশমাটা খুলে ফেলত, (এখন যেন কানে পরিষ্কার পরিচালকের নেপথ্য নির্দেশটা শুনতে পাই—ও কি! সারাক্ষণ একটা ধ্যাবড়া চশমা পরে থাকবে নাকি! তুমি না রোম্যান্টিক নায়িকা, তোমার সুন্দর চোখ দু'টো দেখাও।) এবং ঠোঁটটা অল্প ফাঁক করে চিন্তিত মুখে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে ফাঁক করা মুখে, দাঁতের ওপর মৃদু টোকা মারত। আর বাঁ হাতে ধরা থাকত খুলে ফেলা চশমা। আমার খুব অভিপ্রায় ছিল এই ভঙ্গিটিকে যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করা।

ক্লাসের শিক্ষক শিক্ষিকারাও প্রথম প্রথম একটু অবাক হলেন

—ঋতুপর্ণ! চশমা নিয়েছ তুমি? অল্প মাথা নাড়লাম, যার মানে 'হ্যাঁ'-ও হয়, 'না'-ও হয়। তড়িঘড়ি আমার জায়গাবদল হল সামনের দিকের বেঞ্চে, যাতে ব্ল্যাক বোর্ড দেখতে অসুবিধে না হয়।

এবং, ধীরে ধীরে কেমন করে যেন আমার চশমা পরাটা স্কুলে বেশ প্রকাশ্যভাবেই স্বীকৃত হয়ে গেল।

আমার দৃষ্টিশক্তি বেচারা যে ওই হাই পাওয়ারের সঙ্গে কী লড়াই করেছে কতদিন, আমি জানিও না ভাল করে।

শেষ পর্যন্ত জয়ন্তী বোস-এরই জয় হল। আমার চোখ ক্রমাগত ভুল চশমা পরে দিক্‌ভ্রান্তির সর্বনাশকে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। অবশেষে আমার সত্যি সত্যি চশমা হল।

বাবা-মা চোখের ডাক্তারের কাছে থেকে বাড়ি ফেরার পথে অনেক উদ্বিগ্ন আলোচনা করলেন। কিন্তু জানতেও পারলেন না যে আক্ষরিক অর্থে তাঁদের বড়ছেলের 'চোখের মাথাটা খাবার' পেছনে প্রত্যক্ষ অবদান একজন ছায়ামানবীর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রমশ চশমাবন্দি জীবনটাই জীবন হয়ে গেল।

ঘুমনো আর স্নানের সময়টুকু ছাড়া চশমাই হয়ে গেল নিত্যসঙ্গী।

চশমা আমায় শিখিয়েছিল যে, জয়ন্তী বসু ভুল। কথায় কথায় চশমা খুলে ফেলা যায় না।

চশমা আমায় এ-ও শেখাল যে দোলের দিন রং খেলাটা সবার জীবনে স্বতঃসিদ্ধ নয়। বিশেষ করে সারাক্ষণের চশমা-পরিয়েদের জন্য।

কলেজে উঠে অনেকের দেখাদেখি কন্ট্যাক্ট লেন্স পরার চেষ্টা করেছিলাম দু-একবার। দেখা গেল সে ভীষণ হ্যাপা। আর তখনও এমন চমৎকার Soft lens বেরোয়নি বা বেরলেও অত্যন্ত দুর্মূল্য। ফলে hand lens বেশিক্ষণ চোখে রাখতে পারতাম না,

—মনে হত চোখের ভেতর কাচের টুকরো গোঁজা।

অবশেষে গত বছর মুম্বইয়ে গিয়ে এই ল্যাসিক অপারেশন।

পাঁচ মিনিটের অপারেশন। কোনও ব্যথা নেই, জ্বালা নেই। উঠে দেখলাম আমার চশমাটা পড়ে রয়েছে পাশে—যেন সম্পূর্ণ বাতিল, অপ্রয়োজনীয় একটা বস্তু।

ধীরে ধীরে আবার চশমা ছাড়া জীবন নতুন করে শুরু হল। আগের ফ্রেমগুলোয় এখন পাওয়ার ছাড়া কাচ। চোখ ঠিক হওয়ার বহুদিন পর অবধি চশমা না পরে বেরতে পারতাম না। মনে হত জামাকাপড় পরিনি। এখনও চোখে ঝাপসা দেখলে বা কম আলোয় ছোট লেখা পড়তে অসুবিধে হলে, অজান্তে হাত চলে যায় নাকের কাছে কোনও অদৃশ্য চশমাকে ঠিক করে নেওয়ার জন্য।

ভুল বলেছিলাম প্রথমে।

আমি আজও চশমা পরি। মনে মনে।

১ মার্চ, ২০০৯

আমার জীবনেতিহাসের, আমার বড় হয়ে ওঠার, আমার ছবি-করিয়ে হওয়ার একটা অত্যন্ত উজ্জ্বল সাদা-কালো দিন।

কলকাতার বুকে প্রথম শুরু হল দূরদর্শন। সত্যি কলকাতার গৃহস্থবাড়িতে টিভি সেট তখন হাতেগোনা।

গল্‌ফ ক্লাব রোড-এ আমার মামার বাড়িতে আমি প্রথম টেলিভিশন চলতে দেখেছি—তারও আগে। 1974-এর শেষাশেষি ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট ম্যাচ-এ। সেটা বোধহয় ছিল কলকাতা দূরদর্শনের টেস্ট রান।

ক্রিকেট খেলা নিয়ে আমার তেমন আগ্রহ ছিল না, কিন্তু ওই যে গ্যালারিতে একবার দেখা গেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড় সানগ্লাস-পরা শর্মিলা ঠাকুরের মুখ! খেলা বুঝি না, ওই মুখখানা আবার কখন ফিরে আসবে এক ঝলকের জন্য? সেই দুরুদুরু প্রত্যাশায় শিরদাঁড়া টান করে বসে রইলাম সারাটা দিন।

তারপর ইডেন গার্ডেন্স-এর টেস্ট ম্যাচ শেষ হয়ে গেল একদিন। টেলিভিশনের বাক্সটা ঢাকনা-চাপা সেলাই মেশিন কলের মতো বহুদিন পড়ে রইল মামার বাড়ির বসার ঘরের কোণে।

তারপর প্রায় মাস আটেক ঘুরে সেই ৯ অগাস্ট।

'ভারত ছাড়ো' যদি স্বাধীনতার জন্য মুক্তি আন্দোলন হয়, আমাদের কৈশোরেও ১৯৭৫-এর ৯ অগাস্ট তেমনই একটা স্বাধীনতার প্রারম্ভকাল।

এতদিনে স্রেফ বাড়ির শাসনে হল-এ গিয়ে কোনও সিনেমা দেখার ওপর কড়া বিধিনিষেধ ছিল। ওই ছোট্ট বাক্সটার যে এত অপরিসীম ক্ষমতা কে জানত—যে, এক লহমায় সব নিষেধাজ্ঞা চুরমার হয়ে যাবে।

তখন গোড়ার দিকের দূরদর্শনে শনিবার আর রোববার সন্ধেবেলা সিনেমা দেখানো হত—বাংলা আর হিন্দি। অন্তত বছর দুয়েক আমার কোনও সিনেমা বাদ পড়েনি—এটুকু বেশ মনে আছে।

দূরদর্শন এসে আমায় বুঝিয়ে দিল যে, দুর্গাপুজোর থেকেও বড় উন্মাদনা বুঝি লুকিয়ে আছে অন্য কোথাও—ছায়াছবিতে। মনে আছে, অষ্টমীর দিন (তখন টিভি জুড়ে এত পুজো দেখানোর ধুম ছিল না) 'ঢুলি' দেখানো হচ্ছিল, আর আমি বন্ধুবান্ধব, ঠাকুর দেখা, ঢাকের আওয়াজ, আলোর রোশনাই সব ফেলে চুপটি করে ঢুলি দেখলাম।

তখনও জানি না—মন, তাকে চেতন বা অবচেতন বলব কি না বুঝতে পারি না, আমার কানের কাছে ক্রমাগত ফিসফিস করছে—এটাই তোর ভবিতব্য, দূরদর্শন আমাকে প্রথম 'অপরাজিত' দেখিয়েছে, 'চারুলতা' দেখিয়েছে, 'অযান্ত্রিক' দেখিয়েছে, সংবাদ-এর বিরতি-সহ। দূরদর্শন আমাকে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেওয়া সত্যজিতের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দেখিয়েছে। দিল্লি আন্তর্জাতিক উৎসবে একই সঙ্গে সত্যজিৎ, আন্তিনিওনি, কুরোসাওয়া, ইলিয়া কাজান একসঙ্গে, এক আলোচনা-চক্রে বসে কথা বলছেন, দেখিয়েছে। ছবি-করিয়ে হিসেবে আমার সত্যিই কোনও শিক্ষক নেই—যদি কেউ থাকে তা নিশ্চয়ই কলকাতার দূরদর্শন।

এখন কেব্‌ল-এর দৌলতে, শতাধিক চ্যানেল-এর দৌরাত্ম্যে দূরদর্শন কোণঠাসা, ম্লানমুখী, ম্যাড়ম্যাড়ে। কেবল যখন কেব্‌ল অপারেটরদের ওখানে পাওয়ার কাট হয়, বাকি সবক'টা চ্যানেল ঝিরঝির করতে থাকে, সেই ম্লানমুখী দূরদর্শন তখনও অবিচলিত চিরন্তনতায় জেগে থাকে চোখের সামনে।

আমার সেই কৈশোরের স্বাধীনতার অগ্রদূত। আমার সিনেমার শিক্ষাগুরু।

৯ আগস্ট, ২০০৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথ তো বটেই, ভাষাশিক্ষার গুরু হিসেবে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার বা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বা রাজশেখর বসু আমার কাছে যেমন, 'মহিষাসুরমর্দিনী'-ও সেরকমই একটা নাম। কারণ আমাদের বাংলা ভাষা যে অনেক তৎসম শব্দ নিয়ে তৈরি হয়েছে, আর তার আশ্চর্য অনুরণন যে আমাদের এক বিরাট সম্পদ, আর যে সুমহান ঐতিহ্য ও প্রবহমানতার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা এগিয়ে এসেছে তার স্বাক্ষর ওই শব্দগুলোর ঝংকারের পরতে পরতে রয়েছে—এসবের সঙ্গে হাতে ধরে সাক্ষাৎ পরিচয় করে দিয়েছে যে-অনুষ্ঠান, তার নাম 'মহিষাসুরমর্দিনী'। ছোটবেলায়, তখনও আমরা বঙ্কিমচন্দ্র পড়িনি, রাজশেখর বসুও না, কিন্তু তৎসম শব্দের আশ্চর্য মূর্ছনা, সংস্কৃত ভাষা আর বাংলা ভাষা কোথায় একাকার হয়ে যেতে পারে এবং কোথায় আলাদা হতে পারে, কোথায় গদ্য মিশে যেতে পারে গানে, কোথায় গান থেকে বেরিয়ে এসে আবার গদ্যের ভঙ্গিতে এগোতে পারে এবং কখন কোনও অনাড়ষ্ট ভঙ্গিতে একটা সহজ গ্রন্থনা মন্ত্রোচ্চারণ হয়ে যায়—তা অন্তরের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে এই বেতার-অনুষ্ঠান। তখন এসব বুঝতাম না। বড় হয়ে আস্তে আস্তে বিশ্লেষণ দিয়ে, যুক্তি দিয়ে বা খুঁটিয়ে শুনে বুঝতে শিখেছি। কিন্তু কিচ্ছু না-বুঝলেও মনের ওপর মার্গ-সংগীতের যেমন একটা অদ্ভুত ঘোর থাকে, তারকভৃষ্টি-র ছবি দেখলে যেমন অনেক কিছু বুঝতে পারি না কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে একটা ছাপ ফেলে যায়, কীভাবে যে ফেলে যায় সেটাও বুঝতে পারি না—প্রায় সেরকমভাবেই 'মহিষাসুরমর্দিনী' আমাদের মধ্যে একটা বিরাট ভাষাসম্ভারের মাধুর্য ও গাম্ভীর্যের ইশারা রেখে চলে গিয়েছে, যারে যা পল্লবিত হয়ে অনেককে হয়তো নিয়ে গেছে শব্দের কাছে, সাহিত্যের কাছে, সংলাপের কাছে।

শরৎকালে একটা যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধটা রাম আর রাবণের মধ্যে। সেই অকালবোধনের ষষ্ঠীর দিন থেকে বিজয়া দশমীর রাবণকে বধ করার দিনটা কী করে যেন বাঙালির মনে দুর্গার মহিষাসুর বিজয়ের সঙ্গে মিলেমিশে গেল। প্রায় যেন—অষ্টমী, নবমী, দশমী তিনদিন যুদ্ধটা হল। দশমীর দিন মহিষাসুর পরাস্ত হলেন। এরকম একটা ছবি আমরা নিজেদের মনের মধ্যে এঁকে নিয়েছি। আর কখনও সচেতনভাবে ভাবার চেষ্টা করিনি—এটার সঙ্গে আসল পুরাণটার কোন যোগ নেই। একটা মহাকাব্যের গল্প আর একটা পুরাণ মিলেমিশে গিয়েছে। এর পিছনে বোধহয় 'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠানটার একটা বিরাট অবদান আছে। অনুষ্ঠানটা হয় মহালয়া-র দিনে। সেই দিনটার সঙ্গে কিন্তু দেবীপক্ষের কোনো যোগ নেই। সেটা পিতৃপক্ষের শেষ দিন এবং সেদিনের সঙ্গে মহিষাসুর বধেরও তেমন কোনও যোগ নেই। কিন্তু কেবলমাত্র মহালয়ার দিন সকালবেলা অনুষ্ঠানটা হয় বলে, অনুষ্ঠানটা প্রায় তিথিটার সঙ্গে সমার্থক হয়ে গিয়েছে। আমরা বলি, এখন আমরা রেডিও-য় মহালয়া শুনব। মহালয়াটা যেন একটা রেডিও-য় শোনার মতো অনুষ্ঠান, সেটা যেন একটা দিন নয়, সেটা যেন একটা আলাদা তিথি নয়, সেটা পিতৃপুরুষদের মহান আলোয় ফিরে যাওয়ার দিন নয়। এই কথাগুলো আমরা জানার খুব প্রয়োজন বোধ করি না, এবং না-জানতে পেরে যে আমাদের খুব একটা অসুবিধাও হয় না। এক-একটা সংস্কৃতি তো এক-একটা প্রজন্মের কাছে এক-একরকম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবে বেঁচে থাকে। আমাদের কাছে দুর্গাপুজো শুরু হয় মহিষাসুরমর্দিনী দিয়ে।

ঠিক ভোর চারটে থেকে ভোর ছ'টা অবধি যে সময়টা, ওই দু'ঘণ্টার মধ্যে একটা নাটক অভিনীত হয়—সে নাটকটা কোথায় হয়, যুদ্ধটা কোথায় ঘটে, আমরা জানি না। আকাশে হয় কি? বা আরও ভাল করে বললে, অন্তরীক্ষে? কারণ যুদ্ধের ধারাবিবরণীটা তো আমাদের কাছে আসে ইথারের মাধ্যমে। যুদ্ধটা যে আসলে হয় না, সত্যি সত্যি কোথাও ওই অস্ত্রের ঝনঝনা ঘনিয়ে ওঠে না, মা দুর্গা যে ভয়ংকর মহিষাসুরের দিকে রোষকষায়িত লোচনে সিংহের পিঠে চেপে ছুটে যান না, সে কথা ওই সময় মনে থাকে না একদম। এমনকী একটা টেনশন হতে থাকে। সব জানি, শুভর সঙ্গে অশুভের এই যুদ্ধে কার জয় অবশ্যম্ভাবী তা-ও, কিন্তু বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের অবিশ্বাস্য স্বরক্ষেপণের নৈপুণ্যে যেন স্পষ্ট বুঝতে পারি যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি, ওঠাপড়া, এক একবার মনে হয় এই বুঝি অকল্যাণ গ্রাস করল শ্রী-কে, তারপরেই আশ্বস্ত হই, মঙ্গল তার পূর্ণ বিভায় প্রকাশিত হয়ে বিনাশ করছে অন্ধকারকে। বাণীকুমারের অসামান্য স্ক্রিপ্ট এইসব জায়গায় এমন অব্যর্থভাবে তৎসম শব্দের ধ্বনিকে ব্যবহার করে, আদত সংস্কৃতের সঙ্গে সংস্কৃত-উপম বাংলাকে এমন অনায়াস দক্ষতায় মিলিয়ে দেয়, পৌরাণিক মহারণের ব্যাপ্তি ও গাম্ভীর্য তার সমস্ত অস্ত্রনিনাদ-সহ ফুটে ওঠে। আর পঙ্কজকুমার মল্লিকের তুলনাহীন সুরারোপ এই চিরচেনা ও চিরনতুন কাহিণীটিকে বয়ে নিয়ে যায় এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে।

ছোটবেলা থেকে প্রত্যেক বছর ওই সময়টায় নিয়ম করে ওই অনুষ্ঠানটার মধ্যে দিয়ে যাওয়া—বাঙালির কাছে একটা রিচুয়াল। সেইটা আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জুড়ে গিয়েছে। দুর্গাপুজোর প্রথম মন্ত্রোচ্চারণ শুরু হয় 'মহিষাসুরমর্দিনী'-র ঘোষণাটা দিয়ে। এখন মনে করতে পারি না, কবে থেকে আমি 'মহিষাসুরমর্দিনী' শুনছি। যেন বাঙালি হয়ে জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই এটা মিশে গিয়েছে আমার রক্তে। যেহেতু অষ্টমী তিথি প্রত্যেক বছর একসময় পড়ে না, সন্ধিপুজোর সময় বদলে যায়, কিন্তু মহিষাসুরমর্দিনী মহালয়ার দিন ঠিক একই সময় প্রচারিত হয়; এত বছরে দুর্গাপুজোর অষ্টমীর মন্ত্রটা আমরা ততখানি জানি না, যতখানি আমরা মহালয়ার মহিষাসুরমর্দিনী অনুষ্ঠানটার কথা জানি, তার সুরগুলো জানি। আমরা আন্দাজ করতে পারি, এরপরই এই গানটা আসবে, কিন্তু তারপরেই ওটা আমাদের শুনতে ইচ্ছে করে। এখন ওটা ক্যাসেটে পাওয়া যায়। সিডি-তে পাওয়া যায়। আমরা যে কোনও সময়ে চালিয়ে শুনে নিতে পারি। তবু ওটা আমাদের কাছে রিচুয়ালিস্টিক : ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে না-শুনলে অনুভূতিটা যেন সর্বাঙ্গীণ হয় না, সম্পূর্ণ হয় না।

অনুষ্ঠানটা আরম্ভ হয় একটা শরতের বর্ণনা দিয়ে। আমাদের কাছে শরৎকালের রচনা লেখার সময় থেকে ওই 'আশ্বিনের শারদপ্রাতে' কথাটা এখনও অবধি যেন একটা নির্দিষ্ট সময়ের সূচনা করে দিয়েছে। একটা কাল এবং একটা বিশেষ ঘটনার জন্য আমাদের প্রস্তুত করে দিয়েছে। আমি ভাবতে পারি না এমন একটা দুর্গাপুজো, যেটায় মহিষাসুরমর্দিনী মহালয়ার দিন হল না! সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুর্গাপুজো কেমন হবে আমার কাছে? বাঙালির কাছে? সেই দুর্গাপুজোটা অন্য সব দুর্গাপুজোর মতোই হবে কি? এই যে একটা ধর্মীয় নয়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিয়ে একটা জাতির শ্রেষ্ঠ পুজো শুরু হচ্ছে, এরকম ঘটনা আর পৃথিবীর কোথাও ঘটে কি? এই সূত্র ধরেই ভাবতে ইচ্ছে করে, দুর্গাপুজোর বোধহয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বাইরে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে ওঠার বিরাট সম্ভাবনা আছে।

ছোটবেলায় বাবা আমায় ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যেতেন। আমি খুব ঠাকুর দেখতে ভালবাসতাম এবং এখন বুঝতে পারি, প্রায় একটা শিল্পীর চোখ দিয়ে দেখতে ভালবাসতাম। যে ঠাকুরটাই দেখতাম, মনে মনে চট করে গুনতাম দশটা হাত কি না! আমি ভাবতাম, কুমোর নিশ্চয় একবার না একবার ভুল করবেন এবং একটা হাত কম গড়বেন। আর আমি ঠিক খুঁজে বের করতে পারব, কোনও একটা দুর্গার ন'টা হাত! এইভাবে বছরের পর বছর আমি হতাশ হতে হতেও আনন্দিত হয়ে ফিরে আসতাম। ফিরে এলেই আমার ঠাকুমা জিগ্যেস করতেন, 'ভাই ক'টা ঠাকুর দেখলে?' আমি বলতাম, এতগুলো ঠাকুর দেখেছি, তার মধ্যে এতগুলো ঠাকুর দেখতে ভাল, এতগুলো ঠাকুর মোটামুটি, আর এতগুলো ঠাকুর দেখতে বিচ্ছিরি। ঠাকুমা অবধারিত ভাবে বলতেন, ছি ভাই, ঠাকুরকে বিচ্ছিরি দেখতে বলতে নেই। এই যে ঠাকুরকে বিচ্ছিরি বলতে নেই, ওখানে যে একটা অরূপকে রূপ দেওয়া হচ্ছে, মনের দেউলের জ্যোতির্ময়ী বিগ্রহকে দেওয়া হচ্ছে কল্পনা ও ভক্তি-ভালবাসা মিলিয়ে এক অপরূপ অবয়ব—ঠাকুমা ছাড়া সে কথা আমাকে শিখিয়েছে মহিষাসুরমর্দিনী। কল্পনা-কাহিনিকে এতখানি সত্যি করে উপস্থাপিত করতে গেলে, আর সেই অনুভূতিকে বয়স-ব্যক্তিত্ব নির্বিশেষে প্রত্যেক শ্রোতার মনে সঞ্চারিত করতে গেলে, একটা ধ্যানমূর্তির এমন অভাবনীয় শিল্পরূপ নির্মাণ করতে গেলে, কতটা প্রতিভা আর কতটা প্রণাম একত্রিত করতে হয়, ভাবলে তল পাওয়া যায় না।

আর একটু বড় হয়ে খুব মন দিয়ে শুনতাম দেবতাদের অস্ত্রদানের জায়গাটা। দশপ্রহরণধারিণীকে সাজানো হচ্ছে কীভাবে? শুনতাম, কুবের দিলেন রত্নহার, ব্রহ্মা দিলেন অক্ষমালা আর কমণ্ডলু। দুর্গাপুজোর পরে যখন ভাসান হয়ে যেত, ওই টিনের অস্ত্রগুলো আমাদের পাড়ার ছেলেরা, আমার বন্ধুরা, আমরা সব নিয়ে নিতাম একটা একটা করে। আমি খুব খুঁজতাম, কিন্তু কোনওদিন অক্ষমালা, কমণ্ডলু খুঁজে পাইনি। তন্নতন্ন করে খুঁজতাম, নিশ্চিত ছিলাম ওগুলো আছেই, মহালয়ার প্রোগ্রামে শুনেছি যে! শুধু ভয়ানক অস্ত্রগুলো পাওয়া যাচ্ছে, আর অমন সুন্দর জিনিসগুলো নেই! আমার আজও মনে হয় এই রত্নহার, এই অক্ষমালা, কমণ্ডলু—যেগুলো দিয়ে একটা সৌন্দর্য, শান্তি, শ্রী সম্পূর্ণ হয়—সেটা আমাদের রিচুয়ালের ভেতর প্রোথিত হয়ে থাকে, সেখান থেকে কীভাবে আমরা সরে এলাম! যুদ্ধে যাওয়ার সময়ও আমাদের সংস্কৃতি এই সৌন্দর্যের প্রয়োজনকে একবারের জন্যও ভোলেনি! মনে রেখেছে, অমঙ্গলের বিরুদ্ধে জিততে গেলে অস্ত্র যতটা জরুরি—সুষমা, লালিত্য, লাবণ্য তেমনই অপরিহার্য। আজ আমরা কেউ আর সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অক্ষমালা, কমণ্ডলুটার খোঁজ করি না!

আমি 'হীরের আংটি' বলে একটা ছবি করেছিলাম বাচ্চাদের জন্য। ওটা আমার প্রথম ছবি। ওই ছবিটা করা অনেকটাই আমার নিজের ছেলেবেলায় ফেরা। ছবির পুরো টাইটেল-সিকোয়েন্সটার পিছনে মহিষাসুরমর্দিনীর ধারাভাষ্যটা চলে। সেটা যেন আমার ছেলেবেলায় প্রবেশ করার একটা নকশা-করা সিংহদুয়ার। প্রয়োগটা কিন্তু আমি প্রথম করিনি। চিদানন্দ দাশগুপ্তের 'বিলেতফেরত' ছবিতে 'রক্ত' বলে একটা গল্প ছিল। সেখানে প্রথম মহিষাসুরমর্দিনী নেপথ্য-আবহ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেটা কোথাও আমার মনের মধ্যে এমনভাবে দাগ কেটে ছিল, আমি যখন প্রথম ছবি করি, এই শব্দানুষঙ্গটা ফিরিয়ে আনবার একটা তাগিদ ছিল। তাছাড়া ছিল আমার ওই শৈশবে ঢোকার সুড়ঙ্গটা। যেটা দিয়ে আমি ছেলেবেলার ছবিতে ছোটদের মতন করে ঢুকে যেতে পারব।

আমাকে অনেক সময় যখন বলা হয় 'ঋতুপর্ণ, মিউজিক ভিডিও করো না কেন', আমার ইচ্ছে হয়েছে মহিষাসুরমর্দিনী নিয়ে মিউজিক ভিডিও করতে! যখন টেলিভিশনে দেখি, ওই থিমের অনুষ্ঠানে কেউ একজন দুর্গা সাজেন, কেউ অসুর সাজেন, আমার বারবার মনে হয় এর চেয়ে কত অন্যরকম ভাবে এটা করা যেত! মহিষাসুরমর্দিনী এমন একটি অনুষ্ঠান—যা দিকে দিকে নানান রকমের মানুষ, নানান বয়সের মানুষ, নানান অবস্থানের মানুষ, নানান মনোবৃত্তির মানুষ একইসঙ্গে উঠে শুনতে শুরু করেন। একদম একই সময়ে ভোরে উঠে, সমস্ত মানুষ রেডিওটা চালিয়ে দেন। আমার আমেরিকায় থাকা বন্ধুও যে সময়ে মহিলয়া শোনে, আমার গলির টালির চালের দরিদ্র মানুষটিও সেই সময়েই সমান মনোযোগ নিয়ে এই অনুষ্ঠানে ডুবে যায়। এই আশ্চর্য যোগাযোগটাই, এই জগৎজোড়া বাঙালিকে এক সুতোয় বাঁধার আশ্চর্য সত্যিটাই—এই অনুষ্ঠানটার একটা চিত্ররূপ হতে পারত। এবং অসামান্য চিত্ররূপ হতে পারত। যেটার সঙ্গে কিন্তু কারও মেক-আপ নিয়ে পরচুলা লাগিয়ে ঠাকুর-দেবতা সেজে অভিনয় করার দরকার নেই। মহিষাসুরমর্দিনী শোনার অনুভূতিটা তো একটা তীব্র অনুভূতি! এটা এমনভাবে আমাদের ছেয়ে রাখে, এমনভাবে আমাদের একত্রিত করতে পারে; সব অর্থেই এই যে রাত্রি কেটে ভোর হওয়ার অকলুষ অনুভূতিটা—আমার মনে হয় একটা মিউজিক ভিডিওই কেবলমাত্র পারে ওই সময়, ওই আলো, ওই মুডটাকে ওই অনুষ্ঠানটার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে, অনুভূতিটা ফুটিয়ে তুলতে।

এত কিছু নিয়ে নিরীক্ষা এখন চলছে, আস্তে আস্তে মহিষাসুরমর্দিনী নিয়েও হয়তো অনেক কাজ হবে। আমার কিন্তু এই বেতার-অনুষ্ঠানকে অবিকৃত অবস্থাতেই পেতে ভাল লাগে। হয়তো আমি কিছুটা পুরনোপন্থী। আসলে এটা আমার শৈশবের স্মৃতির, এবং আমার বাঙালিয়ানার ধারণার এতখানি জুড়ে আছে—এর কোনও পরিবর্তন আমার কাছে নিজের মা'কে অদ্ভুত অপরিচিত পোশাকে দেখার মতোই ঠেকবে। আমার মনে আছে, যখন বাগদাদে বম্বিং হয়েছিল—তাতে নিশ্চয়ই একটা সাংঘাতিক নিষ্ঠুরতা ছিল, অনেক প্রাণ গিয়েছিল—কিন্তু আমার প্রথম যেটা মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিল : এই আঘাতে আমার শৈশবের একটা অংশ মরে গেল। সেই যে হারুণ-অল-রশিদের বাগদাদ, রূপকথায় পড়া আশ্চর্য নগরী, যেখানে সবই ঘটতে পারে, সব অলীক অদ্ভুত জাদুই যেখানে সত্যি হয়ে ওঠে, ছোট্ট ছেলের সব কল্পনাই যেখানে সত্যি হয়ে ওঠার প্রশ্রয় পায়, সেই বাগদাদটা নষ্ট হয়ে গেল। 'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠানটার সম্পর্কে আমার ওইরকম একটা অসম্ভব প্রোটেকটিভ ইনস্টিংক্ট কাজ করে। এটা যেন এভাবেই অবিকৃত থেকে আমার শৈশবটাকে আমার সঙ্গে বহন করে নিয়ে যায়। বেতারের শ্রোতারা অন্ধ। তাঁরা শ্রবণের মাধ্যমেই দেখেন। মহিষাসুরমর্দিনী শোনার সময় আমরাও অন্ধ। একটা অরূপের রূপবর্ণনার মধ্যে দিয়ে আমরা সব দেখতে পাই। আমরা যেন সেই অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতন, এবং আমাদের কাছে বাণীকুমার-বীরেন্দ্রকৃষ্ণ-পঙ্কজকুমারের মিলিত প্রতিভা সেই চিরকালীন সঞ্জয়। যাঁরা অপার মহিমাময় যুদ্ধটা বছর-বছর প্রত্যেক ভোরে নিয়ম করে উঠে আমাদের কাছে যত্ন করে বর্ণনা করেন।

২০ সেপ্টেম্বর, ২০০৯

তখন আমি ক্লাস থ্রি ফোর-এ পড়ি। ইস্কুল যাওয়ার সময় ইস্কুল যাওয়ার বাস আসত আমার বাড়ির সামনে বড় রাস্তায়।

আমরা নেপালদার দোকানের ছায়ায় দাঁড়াতাম সব ছেলেমেয়েরা—বাস এলে গুটগুট করে, কেউ হাসিমুখে, কেউ বা মলিন ভঙ্গিতে উঠে পড়তাম সেই বাসে।

তখন সাউথ পয়েন্ট ইস্কুল দরিদ্র কৈশোর ছাড়িয়ে মোটামুটি সম্পন্ন তারুণ্যে পৌঁছেছে। এখনকার মতো বড়লোক হয়নি। আমাদের ইস্কুল-বাসগুলো বেশ সাধারণ, প্রায় ভাঙাচোরা কয়েকটা গাড়ি। নেভি ব্লু রং-এর ওপর সাদা দিয়ে ইস্কুলের নাম লেখা।

নানা রুটের বাসের আবার নানা রং ছিল—রেড, ব্লু, ইয়েলো, গ্রিন। আমাদেরটা ইয়েলো।

ফেরার পথে বাসটা ফিরত একটু ঘুর রাস্তায়। গল্‌ফ ক্লাব রোড-এর দিকে ঘোরবার মুখেই একটা বিরাট কবরখানা আছে। তার সামনেই নামিয়ে দিত আমাদের। ভিতর দিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে আসতাম আমরা।

সবচেয়ে সহজ রাস্তা ছিল কবরখানার মধ্যে দিয়ে। কবরখানাটি ছোটখাটো, শান্ত, নির্জন।

মাঝখানটাতে একটা বিশাল বটগাছ ছিল। আমরা যখন বাড়ি ফিরতাম, তখন সব পাখিদেরও বাড়ি ফেরার সময়। সারা কবরখানাটা পাখির কিচমিচে ভরে থাকত। আর ভরে থাকত নানা গাছ থেকে ঝরে পড়া অজস্র ফুলের গন্ধে।

কবরখানার সঠিক তাৎপর্যের সঙ্গে সেই বয়সে পরিচয় থাকার কথা নয়। আমার মনে সেই অত্ত বড় জায়গাটা ছিল 'সেলফিশ জায়ান্ট'-এর বাগানের মতো। কারণ মাঝে মাঝে অনেক খালি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জায়গা পড়ে থাকা সত্ত্বেও ছেলের দল ফুটবল-ক্রিকেট খেলত না বিশেষ। জানি না, তাদের বাড়ি থেকে বারণ করা ছিল বোধহয়।

বিকেলবেলার শান্ত আলোয় কয়েকখানা কবর, ইতস্তত ছড়ানো। ক্রুশগুলোর গায়ে শ্যাওলা জমেছে অনেক বছরের। অনেক নির্ভীক প্রেমিক-প্রেমিকা সেই কবরের ওপর বসে গল্প করত। চিনেবাদাম খেত। বাদামের খোসা পড়ত মাটিতে—মিশে যেত সেই ঝরা ফুলের সুবাসের সঙ্গে।

আবার সন্ধে হলেই নিঝুম হয়ে আসত কবরখানার মাঠ। বাঙ্গুর হাতপাতাল আর টালিগঞ্জ রসা রোড-এর সারি সারি বাড়িগুলোর জানলা দিয়ে চুঁইয়ে এসে পড়া আলো—তাতেই আলো-আঁধারি হয়ে থাকত গোটা জায়গাটা।

কবরখানা মানে কী জানতাম—কিন্তু তার সঙ্গে মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগটা কখনও বুঝতে পারিনি। চিতা নেই। ধোঁয়া নেই। কান্নাকাটি নেই, ভিড় নেই, ফুলের খাট নেই—মৃত্যুর কোনও অনুষঙ্গই নেই। কেবল পড়ে আছে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে শ্যাওলা মাখানো ক্রুশ বুকে ধরে নানা মৃত্যুর স্মৃতি। সেদিন ইস্কুল থেকে ফিরছি যথারীতি। দেখি কবরখানার মধ্যে একটা ছোট জটলা। আর দাঁড়িয়ে আছে একটা শূন্য কাচ-ঢাকা গাড়ি। কাচের গাড়ি আগে দেখিনি, সেই বয়সে—নতুন ঠেকল, কিন্তু মানে বুঝতে পারলুম না।

একটু এগিয়ে দেখি বিলাপরত একটি দল। তার মধ্যে আকাশী নীল শাড়ি পরা, দুই বিনুনি বাঁধা এক মহিলা মাটিতে বসে পড়ে সমানে কাঁদছেন,

—কোথায় তুই আমার বুকে মাটি দিবি,

তা না আমি তোর বুকে...

বাক্য শেষ হচ্ছে না, গলা জড়িয়ে যাচ্ছে কান্নায়। ওরকম চেহারা সাধারণত ইস্কুলের আন্টিদের দেখেছি। ফলে চট করে ইনি যে একজন মা সেটা বুঝতে পারিনি।

আমার বন্ধু ভ্রমরের দাদু যেতেন আমাদের আনতে। তিনি বললেন

—ওর ছেলে মরে গেছে, তাই কাঁদছে। চল বাড়ি চল।

সেই আমার প্রথম মৃত্যু দেখা। তারপর দিন একই রাস্তায় স্কুল থেকে ফিরলাম। শান্ত কবরখানা। কেবল ঝকঝকে একটা কাঠের ক্রুশে সদ্যপ্রয়াতের স্মৃতি।

জানি না সেই নীল শাড়ি, দুই বিনুনি বারবার করে ফিরে আসেন কি না সেই স্মৃতির সামনে দাঁড়াতে।

জানি না তাঁর অনেক কান্না বাকি রয়ে গেল কি না জীবনভর। হয়তো বা পৃথিবীর সেই আশ্চর্যতম ধন্বন্তরি তাঁর চিকিৎসা করছেন—যাঁকে আমরা সময় বলি।

সেই সময় সত্যিই বলে দেয় যে

—দ্যাখো বাপু, এই যে জীবন নামক পাঠশালাটি, তার সব—রেড, গ্রিন, ইয়েলো, ব্লু—সব বাসই একদিন এখানে থামবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যথারীতি পাখিগুলো বাড়ি ফিরছে নিজেদের মতো। আর টুপটুপ করে গাছ থেকে ঝরে পড়ছে অজস্র বকুল।

দেখলেন, লেখবার কথা ছিল শ্মশান। সেই আমি গরুর রচনা লিখে ফেললাম।

১৮ অক্টবর, ২০০৯

কালীঘাটের রাস্তাটার সঙ্গে আমার প্রথম বন্ধুত্ব হয়েছিল আমার চোদ্দো বছর বয়সে। আমার তখন মাধ্যমিক পরীক্ষা এগিয়ে আসছে। শিবপ্রসাদ মুখার্জি, ইস্কুলের ডাকনাম শিববাবু, আমাদের কেমিস্ট্রি শিক্ষক, থাকতেন কালীঘাটের কাছে—ভবানীপুরে। তাঁর কাছে বছরখানেক পড়তে যেতাম—সকালবেলা।

ফেরার পথে কোনও সহপাঠীর (এখন আর নাম মনে পড়ে না) ইচ্ছে বা পরীক্ষাজনিত আশংকা আমাকে প্রথম টেনে নিয়ে গিয়েছিল কালীঘাটের মন্দিরে—মায়ের নিশ্চিত বরাভয়ের জন্য।

পরীক্ষা নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকলেও কাতরভাবে কখনও ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়ার কথা আমার সেই বয়সে কখনও সচেতনভাবে মনে হয়নি। তবু আমি তার সঙ্গী হয়েছিলাম কয়েকদিন।

সেই আমার কালীঘাট যাওয়া শুরু। তারপর পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। লম্বা ছুটি, ইস্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে আর নিয়মিত দেখা হয় না।

আমার প্রিয় দুই বন্ধু রাহুল আর হিরঞ্জিৎ। যারা কোনওভাবেই আমার প্রথম কালীঘাট যাত্রায় আমার অনুগামী ছিল না, তাদের সঙ্গে আমার নতুন করে সাপ্তাহিক তীর্থপর্যটন শুরু হল।

সেটার আয়ু ছিল প্রায় বারো বছর। প্রতি শনিবার সকালে। রোদ, বৃষ্টি উপেক্ষা করে। কোনও ঐশ্বরিক টানে নয়, কেবল বন্ধুত্বের বন্ধনে।

পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর যথারীতি আমরা ছিটকে গিয়েছি যে যার মতো। রাহুল সেন্ট জেভিয়ার্স, হিরঞ্জিৎ রয়ে গিয়েছে সাইথ পয়েন্ট স্কুলেই বারো ক্লাস পড়তে, আর আমার এগারো-বারো ক্লাস কাটছে মৌলানা আজাদ কলেজে—এন্তার কলেজ কেটে সিনেমা দেখে। অতএব, নিয়মিতভাবে আমাদের তিনজনের স্বতঃস্ফূর্ত সাক্ষাতের আর কোনও তেমন প্রত্যক্ষ সুযোগ নেই।

সেই আমাদের শুরু হল সপ্তাহান্তের সকালের দেখা হওয়া। আমি বাড়ি থেকে হেঁটে রাহুলের বাড়ি যেতাম, লেক গার্ডেন্স, সেখান থেকে লেক মার্কেটের কাছে, হিরু'কে (হিরঞ্জিৎকে সারাজীবন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা ওই নামে ডেকে এসেছি ওর তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও, কারণ আমাদের বাড়ির ধোপার নাম ছিল হিরু) ডেকে নামানো হত ওদের তিনতলা বাড়ি থেকে। তারপর আমাদের কালীঘাট যাত্রা।

ওই বারো বছর কালীঘাটের রাস্তার সব দোকানি আমাদের চিনতেন, সব পান্ডারা মুখ-চেনা হয়ে গিয়েছিলেন। মন্দির চত্বরের মধ্যে একটা ফুল-মিষ্টির দোকান ছিল। সেটা ছিল আমাদের চটি খোলার জায়গা। তারপর কাদা পায়ে সমস্ত মন্দিরটা ঘুরে, বিগ্রহকে প্রণাম করে, চটিজোড়া ফেরত নিয়ে, আবার দিব্যি হ্যাহ্যা-হিহি করতে করতে হেঁটে বাড়ি ফিরতাম।

ওই মন্দির চত্বরে আমি প্রথম হাড়িকাঠ দেখেছি, সামনে ভূলুণ্ঠিত রক্তাক্ত ছাগমুণ্ড—আমার রাজর্ষি-র পাঠ আরও তীব্র হয়েছে। বিশালাকায় আয়তলোচনা, প্রায় জিহ্বাসর্বস্ব বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে 'আনন্দমঠ' মনে পড়েছে বারবার। আমার, মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে, তার ফুলমালার ভক্তিসজ্জা বাদ দিয়ে, মনে হয়েছে এর থেকে ভাল গ্র্যাফিক আর্টের নিদর্শন আর দেখিনি।

পরেও, অন্য আলোচনায় যখন নানা আনাড়ি তর্ক হত যে আমাদের দেশের শিল্প-অলংকরণের মধ্যে মিনিমালিজম নেই—তখন বারবার কালীঘাটের গ্র্যাফিক কালীমূর্তির কথা বলে তর্ক করেছি।

স্কুল-কলেজ শেষ করে সবাই চাকরিজীবনে ঢুকলাম। রাহুল স্টেট ব্যাঙ্ক-এ, হিরু এম এন দস্তুর-এ, এবং আমি বিজ্ঞাপনে।

তবু আমাদের সাপ্তাহিক কালীঘাট যাওয়া যথাসম্ভব অটুট রইল। ইউনিভার্সিটি-তে যখন আমি অর্থনীতি পড়ি, মার্কস আমাদের স্পেশাল পেপার—অথচ আমি নিয়ম করে প্রতি শনিবার কালীঘাটে যাই—এই আত্মদ্বন্দ্ব আমার নিজের কখনও হয়নি, আর এটা নিয়ে লজ্জা পাওয়ার কথাও মনে হয়নি আমার যাবতীয় ঘোর-নাস্তিক বন্ধুদের সামনে।

পরে, যখন আমাকে অফিসের কাজে ঘন-ঘন বাইরে যেতে হত, তখন প্রথম ছেদ পড়ল আমাদের কালীঘাট যাত্রায়। তারপর একসময় ঠিক যেমন শৈশব থেকে তারুণ্য, এবং স্বাধীন প্রাণোজ্জ্বল তারুণ্যকে তাড়া করে মধ্যকুড়ির কর্মোদ্যোগী যৌবন—সেই নিয়মেই কালীঘাটের রাস্তাটা সপ্তাহ থেকে মাস, প্রতি মাস থেকে তিনমাস, তারপর বছরে কোনও একদিন; যেদিন আমরা তিনবন্ধুই কোনও এক তীব্র ব্যাকুলতায় একসঙ্গে হতে চেয়েছি—কালীঘাটের মন্দির আমাদের একত্র অভিযানের হাতছানি দিয়েছে।

গত ষোলো বছর আমি কালীঘাট মন্দিরে যাইনি। চরমতম অসুস্থতার সময়ও নয়, বাবার জীবনকামনায় নয়, নিজের ছবির সাফল্যে বা অসাফল্যে—কোনওদিনই নয়।

কালীঘাটের রাস্তায় দোকানে গিয়ে জিনিস কিনেছি, মন্দিরের ঠিক উল্টোদিকের বাড়ির বারান্দা থেকে শট নিয়েছি কোনও ছবির—কিন্তু মন্দিরে ঢোকা হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালীঘাট মন্দিরের ত্রিভুজাকার চূড়াটা আমাদের তিনবন্ধুর একান্ত আপনার জায়গা হয়েই রয়ে গিয়েছে।

মা কালী সেই বন্ধুত্বের অংশীদার হতেই পারতেন। হয়তো তাঁর সেটা ইচ্ছে ছিল না। বা, আমরা তাঁকে দলে নিইনি।

৭ নভেম্বর ২০১০

সাত সকালে চান করে, ছোট্ট একটা চিরকুটে নাম, বাবার নাম, ঠিকানা, আর গোত্র লিখে পাড়ার পুজোর ঠাকুরমশাইকে দিয়ে আসতে হত সন্দেশের বাক্সের গায়ে রবার ব্যান্ড দিয়ে আটকে।

আমার স্কুলে সরস্বতী পুজো হত না, আমাদের সময়ে। এখন হয় কি না, জানি না।

বাড়িতেও সরস্বতী পুজো শুরু হয়েছে অনেক পর থেকে।

ফলে পাড়ার বারোয়ারি পুজো ছাড়া অন্য গতি ছিল না কোনও।

তাই মা'র নির্দেশমতো মিষ্টি-ফুল, আইডেন্টিটি কার্ড-এর মতো চিরকুটে সংক্ষিপ্ত বংশলতিকা, বইখাতার সঙ্গে জমা পড়ত প্রতিমার পায়ের কাছে। বারোয়ারি পুজোয় সবাই চাইত নিজস্ব বিদ্যাগত দুর্বলতাটুকু অন্যদের থেকে আড়াল করতে। ফলে নিতান্ত যে বিষয়গুলো বাগ্‌দেবীর কৃপাধন্য না-হলে পরীক্ষার সময় শিক্ষকদের কোনও কৃপাই লাভ করবে না, সেগুলোই আসত ফুল-মিষ্টির সঙ্গে।

তবু একটা সামান্য সরেজমিনে দেখা যেত যে, জমা খাতা-বইয়ের বেশিরভাগই অঙ্কের। নিজেদের এই দুর্বলতাটুকুর কথা পাড়ার বন্ধুরা সকলেই জানত, তবু সেদিনের সকালে দেবী যেন হঠাৎ সব বন্ধুত্বের গণ্ডি কাটিয়ে কেমন আপন হয়ে উঠতেন। এই সমঝোতা নিতান্ত নিঃস্বার্থ নয়, বলাই বাহুল্য। কারণ দেবী পরীক্ষকদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন, বন্ধুদের হাতে অত ক্ষমতা নেই।

একটা কথা জানা হয়নি কোনওদিন—মা'কে জিগ্যেস করেছিলাম, মা এক ধমক দিয়েছিল।

—পাকামি ক'রো না, লিখতে বলছি লেখো? প্রশ্নটা নিতান্ত নিরীহ ছিল বলেই মনে হয়। বইখাতার সঙ্গে নাম, বাবার নাম অবধি ঠিক আছে, 'গোত্র'টা আবার কেন? কই? পরীক্ষার খাতায় তো গোত্রটা লিখতে হয় না!

৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ট্যাক্সি চড়ার স্মৃতি আমার ছোটবেলা থেকেই এলোমেলো।

সাধারণত স্কুল-বাসে করে স্কুল যাওয়া-আসা। আর তারপর বাড়িতে ফিরে বিকেলের খেলা, সন্ধের পড়া, রাতের গল্প শোনা—ব্যস, স্বপ্নমাখা রাত্তির পার হয়ে নতুন দিন।

বাবা-মা-ভাইয়ের সঙ্গে সাধারণত পুজো বা পয়লা বৈশাখের আগে নিউ মার্কেট যাওয়া—এবং সদলবলে ট্যাক্সি চেপে বাড়ি ফেরা, সেটা তো বছরে কয়েকটা হাতেগোনা সন্ধে।

নিউ মার্কেট-এ কেনাকাটা করেই যথেষ্ট অধৈর্য হয়ে পড়তাম আমি আর চিঙ্কু। ভাবতাম এটা বড়দের একটা খেলা—আমাদের শুধু পুতুল সাজিয়ে কাঁধের মাপ, পেটের মাপ নেওয়ার জন্য দাঁড় করিয়ে রাখা। স্বাভাবিকভাবেই প্রথমে বিরক্ত হতে থাকত চিঙ্কু। আমার তবু জামাকাপড়, তার রং, তার ডিজাইন ইত্যাদিতে ছেলেবেলা থেকেই একটা আকর্ষণ ছিল বলে ধৈর্যের সীমাটা সাধারণত একটু দীর্ঘতর হত।

তাও একটা সময়ের পর ক্লান্তি আসত। দমবন্ধ লাগত, আর তারপর থেকেই,

—মা, বাড়ি চলো।

সাধারণত কেনাকাটা সারা হলে একটা খাওয়াদাওয়ার ব্যাপার থাকত। বাঙালি মধ্যবিত্তর মধ্যে তখনও আজকের মতো অঢেলভাবে 'বাইরে খাওয়া' চালু হয়নি। এতরকম রেস্তোরাঁও ছিল না। হয়তো রেস্ত-ও ছিল না। মাঝে-মাঝে এই সখ করে কোনও একটা দোকানে হয় দক্ষিণী খাবার, নয় মোগলাই পরোটা বা কাটলেট—এই মোটামুটি।

তার মধ্যে মা আবার আমাদের ঝাল লাগবে বলে অর্ধেক খাবার বাতিল করে দিত। আমি বা চিঙ্কু, কেউই ছোটবেলায় খুব খেতে ভালবাসতাম না। ফলে, এতক্ষণ দম-আটকানো কেনাকাটার পর, আবার ভিড় রেস্তোরাঁয় অর্ডার দিয়ে অপেক্ষা করা—দু'ভাইয়ের পক্ষেই মানসিকভাবে একটু বেশি ধকলের হয়ে উঠত।

ফলে ফেরার পথে ট্যাক্সিতে উঠেই আমাদের চোখ জড়িয়ে আসত। চিঙ্কু প্রায় পার্ক স্ট্রিট পার হলেই, আর আমার মেয়াদ খুব বেশি হলে ভবানীপুর।

চিঙ্কু আবার ঘুমানোর সময় আঙুল চুষত—বেশ বড় বয়স অবধি। মা অনেক নিমপাতা-টাতা লাগিয়েও কিছু হয়নি। আর আঙুল চুষতে চুষতে অন্য হাতের মুঠোটা কিছু একটা আঁকড়াতে চাইত—মা'র আঁচল, পিসিমণির বিনুনি, ঠাকুমার আঁচলের চাবির গোছা। সামনের সিটে বাবার কোলে ঘুমন্ত চিঙ্কু, আর পিছনের সিটে মা, পিসিমণি আর আমি।

আমাদের দু'ভায়ের জন্য ট্যাক্সিটা ছিল একটা চলন্ত বিছানা। তারপর বাড়ির কাছাকাছি এসে আমাদের জাগানো হত—

ওঠো, বাড়ি এসে গিয়েছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা ঘুমচোখে ধীরে ধীরে ট্যাক্সি থেকে নামতাম। ঘুমন্ত পা দু'টো চেনা সিঁড়ি খুঁজে উঠে আসত দোতলায়। আমাদের ট্যাক্সি বেড়ানো শেষ।

একদিন এমনই এক নিদ্রাযাত্রার পর আমরা দোতলায় উঠে এসেছি। বাবা ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়েছে—কিন্তু তার অব্যবহিত পরেই ট্যাক্সির স্টার্ট নেওয়ার আওয়াজটা শুনতে পাওয়া গেল না।

আমরা যে যার ঘরে গেলাম, পোশাক বদলালাম—এবার বাড়ির বিছানায় ঘুমোতে যাওয়ার পালা। হঠাৎ বাবা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে দ্যাখে ট্যাক্সিটা তখনও আমাদের বাড়ির তলায় দাঁড়িয়ে, এবং বয়স্ক শিখ ট্যাক্সিচালক অন্ধকারে কী একটা খুঁজছেন?

স্বাভাবিক উদ্বেগেই বাবা জানতে চেয়েছিল, কী হয়েছে। শিখ ভদ্রলোক উত্তর দিলেন যে তাঁর ট্যাক্সির চাবিটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

কী বিপদের কথা! বাবা তাড়াতাড়ি টর্চ নিয়ে নীচে নামল—দু'জনে মিলে চারদিকে খুঁজতে লাগল। গাড়ির ভিতরে বা বাইরে কোথাও পড়ে গিয়েছে কি না। প্রায় পনেরো মিনিট উৎকণ্ঠার তোলপাড়।

শেষে চাবিটা পাওয়া গেল ঘুমন্ত চিঙ্কুর হাতের মুঠোর থেকে। ট্যাক্সিতে আসার সময় আঙুল খাবার সঙ্গী হিসেবে আর কিছু পায়নি। ট্যাক্সির চাবিটা খুলে নিয়ে মুঠোয় ভরে ফেলেছে।

AMARBOI.COM

দুই

আজকাল সত্যিই আমার ট্যাক্সি চড়া হয় না। নেহাত গোবিন্দ ছুটিতে গেলে, বেরনোর দরকার হলে তবেই কখনও সখনও ট্যাক্সির খোঁজ পড়ে।

আর এতদিন গাড়ি চাপার অভ্যেসে আমি ট্যাক্সিতে উঠে প্রায়ই ভুলে যাই 'কোথায় যাব' বলতে।

যেন, মনে মনে ধরে নিই, সব গাড়ির চালকই গোবিন্দর মতো আমার বাড়ি চিনবে।

যদিও বা 'কোথায় যাব' বললাম, তারপর ট্যাক্সি চালু হলে ডুবে যাই কোনও অন্যমনস্ক চিন্তার জগতে, কোথায় আমাকে নামতে হবে সেটা আর বলা হয়ে ওঠে না অর্ধেক সময়। ট্যাক্সিচালক উসখুস করেন। আর তখনই যেন অবধারিতভাবে মা মনে করিয়ে দেয়,

—ওঠো, বাড়ি এসে গিয়েছি।

১৫ মে, ২০১১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ছোটবেলায় দুগ্গাপুজোর অগ্রদূতী ছিল না কোনও শিউলির ফুল, নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা। কোনও কিছুই ভাল করে চোখে পড়ত না স্কুলে যাওয়ার পথে স্কুলবাস-ভর্তি একদল আমাদের কলরবের মধ্যে। কিংবা স্কুল বা বাড়ির জানলার ফাঁক দিয়ে দেখা বাড়িঘরের জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে।

আমাদের কাছে দুগ্গাঠাকুর আসছে, সে-খবর নীলকণ্ঠ পাখির মতো বয়ে নিয়ে আসত নানা রকমের ঘুড়ি। বর্ষা তখন বর্ষার নিয়মেই আসত এবং যেত। আর কে জানে, কখন প্রায় যেত আবহাওয়াবিদের মতো ঘুড়ির দোকানওলা জেনে যেত কবে সেই মেঘভাঙা রোদ আবার আসবে হঠাৎ, কোনও পশ্চিমের বিকেলে।

ঘুড়ির সুতোয় মাঞ্জা লাগত ল্যাম্পপোস্ট থেকে ল্যাম্পপোস্ট জুড়ে, নানা রঙের সুতো। সাবধানে হাত লাগাতে হত, বা আদপেই হাত দিতে দিতেন না পাড়ার বড়রা। কারণ, তাতে কাচগুড়ো মেশানো।

গরমকালে ফুটবল, বর্ষাকালের ভেজা বিকেলে ক্যারম, বা টেবিল টেনিস এবার সসম্ভ্রমে জায়গা ছেড়ে দিত আসন্ন শরতের আকাশটাকে। আর বিকেলে স্কুল থেকে ফিরেই আমার সব বন্ধুরা হইহই করে নেমে পড়তাম এক মহাকাশ-যুদ্ধে।

আমি চিরকালই ক্যাবলা ছিলাম খেলাধুলোর ব্যাপারে। আমাকে বেমালুম 'আব্বুলিশ' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হত এককোণে।

আর সেই বিকেলের রথী-মহারথীরা কেমন করে যেন ধীরে ধীরে প্রবেশ করত শত্রুনিধনে, আকাশে ভাসমান কাগজের সেনানী মুণ্ডচ্ছেদ হয়ে ভেসে যখন উড়ে পড়ত কোন সুদূরে, সদ্যবিজেতার বিপুল ভোকাট্টা-কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, আমার কেমন যেন মনে পড়ত 'মহাভারত'-এর জয়দ্রথর কথা।

অনেক বড় হয়ে গিয়েছি তখন। বিকেলে বাড়িতে বসে কিছু একটা লিখছি, কোনও চিত্রনাট্য হবে—হঠাৎ খোলা দরজা দিয়ে একটা উজ্জ্বল বেগুনি রঙের ঘুড়ি ভেসে এসে পড়ল মেঝেতে, আমার পায়ের কাছে। আমি এই অতর্কিত অনুপ্রবেশের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না মোটে। তুলে নিয়ে হাতে ধরলাম ঘুড়িটাকে। আর অমনি কোথা থেকে যেন আক্রমণ করল ছেলেবেলা। সেই কাগজ, তার সেই গন্ধ—কিছুই যেন বদলায়নি।

কিছুক্ষণ পরই নীচে শুনি এক বিরাট কোলাহল। দুই দল—যাদের ঘুড়ি কাটা গিয়েছে, তারা ঈষৎ বিনীত; আর যারা কেটেছে তাদের সদম্ভ দাবি। দু'দলই ঘুড়িটা চায়।

আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম—যে, যার ঘুড়ি কেটেছে সে তো প্রথমেই অধিকার হারিয়েছে, আর যে ঘুড়ি কেটেছে তার বীরত্বটুকু তো ঘুড়ির সুতো কাটাতেই—সে ঘুড়ি ন্যায্যত তার—একথা তো ঘুড়ি ওড়ানোর শাস্ত্র বলে না। এ তো ক্রিকেট খেলার বল নয়, যে, আমি ফেরত না-দিলে সেদিনের মতো খেলা বন্ধ হয়ে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'দলই শুনল, তারপর একসময় মাথা নিচু করে চলে গেল—আমার সঙ্গে আর তর্ক করল না।

ঘুড়িটা টাঙানো ছিল আমার দেওয়ালে একটা ছবির মতো। আমার ঘরটায় তখন হলুদ রঙের পর্দা—তার মাঝে একটা বেগুনি বরফি—দেখতে বেশ লাগত। তারপর কোনও একদিন পাখার হাওয়ায় নিস্তেজ হতে-হতে আপনিই খসে পড়ে গেল দেওয়াল থেকে।

এখন আর তেমন ঘুড়ি-ওড়া দেখতে পাই না। চলতি পথে, এমনকী আমার গাড়ির বনেটের ওপরও, এসে পড়ে না কলকাতার শারদোৎসবের নীলকণ্ঠ পাখির বরফি কাগজপালক।

কেবল বিশ্বকর্মা পুজোর দিনগুলোয় তবু আকাশে রঙের ফোঁটা লাগে।

ভাল কথা, দেবানন্দপুরেও কি ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে আকাশ অমন রঙিন হয়ে ওঠে? আর তাতেই কি আমরা ফি-বছর ভুলে যাই যে বিশ্বকর্মা পুজোর হইচই, আর ঘুড়ি-ওড়ানোর উদ্দাম আনন্দের পাশে আরেকটা বহুবর্ণ স্মৃতি? শরৎচন্দ্রের জন্মদিন।

১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১১

শরৎকালের এই ভোরটা কেমন যেন একটা ম্যাজিক জানত।

রাত থাকতেই ঘুমচোখে উঠে পড়ত দেশসুদ্ধু বাঙালি। রেডিওতে মহালয়া শুনবে বলে।

মহালয়ার প্রাতে প্রচারিত এই প্রাচীন বেতার অনুষ্ঠানটি কালজয়ী নিঃসন্দেহে। কিন্তু প্রখ্যাতনামা কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

অনুষ্ঠানের আসল নামটি যে 'মহিষাসুরমর্দিনী', সেটা আমরা সগৌরবে ভুলে থাকি। ইদানীং, ক্যাসেট বা সিডি-বন্দি হয়ে মিউজিক ওয়ার্ল্ড-এ নানা তাকের শোভাবর্ধন করে; সেই সূত্রে নামটাও একটু-একটু করে আমাদের কানের মধ্যে ঢুকেছে। কিন্তু মনের মধ্যে বাসা বেঁধে রইল যে-নামটা, সেটা তিথি-মাহাত্ম্যেরই পরিচয়টুকু।

কীভাবে যেন পিতৃপক্ষের শেষভোরে বাড়িতে-বাড়িতে ভেসে আসা 'মহিষাসুরমর্দিনী'-র সম্মিলীত চণ্ডীমন্ত্র ভুলিয়ে দিতে পারে যে, পিতৃপক্ষের অন্তিম দিনটি এখনও বাকি।

অন্তরিক্ষবাসী পিতৃপুরুষগণ এখনও অপেক্ষা করছেন মর্ত্যবাসীর তর্পণে তৃপ্ত হয়ে মহান আলয়ে ফিরে যাবেন বলে। যেন, মনে-মনে চব্বিশ ঘণ্টা টপকে এগিয়ে গিয়ে মহালয়ার এই প্রভাতী অলক্ষে মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়ে ডেকে নেয় দেবীপক্ষ-কে।

শরতের আরও একটা ভোরও আমাদের বাড়িতে বড় আনন্দ, বড় উত্তেজনার ছিল। তবে সে কোনও বিশেষ তারিখ নয়।

ভোররাত্তির থেকে তখন পুজোর ছুটিতে বেড়ানোর টিকিটের অগ্রিম বুকিং-এর লাইন পড়ত ফেয়ারলি প্লেস-এ। আর, সমস্ত ভ্রমণপ্রিয় বাঙালির মতো বাবাও গিয়ে দাঁড়াত সেই ভোরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপেক্ষায়—বাৎসরিক সপরিবার ভ্রমণের নিঃশব্দ আয়োজন শুরু হত সেই নিভৃত শারদপ্রাতে।

ক্রমে আকাশ ফরসা হয়ে আসত। আর জানলার পাল্লা ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত মা, পাড়ার মোড়ে বাবার সেই একমাথা কালো কোঁকড়া চুলগুলোর অপেক্ষায়।

ব্যস! পাড়ার বাঁকে খবরের কাগজ হাতে বাবা। মা অমনি সজোরে বলত,

—ছবি, চা বসা। আর পরোটাগুলো ভাজ এবার।

ছবি আঁকা, ডায়াবেটিস, ডোভার লেন আর পর্বতপ্রেম—এই ক'টি অনুপম সাদৃশ্যের রাজযোটকে, বড় আনন্দে, বড় প্রেমে কেটে গিয়েছে আমার বাবা-মা'র জীবন।

মধ্যবিত্তের সংসারে প্রথম নির্বাসিত হয়েছিল রং-তুলির বিলাসিতা। তারপর মা-র অসুস্থতার সঙ্গে-সঙ্গে ধীরে-ধীরে বন্ধ হয়ে গেল ডোভার লেনের সংগীতময় রাত্রিগুলো।

কিন্তু সংসার, সন্তান, ক্ষীয়মাণ স্বাস্থ্য—কোনও কিছুই স্পর্শ করতে পারেনি বাবা-মা'র এক যৌথ দুর্মর বাসনাকে। বারবার পাহাড়ে যাওয়ার নিরন্তর সপ্তপদী-কে।

একদম ছোটবেলায় পুজোর ছুটির পর আমরা চারজনেই বেড়াতে যেতাম। বাবা, মা, চিঙ্কু, আমি।

তারপর বার্ষিক পরীক্ষার চাপ বাড়তে লাগল। আমাদের আর জোর করা হত না। পাহাড় থেকে দশ-বারোদিন পর, একটা অন্যরকম গন্ধ নিয়ে, ফিরত বাবা-মা। সুটকেস থেকে বেরত আমাদের জন্য আনা ভুটানি সোয়েটার। আর নানারকম বৌদ্ধমূর্তি।

চিঙ্কু-র জন্য ভয়ালবদন কাঠের মুখোশ, প্রাচীন অস্ত্রের প্রতিরূপ, আর আমার জন্য পেলবিনী-ধাতবিনী তারা, প্রজ্ঞাপারমিতা, মঞ্জুশ্রী বা স্থিতধী অবলোকিতেশ্বর।

আর পাহাড় থেকে ফিরে আসার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই কোনও এক সন্ধেবেলা অফিস-ফেরত বাবার সঙ্গে এসে বাড়ি পৌঁছত বাবা এবং মা-র ফি-বাৎসরিক মধুচন্দ্রিমার ছবিগুলো।

খাট জুড়ে ছড়িয়ে বসতাম আমরা। সব ছবিতেই মা। মা একা। কারণ ছবিগুলো তুলেছে বাবা।

কয়েকদিন বেশ আহ্লাদ চলত ছবিগুলো নিয়ে। বিজয়ার নিমকি, ঘুগনি আর পাহাড়ে বেড়ানোর গল্প। মাসিমণি, ছোট মামা-মামিমা, সবার সঙ্গে। তারপর একদিন কখন যেন অ্যালবামের পাতার ভিতর ঘুমিয়ে পড়ত হিমালয়ের যত শারদ-কুয়াশা।

পুরনো তেমনই একটা অ্যালবাম উল্টে দেখছিলাম সেদিন। প্রথম দেখেছি যখন, মনে হয়েছিল সাধারণ। এখন যেন প্রতিটি ছবিই গোটা একটা সিনেমার থেকেও বড়।

সকালবেলা গায়ে শাল জড়িয়ে হোটেলের লাগোয়া বারান্দায় চা খাচ্ছে মা। কোনও মনাস্টেরি-র পাঁচিলে হেলান দিয়ে কার্ডিগান পরা মা—পিছনে ধূসর হিমালয়ে। আবার কখনও কোনও ঝরনার সামনে সরষে-হলুদ সিল্কের শাড়িতে মা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারই মধ্যে একটা ছবি নজরে পড়ল এবার। জলদাপাড়ায় হাতির পিঠে মা। ক্যামেরার নির্দেশে জোর করে হাসির মধ্যে অদ্ভুত এক অস্বস্তি-মাখানো।

এবার গজে আসছেন মা। গজে চলদা দেবী শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা।

সুশীতল হোক মেদিনী, সকল শস্যক্ষেত্র শ্যামলতম হোক, পুণ্যতোয়া হোক যত প্রস্রবণ, নির্মেঘ হোক শরতের পর্বতশৃঙ্গ। সমগ্র বিশ্বজগৎ মণিভূষণতায় বেষ্টিত করুক নগাধিরাজের সুবিস্তৃত ধরণীতল।

আনন্দময়ী যে-পথে আসছেন—সেই পথেই যে এ বছরও বেড়াতে যাবে আমার বাবা-মা!

১৪ অক্টোবর, ২০১২

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার অযুত নিযুত বৎসর সূর্যপ্রদক্ষিণের পথে
যে বিপুল নিমেষগুলি উন্মীলিত নিমীলিত হতে থাকে
তারই এক ক্ষুদ্র অংশে কোনো-একটি আসনের
সত্যমূল্য যদি দিয়ে থাকি,
জীবনের কোনো-একটি ফলবান্ খণ্ডকে
যদি জয় করে থাকি পরম দুঃখে
তবে দিয়ো তোমার মাটির ফোঁটার একটি তিলক আমার কপালে;
সে চিহ্ন যাবে মিলিয়ে
যে রাত্রে সকল চিহ্ন পরম আঁচনের মধ্যে যায় মিশে।।

একা মানে কী?

ঘুমের মধ্যে অবচেতন সোহাগে পাশে হাত বাড়িয়ে কাউকে কাছে টেনে নিতে গিয়ে নিঃশব্দ উপহাস?

কাজ থেকে ফিরে এসে বাকি কতগুলো আসবাবের সঙ্গে নিত্যকার সেই এক নৈর্ব্যক্তিক মুখোমুখি?

অনেক কাজের মধ্যে বাইরে কখন যে রাত ঘন হয়ে এসেছে, হঠাৎ যখন খেয়াল হল যে এবার মধ্যরাত্রি—অথচ কেউ খেতেও ডাকেনি; তখন নিজের ওপর অজানিত রাগ আর স্মৃতির বা কল্পনার কোনও অনুপস্থিত মানুষের জন্য কোনও নিভৃত অভিমানী দীর্ঘশ্বাস?

না, হঠাৎ পাওয়া কোনও আনন্দ সংবাদে ফোনের নম্বরে আঙুল পৌঁছেও বিশেষ কোনও একটা নাম খুঁজে না পাওয়া এবং অগত্যা সেই আনন্দকে হয় পুরোপুরি গিলে ফেলা, বা চারপাঁচজন সাম্প্রতিক পরিচিতজনের মধ্যে, যার নম্বর সহজে পাওয়া যায়, তাকে কোনওভাবে খবরটা চালান করে দেওয়া—এবং তারপর সারাক্ষণ একটা অস্বস্তির মধ্যে ভোগা, যে—ভাবল না তো শোনানোর জন্য বললাম?

একা মানে কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর যে কোনও একটা? বা, প্রায় সবকটাই হয়তো?

কিংবা, কে জানে, বুঝিবা আরও কোনও অনেক বিশিষ্ট, অনেক তীব্র, অনেক কাতর কতগুলো অনুভূতির নিত্যবিরচিত স্মৃতিমালা।

আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইনস্ ডে।

বিশ্বজুড়ে মানুষের সঙ্গী খুঁজে নেওয়ার অন্তরতম বাসনার প্রকাশদিন। ভ্যালেন্টাইনস্ কার্ড, ভ্যালেন্টাইনস্ উপহারে নানাবিধ ডিসকাউন্ট, নতুন নতুন ডেটিং বা চ্যাট সাইট উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিক ঐতিহ্যসূত্র।

গত ক'বছরে বিশ্বজোড়া ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে ডিভোর্সের হাত যত বেড়েছে, পলকা কাচের মতো চুরচুর হয়েছে মানুষে মানুষে বিশ্বাস— ভ্যালেন্টাইনস ডে উদ্‌যাপনের ঘটা তত জাঁকিয়ে বসেছে শহুরে সভ্যতায়।

প্রেম-অপ্রেম, বিশ্বাস-অবিশ্বাস পৃথিবীকে শাসন করে এসেছে বহুদিন। যেদিন তার অভিঘাত চরমভাবে শাসকের আসনকে স্পর্শ করেছে, তখনই শাসনতন্ত্র ফুঁসে উঠে শাস্তি দিতে চেয়েছে প্রেমকে। আর প্রেমকে তো আর যে কোনওভাবে শাস্তি দেওয়া যায় না। কেবলমাত্র যায় তার স্বতঃস্ফূর্ততাকে রুদ্ধ করে দিয়ে। তাকে প্রাতিষ্ঠানিকতায় গেঁথে ফেলে।

ক্লিন্টন-লিওনেস্কির বহুচর্চিত অবৈধতা এবং রাজকুমারী ডায়নার স্বেচ্ছাজীবনযাপন এই প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে প্রেমের সচেতন বা অবচেতন প্রতিবাদ।

শাসনতন্ত্রে যেহেতু স্বতস্ফূর্ত ব্যক্তিস্বাধীনতার কোনও জায়গা নেই, এই দুটি বড় বড় ঘটনায় প্রথম বিশ্বের শাসনতন্ত্রের প্রথমটায় হর্তভম্ব হওয়া ছাড়া কিছু করার ছিল না বিশেষ। তারপর কী হল, সেটা আমাদের, সকলেরই জানা। ভেতরে ভেতরে যেটা হল, সেটা আমরা অনেকেই হয়তো জানিনা। ম্যাডাম ট্যুসোর মোম যাদুঘরে বাকিংহাম বেস্টনীর মধ্যে ডায়নার প্রবেশাধিকার জুটল না। তিনি ঠিক উল্টোদিকে 'প্রিন্সেস অফ দ্য পিপল' হয়ে স্মিতহাস্যে মোমীভূত স্বৈরিণী হয়ে রইলেন সারাজীবন।

শাসনতন্ত্র তাঁকে মুছে ফেলল না একেবারে, বরং চিরজাগ্রত ব্যাভিচারিণী যৌনতার প্রদীপ্ত প্রতিমূর্তি হিসেবে চিরজাগ্রত করে রাখল মানুষের মনে,— ঠিক যেমন করে বেঁচে রইলেন পৃথিবী বিখ্যাত কয়েকজন নির্বাণদীপ্ বিস্ফোরিকা— কেনেডি প্রণয়িনী মেরিলিন মনরো, বা সিজারের অঙ্কশায়িনী মিশরসাম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা।

ডায়নার মৃত্যুর পর তাঁর শেষ শোভাযাত্রায় নতমস্তকে হাঁটলেন যুবরাজ চার্লস। আমরা সবাই বললাম 'আহা রে।' তারপর সেই চার্লস বিয়ে করলেন পরস্ত্রী ক্যামিলাকে। টেলিভিশনে ফলাও করে সে বিয়ে দেখানোও হল। আমরা সবাই ভুলে গেলাম এই চার্লস-ক্যামিলার দীর্ঘ গোপন প্রণয়ই কিন্তু ডায়নাকে ঠেলে দিয়েছিল একাকীত্বের হতাশার চরমতম অন্ধকারে। ডায়না হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেলেন 'আর্কিট্রিপ্যাল অ্যাডান্টারেস' আর চালর্স পত্নীবিরহিতা এক মানুষ, অতএব পুনর্বিবাহযোগ্য।

খুব ধুমধাম না হলেও, সে বিয়েও বড় অনাড়ম্বর হয়নি। রানি এলিজাবেথ ছাড়া আরও দুজন অদৃশ্য অভিভাবক ছিলেন আপ্যায়নের দায়িত্বে। শাসনতন্ত্র আর পুরুষতন্ত্র। বিবাহসভায় নীরব করমর্দনে সুরাপাত্র তুলে—তাঁরা নিজেদের পারস্পরিক বিজয়গাথাকে নতুন করে অভিবাদন জানালেন।

আর পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল ভ্যালেন্টাইনস ডে'র অসংখ্য রঙিন কার্ড, রক্তিম হৃদয়ানুকৃতি। বহু শতাব্দী আগের এক রোমান সন্তের নিষ্কলুষ অঙ্গীকার হয়ে দাঁড়াল আবেগের এক দুর্মদ বাণিজ্যতিথি। প্রেমের মতো চিরপ্রবাহিণী বেগবতীকে যদি কোনও তিথি, কোনও বিশেষ ফুল বা আকৃতি দিয়ে চিহ্নিত করতে হয়, তবে বুঝতে হবে পৃথিবীর গভীরতম অসুখের দিকে ধীরে ধীরে পা ফেলতে শুরু করেছি আমরা, আমাদের ভেতরকার সমস্ত অপ্রেমকে কতগুলো লাল লাল হৃদয়ের চিহ্ন দিয়ে ঢাকবার আপ্রাণ চেষ্টায়।

দু এক বছর আগের কথা। এক ১৪ ফেব্রুয়ারি। নন্দন থেকে শিশির মঞ্চের দিকে যেতে ডানদিকের যে খাবার দোকানটা, সেখানে আমার এক বন্ধু দাঁড়িয়েছিলেন লালচা খাবেন বলে। দেখলেন দোকানে স্টিলের একটা থালায় সাজানো রয়েছে অনেকগুলো গোলাপ ফুল। কৌতূহল হওয়াই স্বাভাবিক। দোকানের মহিলা একগাল হেসে বলেছিলেন 'ওই যে আজ কী যেন একটা দিন না!... আমার তো ভালই হল, এক একটা গোলাপ পাঁচটাকায় বিক্রি হচ্ছে।'

এবার প্রশ্ন, এ হেন আনন্দক্ষণে, পৃথিবীজুড়ে যখন প্রেমের জোয়ার, হঠাৎ একা মানুষদের নিয়ে এমন একটা বিষণ্ণ সংখ্যা কেন?

ইচ্ছে করে আলাদা হব বলে? না, গায়ের জোরে প্রেমের এই পণ্যীকরণের প্রতিবাদ করব বলে?

এ যেন দোলের দিন সকালে উঠেই চানটান করে পাটভাঙা পোশাকি জামাকাপড় পরে নেওয়া। কেবল জানেন, সম্পাদক—প্রকাশকও জানেন।

নিজে রং 'খেলব না, তাই নয়। সমস্ত আনন্দের মাঝখানে মূর্ত প্রতিবাদ হয়ে দাঁড়ানো।

কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা মনে পড়ল। শোলে-র সেই বিখ্যাত দৃশ্য।

হোলি কে দিন যব খিল যাতে হ্যায় ... গানটা যখন হত, ধর্মেন্দ্র হেমা মালিনীর হুল্লোড় দিয়ে, মনে আছে, যে সিনেমাহলটা হঠাৎ মুখরিত হয়ে উঠত দর্শকদের আনন্দ চিৎকারে, উল্লাস শিসে; পর্দার প্রেমিকযুগলের বসন্তোৎসবের উন্মাদনার স্বতঃস্ফূর্ত শরিক হয়ে।

তখন প্রায় হঠা? করেই আসত দ্বিতীয় চমক। গানের স্ট্যারল্যুড-এ কয়েকজন গ্রামবাসী দূরে একা বসে থাকা অমিতাভকে পাকড়ে আনতেন হোলির আবির আলোড়িত আঙিনায়।

কালো শার্ট, আকাশনীল জিনস পরা অমিতাভ সবে হাত দুটো ওপরে তুলে কোমর ভেঙে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাজনার তালে পা ফেলেছেন, সমস্ত দর্শকের কাঙ্ক্ষিত মিলনোৎসব কানায় কানায় ছুঁয়ে গেছে, এমন সময় হঠাৎ একটু দূরে সামনের উঁচু টিলার ওপরে মন্দিরে পুজো দিয়ে বেরিয়ে শুভ্রবসনা জয়া ভাদুড়ী এসে দাঁড়াতেন।

কালো শার্ট দীর্ঘ শরীরের নৃত্যভঙ্গি মুহূর্তের জন্য ম্লান হয়ে যেত। আকাশে ওঠা হাত দুখানা কখন যেন নেমে আসত অপ্রস্তুত লজ্জায়।

আর দর্শকদের কানা উপচোনা টগবগে আনন্দ মুহূর্তে যেন কেমন স্থির শান্ত হয়ে চলচলে পূর্ণতা পেত। মন-বিষাদের অনুপম সঙ্গম অদৃশ্য হয়ে প্রবাহিনী হত ... প্রতিটি দর্শকাসন ছুঁয়ে। বিরহ ছাড়া যে প্রেম সম্পূর্ণ হয় না— সেই চিরন্তন সত্য যেন সবকটা স্টিরিওফোনিক স্পিকার ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়ত প্রেক্ষাগৃহ অন্তরীক্ষে। হলভর্তি মানুষের অবচেতন আত্মধিক্কার হঠাৎ বেরিয়ে আসত একটা সম্মিলিত 'ইস্' হয়ে। এ যেন তাদেরই অন্যায়! বাসন্তী আর বীরুকে নিয়ে আনন্দমত্ত হতে গিয়ে কী করে আমরা ভুলে গেলাম সারাজীবনের মতো বর্ণবঞ্চিতা। সেই নিরাভরণ রিক্তা মেয়েটির কথা?

একা মানুষদের প্রতি সমাজের একটা স্বাভাবিক সহানুভূতি আছে। সহানুভূতি না বলে বোধহয় অনুকম্পা বলাই ভাল।

এখানে এক বলতে আমি প্রথাগত দাম্পত্যের বাইরের মানুষদের কথা বলছি। আমাদের চোখে একাকীত্ব হল ভাগ্যবিপর্যয়ের এক আরোগ্যহীন অভিশাপ—যার প্রতি কেবলমাত্র অনুকম্পাই করা যায়। শুনরে রূঢ় মনে হবে, তবু বক্তব্যটা একটু প্রাঞ্জল করার জন্য ইচ্ছে করেই একটা কঠিন উদাহরণ বাছছি—আগের কালের কুষ্ঠরোগী যেমন...। মানুষ কোনটাকে বেশি ভয় পেত—রোগটার গলিত শারীরিক বিকৃতিকে; না, তার কঠোর বান্ধবহীন, পরিণতিকে—আমরা আজও তা ভাল করে জানি না।

পৃথিবীজুড়ে অনেক মানুষ আছেন যারা সত্যিকারের কোনও সঙ্গী খুঁজে পাননি বলে একা।

কেউবা পরম পছন্দের মানুষের সঙ্গে থাকতে গিয়ে এক ক্রমিক চরম অপছন্দের সহাবস্থান মেনে নিতে পারেননি বলে একা।

আবার কেউ তাঁর নিষ্করুণ জীবনের কাছে প্রাণের মানুষকে নিরুপায় অনিচ্ছায় উৎসর্গ করেছেন বলে এখা।

একা মানে যদি নিঃসঙ্গতার কথা বলি, এঁরা নিঃসন্দেহে সকলেই একা।

একা মানুষদের প্রতি সহানুভূতি, অনুকম্পা সবই থাকে, তার সঙ্গে অনেক সময় থাকে এক অদ্ভুত নিষিদ্ধ কৌতূহল। এটা আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি।

ঋতুপর্ণ নারীসুলভ, অতএব প্রথাগত যৌন নির্বাচনের, বৈবাহিকতার বাইরে—ঋতুপর্ণর পুরুষবন্ধু ক'জন, এবং সাম্প্রতিকতম ঘনিষ্ঠ পুরুষসঙ্গীটি কে? এই জল্পনা কল্পনার নিরন্তরতা আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোজাসুজি না হলেও টের তো পাই এবং জানি আমার কোনও অসতর্ক স্বীকারোক্তির জন্য কতজন উন্মুখ হয়ে আছে।

এই 'ফার্স্ট পার্সন' এর পাতাটা আমার সত্যি কথা লেখার পাতা, আমার জীবনধারণের সমস্ত সাধ্য বিশ্বাসকে মেলে ধরার পাতা—তাই, আজ 'একা' মানুষদের অভিজ্ঞতা দিয়ে একটা সংখ্যা সাজাতে গিয়ে যদি নিজের একাকী জীবনের প্রায় স্বতসিদ্ধ কারণটাকে সযত্নে এড়িয়ে যাই, তাহলে সে তো তা সত্যগোপন হল। আমার কাছে তা মিথ্যাচারণেরই নামান্তর।

আজ যদি আমি নিজেকে বাদ দিয়ে একা মানুষদের অস্তিত্বের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটা শৌখিন তাত্ত্বিক সম্পাদকীয় লিখি, তাহলে আমার আগের এবং আগামী দিনের সব কটা 'ফার্স্ট পার্সন' মিথ্যে হয়ে যাবে। আর, বিনা পয়সায় রোববার পান বলে আপনারা মিথ্যে কথা পড়বেন কেন?

যে জীবন হয়তো বা আমাকে একাকীত্বের এই বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিতে পারত, আমাদের সমাজে তার কোনও স্থান নেই। আমার স্বভাবপ্রণোদিত 'অস্বাভাবিকতা' নিয়ে আমি বাস করেছি আমার একাকীত্বের বন্দীজীবনে—আর আমার সামনে ছিল সমাজের এক বিরাট কারাগার। যেখানে ঐতিহাসিকভাবে যে কোনও নতুন প্রথাকেই প্রবেশ করতে হয়েছে দণ্ডিত বিদ্রোহীর মতো, অনেক হিংসা এবং রক্তপাতের মূল্যে।

AMARBOI.COM

প্রথার বাইরে বাস করার এই অবধারিত ট্র্যাজেডি আমাকে বারবার ভেঙেছে, দুমড়েছে, ছিঁড়েছে, কুটেছে—এমন করে রক্তক্ত করেছে যে মনে হয়েছে, এর চেয়ে মৃত্যুও বোধহয় অনেক বেশি কাম্য।

একদিক দিয়ে আমি পরম ভাগ্যবান, আমার একজন চিরপ্রণয়ী আমাকে কখনও ত্যাগ করে যাননি। আমার রবীন্দ্রনাথ। নিগূঢ়তম অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যেতে যেতেও বইয়ের তাকে হাত রাখলেই বারবার করে পেয়েছি তাঁর প্রণয়ের উত্তাপ।

তাঁর বিনোদিনীকে আমি প্রায় আমার মতো করে সাজিয়ে নিয়েছিলাম। বিধবা বিবাহ যেখানে কেবলমাত্র একটা আইন, একটা প্রথা নয়— আইনগতভাবে সম্পূর্ণ জীবনযোগ্য হয়েও যে জীবননির্বাসিতা, কোথায় যেন মনেমনে, হয়তো আবেগবশতই, তার সঙ্গে নির্মাণ করে নিয়েছিলাম, কোনও এক আত্মজৈবনিক সমান্তরলতা।

আমার বিনোদিনী বিহারীর কাছে প্রত্যাখাত হওয়ার পর আত্মঘাতিনী হতে গিয়েছিল গ্রামের দিঘিতে। সেখানে সেই ঘাটে বসে, তারাভরা অনন্ত আকাশের তলায়, রাত্রিময় অসীম ব্রহ্মাণ্ডের দিকে তাকিয়ে তার কাছে হয়তো সত্যিসত্যিই তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল পৃথিবীর যত মহেন্দ্র বিহারী। আত্মহননের দড়িকলসী নির্জীব ঢেলার মতো গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল নির্জন নিশাজলে।

ভরা বাদর, মাহ ভাদর—শূন্য মন্দির মোর। রৌদ্রালোকিত প্রাণস্পন্দিত নদীবক্ষে, কোনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিন কোনও বজরায় বসে, নিখিলেশের মনে হয়েছিল—এই পূর্ণ জগৎসংসার কী শূন্য হল একটি নারীর অভাবে?

সন্তানের মরদেহ সৎকার করে ফেরা যে পিতা ট্রেনের জানলার বাইরের জ্যোৎস্নালোকের মধ্যে দেখতে পান জীবনের শুভ্র পূর্ণতা, তাঁর চিরন্তন সান্নিধ্যের কাছে কতগুলো মানুষ; যারা স্বেচ্ছায় বা বাধ্যতায়, স্বার্থে বা অবহেলায় আমাকে কষ্ট দিতে চেয়েছে বা পেরেছে, তাদের স্মৃতি কখনও চিরঅভিঘাতী হতে পারে?

একটু বিশ্বাস হল যে আমি সত্য কথা বলতে পারি? তাহলে আরেকটা বড় সত্যি কথা বলছি। একটু বিশ্বাস করুন।

গত বছরে মে মাসে আমার মা মারা গেছেন। মা আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিলেন। দুঃখ যে এত অসহনীয়ভাবে পবিত্র হতে পারে কাছের মানুষকে হারানো যে কোনও অপমান, গ্লানি, অনুশোচনার বাইরেও কেবলমাত্র বিশুদ্ধ অমলিন দুঃখের কোমলতম কাঁথার মতো নিবিড়তম আবরণ হতে পারে—মা চলে গিয়ে যেন নিশ্চিতভাবে তা বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন।

আসলে বোধহয় একাকীত্ব জিনিসটা একটা সূক্ষ্ম সঙ্কুলভূমিতে পদচারণের পরীক্ষা।

যেখানে নিজের ভেতরের শক্তিকে বারবার করে স্মরণ না করলে নারী-শিশু-বৃদ্ধ-প্রতিবন্ধী-সংখ্যালঘুর নিয়মে একা মানুষরাও অনুকম্পাযোগ্য হতে বাধ্য।

কারণ, সমাজকে চালায় যে শাসনতন্ত্র, সেখানে অশক্তের কোন সমভূমিকা নেই। শক্তিমান এবং অশক্ত কখনও একাসনে বসতে পারে না।

পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে নিচের পাকদণ্ডীটা যখন দেখি, তখন চায়ের টুকরি কাঁধে ধীরপায়ে হেঁটে যাওয়া মেয়েটাকে বড় একা, বড় বেচারা লাগে। কখনও ভেবে দেখি না, সেও যদি চোখ তুলে তাকায়, অসীম আকাশের গায়ে পাহাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটাকে তারও বড় একা লাগবে।

সিনেমার ব্যাকরণে অনুভূতির যে যে ভাষা আছে, তার মধ্যে টপ শট এবং লো অ্যাঙ্গল (ওপর থেকে এবং নিচে থেকে নেওয়া) শট দিয়ে আমরা যথাক্রমে একাকীত্ব ও অতিকায়তা বোঝাই। এ ভাষা তৈরি হয়েছে সিনেমার প্রাতিষ্ঠানিকতা থেকে যার আদিনাম হলিউড।

কোন চোখ দিয়ে কোনটাকে দেখব, বা কোথায় দাঁড়িয়ে কীভাবে দেখব— শাসনতন্ত্রের এই গোপন সূত্রগুলি কখন যে আবেগ উচ্চারণের নির্ধারিত ভঙ্গি হয়ে গেছে, আমরা খেয়ালও করিনি।

রক্তকরবীর নন্দিনীর রাজাকে বড় একা মনে, হয়েছিল। সেই নিঃসঙ্গতা শক্তির নয়, আস্ফালনের।

পাহাড়চূড়োয় দাঁড়িয়ে থেকে বাইনোকুলার দিয়ে নিচের মানুষগুলোকে দেখবেন না, প্লিজ। বুঝতে পারছেন না কেন, তারা যদি ওপরের দিকে চোখ তুলে তাকায় তারা তো আপনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখদুটো দেখতে পাচ্ছে না, দেখছে দুটো ঠুলি? এবার তারা যদি আপনাকে দৃষ্টিহীন বলে অনুকম্পা করে? অতগুলো সমবেত আহা বে'র শক্তি কিন্তু বড় প্রচণ্ড!

পাহাড়ের নিচে খাদ, তার নিচে কিন্তু কালস্রোত। সেই স্রোতমুখে সবাই যে বড় একা। একেকটি বিচ্ছিন্ন বৃষ্টির ফোঁটার মতো নিঃসঙ্গ।

১১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭

প্রথম কথা বলতে কে শিখিয়েছিল, জানি না। কালোর ওপর লাল পাখি নক্সা করা একটা বেডকভার ছিল বাড়িতে।

সেটা দেখে প্রথম চিনতে শিখি। তখন 'পাখি' বলতে পারতাম না। বলতাম-'কাঁপি'।

প্রথম গান শিখিয়েছিল মাসিমণি—'আলো আমার আলো, ওগো...।' চান করানোর আগে তেল মাখাতে মাখাতে।

প্রথম 'পথের পাঁচালী' কিনে দিয়েছিল পিসিমণি। পিসিমণির তখনও বিয়ে হয়নি। বাবার সবথেকে ছোটবোন। শ্যামলা রং, মোটা একটা বিনুনি।

অপু দুর্গার গল্প পড়ে মনে হয়েছিল পিসিমণি আমার দিদি হলে বেশ হত।

প্রথম ফাউন্টেন পেন-এ লিখতে শিখিয়েছিল বাবা। শিখিয়েছিল কেমন করে মহাভারত পড়তে হয়। রাজশেখর বসুর মহাভারত।

রোজ সন্ধেবেলা, হোমওয়ার্ক সেরে আমরা তিনজনে বসতাম। বাবা পড়ত, আমি আর ঠাকুমা শুনতাম।

বাবা শিখিয়েছিল কেমন করে জাদুঘর দেখতে হয়।

শিখিয়েছিল উত্তর ভারতের মন্দিরের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের তফাৎ কী?

শিখিয়েছিল, 'ইউ' ছাড়া শুধু 'কিউ' দিয়ে ইংরেজি বানান হয় না। শিখিয়েছিল, ইংরেজি হরফের আসল নাম রোমান।

মা গান গাইতে পারত না। তাই সঞ্চয়িতা পড়ে ঘুম পাড়াত আমাকে। সেই আমার রবীন্দ্রনাথে হাতেখড়ি।

মা যে আদতে ছবি আঁকিয়ে, সে কথা মনেই থাকত না।

একদিন সন্ধেবেলা বিছানায় বসে হোমওয়ার্ক করছি। আর সামনে বসে আমারই একটা পুরনো খাতার পেছনের পাতায় পেন্সিল দিয়ে আঁকিবুকি কাটছে মা। ঝুঁকে পড়ে দেখি, মা স্কেচ করছে—বিছানার ওপাশের টেবিল ফ্যানটার স্কেচ। সেদিনই শিখলাম, তিন ডানাওয়ালা ফ্যানটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসলে একটা তিন পাপড়ি মেলা ফুল।

ঠাকুমা শিখিয়েছিল কাঁচালঙ্কার রং সবুজ আর শুকনো লঙ্কা নাকি লাল। শিখিয়েছিল প্রথম পাতে তেতো খাওয়ার পর জল খেলে মিষ্টি লাগে। শিখিয়েছিল গরমকালের কুঁজো আর শীতকালের কাঁথা।

পঞ্চুপিসি শিখিয়েছিল বেস্পতিবারের আরেক নাম বিষ্যুদবার।

আর, সন্ধের পর, সাপের নাম লতা। চিঙ্কু, আমার ভাই, প্রথম শেখাল বড় হয়ে যাওয়া।

প্রথম মিথ্যে কথা কে শিখিয়েছিল মনে নেই।

কে শিখিয়েছিল আসলে কী করে বাচ্চা হয়—ভুলে গিয়েছি। এক এক করে ছেড়ে চলে গিয়েছে যে মানুষগুলো, তারা শিখিয়ে গিয়েছিল—শুধু আরও কষ্ট পাব বলেই বেঁচে থাকাটা কত সুন্দর!

বাংলা ভাষা নিয়ে অহঙ্কার করতে শিখিয়েছে রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়, শিবরাম, মুজতবা আলি।

সত্যজিৎ প্রথম শিখিয়েছেন ক্যামেরা দিয়ে গল্প বলা যায়। চাইলে কবিতাও।

মা চলে গিয়ে দু'টো জিনিস শিখিয়ে দিয়ে গেল।

মা'রা আসলে অমর।

আর, মা ছাড়া বাবারা বড্ড অসহায়।

কথা হচ্ছে, এত কিছু শিখেও এমন একটা আস্ত অপোগণ্ড তৈরি হলাম কী করে?

২ সেপ্টেম্বর, ২০০৭

AMARBOI.COM

সাধারণত বছরে আমরা ছ'মাস কথা বলি।

ছ'মাস বলি না।

প্রত্যেক ক'টা ছবির আগে বা পরে এমন একটা সাংঘাতিক ঝগড়া হয়, যে দু'জনেই প্রতিজ্ঞা করি—আর, কোনওদিন একসঙ্গে কাজ করব না। দু'জনেই প্রতিজ্ঞাটি ভাঙি, আলাদা করেই। খুব বেশি হলে চব্বিশ ঘণ্টার ব্যবধানে। আমার কনকনে এসি ছাড়া চলে না আর ও ঘরে ঢুকে পারলে পাখাটাও বন্ধ করে দেয়। আমি রেগে গেলে ওকে ইংরেজিতে এসএমএস করি।

আর ও যখন ভয়ঙ্কর সব খিস্তি করে আমায়, তখন সবাই বোঝে এগুলো ওর ভীষণ ভালবাসার অভিব্যক্তি।

নানারকম কাজ প্রায়শই ওর মাথায় আছে। আর আমার ইচ্ছে না করলেও আমার তার মধ্যে থাকতে হয়। ভাবি—আহারে! না বললে ও কষ্ট পাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর একসময় বুঝি, যদি এই হাবিজাবিগুলোর মধ্যে ও আমাকে বারবার না ডাকত, কষ্টটা বোধহয় আমিই বেশি পেতাম।

যে ক'জন মানুষের জন্মদিন ঘুমের মধ্যেও মনে থাকে আমার—ও তাদের একজন। আজ বুম্বার জন্মদিন।

গত মাসের শেষ তারিখে আমার জন্মদিন গিয়েছে। ও আমাকে একটা এসএমএসও করেনি।

কিন্তু আমি তো আর ওর মতো অসভ্য নই, জানি জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে হয়। শুভকামনা করতে হয়।

যেন সারাজীবন ঠিক এই রকম ঝগড়া আর খেয়োখেয়ি করতে করতেই একসঙ্গে বুড়ো হয়ে যাই আমরা।

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০৭

ছোটবেলায় জানতাম মা'র আদরে আমার ভাগীদার কেবল আমার ভাই চিঙ্কু।

পরে বুঝলাম আরও দু'জন আছে।

মা'র ড্রেসিং টেবিলের দুটো জিনিস।

মার চুল বাঁধবার কালো দড়ি। সন্ধেবেলা বাড়িতে থাকলে গা ধুয়ে একটা বড়ি খোঁপা বাঁধত মা। আমার মতো গরমের বাতিক ছিল মা'রও—চুলটাকে টেনে ছোট্ট করে বেঁধে না ফেলা অবধি শান্তি হত না।

একটা লম্বা ট্যালকম পাউডার-এর কৌটো ছিল— খালি। মাঝে মাঝে পিঠে যখন খুব ব্যথা করত, পিঠের তলায় পাউডারের কৌটোটা রেখে শুত মা।

ওই চুল বাঁধবার দড়ি আর পাউডারের কৌটো যেন মা'র আর দুটো ছেলে। চিঙ্কু আর আমার মতোই ওরাও সারাজীবন মা'র আদর পেয়েছে। আমরা যখন বড় হয়ে মা'র কোলছাড়া হয়েছি, তখনও ওরা নিয়মিত পেয়েছে মা'র শরীরের উত্তাপ, মা'র সেই গায়ের গন্ধ যেটা নিকষ অন্ধকার ঘরের মধ্যে থেকেও কেবল একটাই শব্দ হয়ে জাপটে ধরে—মা।

আর ছিল মা'র সিঁদুর কৌটো। চকচকে, যেন ছোট্ট একটা মন্দির। ঢাকনাটুকু প্যাঁচকাটা—ফলে এমন শক্ত করে বন্ধ হত যে দেশবিদেশে হাজার ঘুরে বেড়ালেও মা'র সিঁদুরের ভাঁড়ার অক্ষয়। একটাই ইচ্ছে ছিল মা'র। রোগে-ভোগে, যৌবনে প্রৌঢ়ত্বে অবিচল এই ইচ্ছে। সিঁদুর নিয়ে যাওয়ার।

ওই দুর্মর স্বার্থপর ইচ্ছের সামনে একা পড়ে থাকা আমার বুড়ো বাবা চিরকাল বড় অসহায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজয়া দশমীর দিন পাড়ার মাসিমা কাকিমারা ভিন করতেন পুজো প্যান্ডেল-এ। এবং কোনও কোনও বছর নতুন কোনও পাড়ার বউদি। সেদিন বিকেল থেকে প্যান্ডেলে ঠাকুরের স্টেজের সামনে ছোট একটা সিঁড়ি দেওয়া হত। আর স্টেজের ওপর বসত তক্তপোষ। মা দুগ্গার সিঁথিতে সিঁদুর। ঠোঁটে সন্দেশ যেন ঠিকঠাক পৌঁছয়।

আমরা ছোটরা যে যে সাবজেক্টে কাঁচা সেই বইখাতাগুলো সব ক'জন ঠাকুরের পায়ে ঠেকাতাম। অন্য বইগুলো কেবল সরস্বতী আর দুগ্গা ঠাকুরের অটোগ্রাফ নিয়েই খুশি।

সেদিনটা ছিল আমাদের স্বাধীনতার দিন। দেবদেবীদের সঙ্গে বন্ধুতার দিন। ঠাকুর ছুঁয়ে দেখলে পাড়ার দাদারা বকতেন না। আমরা ঠাকুরের সুডৌল হাতে আঙুল বোলাতাম, বরাভয়ের অনামিকাটুকু ছুঁয়ে দেখলে মনেই হত না মাটির।

তারপর একসময়ে পাড়ার সব মাসিমা-কাকিমা-বউদিরা সিঁদুরটাকে আবির করে ফেলত। আর আমরা এক কোণে দাঁড়িয়ে মনে মনে হিংসে করতাম—ওদের কেমন বছরে দু'বার দোল!

আমরা বড় হলাম। মা বুড়ো হ'ল। যত না বয়সে, তার থেকে অনেক বেশি রোগে।

পুজোর ক'টা সন্ধে পুরনো কাফতানটা পরে বারান্দায় বসেই কেটে যেত। আলমারিতে নিঝুম ঘুমিয়ে থাকত পুজোর শাড়ি।

আর দশমীর দিন সন্ধে হলেই ডাক পড়ত আমার। চকচকে, প্যাঁচ দেওয়া, মন্দিরের মতো সিঁদুরকৌটোটা একবার ঠেকিয়ে নিয়ে আসতে হত মা দুগ্গার পায়ে।

মাঝে মাঝে পুজোর সময় বাবা জোর করে সঙ্গে নিয়ে বেরতো মা'কে।

—বাড়ি বসে থেকো না তো। চলো কাছাকাছি থেকে ঘুরিয়ে আনি।

ফিরে এসে প্রত্যেকবার মা বলত

—কোনওদিন আর ঠাকুর দেখতে যাব না তোর বাবার সঙ্গে। তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হতে না পারলে এমন বকে! তুই নিয়ে চল না বাপি।

নিয়ে গিয়েছিলাম একবার। সেই মা'র শেষ পুজো দেখা।

ম্যাডক্স স্কোয়ারের প্যান্ডেল অবধি গাড়ি যায় না। পার্কের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে চলচ্ছক্তিহীন, পঙ্গু মা'কে ধরে নিয়ে গিয়েছিলাম জগজ্জননীর সামনে।

সেদিন বিজয়া দশমী। প্যান্ডেল জুড়ে সিঁদুর খেলা চলছে। দেখতেই পাইনি কখন যেন মা দুগ্গা দশ হাত মুঠো করে সিঁদুর পরিয়ে দিল মা'কে।

দেখতে পেলাম যেদিন মা চলে গেল। আমি বম্বে থেকে ফিরে এসে দেখি নিজের বিছানায়, নিজের বালিশে চোখ বন্ধ করে ঘুমোচ্ছে মা। এক মাথা সিঁদুর নিয়ে।

আর সদ্য অনাথ হয়েছি আমরা দু'ভাই। মা'র মাথার কাছে বসে আছেন যে নিশ্চুপ মানুষটা, সে আমার বাবার আদ্ধেকটা কেবল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর বাকি আদ্ধেকটা যেন মা'র পাশে বিছানায় বালিশ পেতে শুয়ে। ঠিক যেন অগ্রদূতী নীলকণ্ঠ পাখি।

কেউ কবে হয়তো বলেছিল, চিল্কুর নাকি জলে ফাঁড়া আছে। তাই ছোটবেলায় পাড়ার ভাসানে যাওয়ার অনুমতি ছিল না আমাদের। চিল্কু যেতে পারবে না, অতএব আমারও যাওয়া বারণ।

চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতাম কেমন দশহাত মেলে মা দুগ্গা মিলিয়ে গেল পাড়ার মোড় পার করে। শুনতাম, দশমীর সন্ধেয় বাবুঘাটের গঙ্গার ওপরে, বাতাসে কারা যেন ভর করে। রোশনাই ভরা ঠাকুর যেই ঝুপ করে ডুবে যায় অন্ধকার জলে, অমনি তারা সব চারদিক থেকে উঠে এসে গলা টিপে ধরে, নীরব করে দেয় ব্যান্ডপার্টির হল্লা। পাড়ার মাস্তান দাদারাও কেমন যেন নিস্তেজ মনমরা বাড়ি ফিরে আসে।

শ্মশানের চুল্লির দরজাটা যেই খুলে গেল, সমবেত বলহরির মধ্যে কে যেন একটা বলে উঠল—দুগ্গা দুগ্গা।

রাতের অন্ধকারে বাবুঘাটে এসে দাঁড়ালাম আমরা দু'ভাই। মা'র অস্থি হাতে নিয়ে।

সামনে ছলছল অন্ধকার জল। পেছল সিঁড়ি আর অন্ধকার বেয়ে নিচে নেমে গিয়ে মা'কে গঙ্গায় ভাসান দিচ্ছে চিল্কু।

একবার গলা থেকে বেরিয়ে এল

—সাবধানে নামিস।

তারপরেই মনে হল কোনও ফাঁড়া নেই, কোনও বিপদ নেই।

রোগশয্যার সব উৎকণ্ঠা, সব দুশ্চিন্তা, নীলকণ্ঠ পাখির ডানায় ভর করে উড়ে গিয়েছে তারা ভরা আকাশে।

আজ থেকে সব অন্ধকারে, যে কোনও পেছলের সামনে একমাথা সিঁদুর পরে দশহাত মেলে আমাদের পাহারা দিচ্ছে আঠেরো নম্বর ইন্দ্রাণী পার্কের জগজ্জননী।

২১ অক্টবর, ২০০৭

মা চলে গিয়েছিল বড় চুপিচুপি। আমাদের সবাইকে ফাঁকি দিয়ে।

আমি তখন মাঝ আকাশে। বম্বে থেকে কলকাতা ফিরছি।

ভাই কলকাতাতেই, কোথাও কাজে ব্যস্ত।

বাড়িতে বাবা একা ছিল। প্রায় পঞ্চাশ বছরের জীবনসঙ্গীকে কেমন যেন বিহ্বল, 'অসহায় করে দিয়ে, ঠিক যেন বুড়ো আঙুল দেখিয়ে 'হেরো, হেরো' বলে চলে গেল মা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বম্বেতে প্লেনে ওঠার আগে আমি কথা বললাম মা'র সঙ্গে

—প্লেন ঠিক সময়েই ছাড়ছে, মা। সাতটা নাগাদ গাড়ি পাঠিয়ে দিও।

—কী খাবি রাত্তিরে? ভাতে ভাত করে রাখব?

মা জানত বেশ কয়েকদিন বাইরে কাটিয়ে ফিরলে বাড়ির বাতে ভাতটা আমার কাচে অমৃত।

প্লেন থেকে নামলাম দমদমে। গাড়িতে উঠলাম। যথারীতি ফোন করলাম বাড়িতে।

—পৌঁছে গিয়েছি। আসছি।

প্রভাতী, মা'র নার্স, ফোনটা ধরল। আমি শুনতে পেলাম কেমন যেন আতঙ্কিত গলায় বাবাকে ডাকছে,

—বাবা! দাদা এসে গিয়েছে...!

যেন কোনও সর্বনাশের খবর!

গোবিন্দ বহুবছর আমাদের গাড়ি চালায়। ও-ই এসেছিল আমায় নিতে।

গোবিন্দ জানত সব। আমাকে কিছু বলেনি। বাবা মানা করে দিয়েছিল বলতে।

গাড়িতে কেমন যেন থমথমে ভাব। খচখচ করছে মনটা। কেন যেন কু-ডাক ডাকছে বারেবারে। বাইপাশে গাড়ি থামালাম।

—কী হয়েছে গোবিন্দ? সত্যি কথা বল। গাড়ির উইন্ডক্রিনটা যেন সিনেমাস্কোপ পর্দা। সামনে রাস্তাজুড়ে চলমান হেডলাইটের জোনাকি।

আর, ড্রাইভারের সিটে অপরাধীর মতো মাথা নিচু গোবিন্দ।

—মা আছে না নেই?

কিছুটা বোধহয় সময় নিয়েছিল গোবিন্দ।

তারপর মাথা নেড়েছিল। বড় মৃদু, প্রায় গতিহীনভাবে।

ঠিক এভাবেই যেন বৈতরণীর সামনে দাঁড়িয়ে জীবনের সব আকুতিকে নস্যাৎ করে দিয়ে চিরকাল মাথা নাড়েন মহাকাল।

গাড়ির সিনেমাস্কোপ কাচে স্লো মোশনে ধরা রইল সেই মাথা নাড়া।

বাইরের আলোয় গোবিন্দর মুখের রেখায় লজ্জা, সংকোচ, অপ্রস্তুত।

চোখের সামনে বাইরের চলমান জোনাকিরা প্রথমে ঝাপসা হল, তারপর স্তব্ধ হল, তারপর যেন নিভে গেল চারপাশটা—ধূসর অন্ধকারে ঢেকে দিয়ে।

বাড়ি ফিরলাম।

মা মা'র বিছানায়, নিজের জায়গাটিতে শুয়ে। চোখ বন্ধ।

আমি মা'র দুগালে হামি দিলাম। বাইরে থেকে ফিরলেই যেমন দিই। তারপর গালটা বাড়িয়ে দিলাম বেয়াল্লিশ বছরের অভ্যেসে।

মা হামি দিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্মশান থেকে বাড়ি ফিরলাম অনেক রাতে।

বাবা শুতে গেল অনেক বলা কওয়ার পর। আর আমি একা বসে রইলাম একতলার বসবার ঘরে।

নিস্তব্ধ নিঝুম বাড়ি।

এতদিন ধরে নিজের ঘরের বিছানার কোণটুকুই ছিল যে মানুষটার গণ্ডি, বাড়ির বাকি ঘরগুলোয় যার পায়ের চিহ্ন পড়েনি প্রায় গত দু'বছর—সে যেন কেমন করে টুক করে নিজে নিজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে খাঁ খাঁ করে দিল আসবাবে ঠাসা গোটা দোতলা বাড়িটা।

মা বলত আমাকে,

—আমি আসব তোর কাছে। ঠিক আসব, দেখিস।

আর যদি না আসি, বুঝবি আত্মা আসতে পারে না।

আমি বিশ্বাস করেছিলাম মা'র কথা।

মা তো কখনও মিথ্যে কথা বলত না।

সবাই খুব অবাক হয়েছিল দেখে, যে যতটা ভেঙে পড়ার কথা আমার—তার তুলনায় আমি যেন অনেক বেশি শক্ত।

আসলে, মা'র ওই সান্ত্বনাটাই ছিল আমার শক্তি। জানতাম, মা যখন বলেছে ঠিক আসবে। আমাদের আবার দেখা হবে, কথা হবে।

মা তো আমাকে 'আসি' বলেও গেল না। তা কেমন করে হয়?

রাতের পর রাত জেগে থেকেছি আমি।

যদি মা আসে!

মা তো! এসে যদি দেখে আমি ঘুমিয়ে আছি, হয়তো ডাকবে না। চলে যাবে।

দেবীপক্ষের চাঁদ যখন থালার মতো গোল হয়, সেই রাতে নাকি লক্ষ্মীঠাকুর আসেন গৃহস্থের ঘরে।

ডেকে বলেন—কে জাগরে?

সেই থেকেই নাকি কোজাগরী!

পূর্ণিমার রজতরশ্মি বেয়ে নেমে আসে শ্রী, সৌন্দর্য, সমৃদ্ধি, শান্তি। আসেন কল্যাণী।

যে গৃহস্থ সারা রাত জেগে প্রতীক্ষা করে নিষ্ঠায়, ধৈর্যে—সে-ই নাকি পায় সেই অলৌকিক মঙ্গলস্পর্শ!

অনেক পূর্ণিমা পার হয়ে গিয়েছে, মা। নিশ্চন্দ্র নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মতো।

জ্যোৎস্নারাতে বনপ্রান্তে সবাই যখন উৎসবমগ্ন—আমি তো সত্যিই জেগে আছি ঠায়, এক অনন্ত প্রতীক্ষায়।

অসুস্থ হওয়ার পর থেকে ভাল করে হাঁটতে পারত না মা। পা টেনে টেনে হাঁটত। দূরে বারান্দা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে শুনতে পেতাম চটির খসখস আওয়াজ।

আজও মাঝরাতে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায়। ঘরের একটা আলো জ্বেলে দিই—অন্ধকারে মা যাতে হোঁচট না খায়। ঘরের দরজাটা হালকা করে ভেজিয়ে রাখি, ভাবি রোগা হাতে দরজা ঠেলে ঢুকতে যদি মা'র কষ্ট হয়!

রোগশয্যায় শুয়ে থাকত যখন দিনের পর দিন, আর আমি কাজে-অকাজে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছি এখানে সেখানে, এশহর-সে শহর, দুদ'ণ্ড দেখা হলেই বলত,

—আয়, আমার পাশে এসে শুয়ে থাক না একটু। এইটুকু মাথা নিয়ে এতকাজ করিস কী করে?

বলতাম,

—শুয়ে থাকার সময় নেই, মা। এই দ্যাখো না—অমুক আসবে, তমুক ফোন করবে, তমুকের সঙ্গে মিটিং...

মা বলত,

—এই তো আমার কাঁথাটা দিয়ে কেমন ঢেকে দেব তোকে। ছোটবেলায় যেমন দিতাম। আর কেউ তোকে খুঁজে পাবে না।

তারপর থেকে কত রাত জেগে সময় করেছি, মা।

রোজকার দিন থেকে তিল তিল সময় চুরি করে জমিয়ে রেখেছি এক অদৃশ্য লক্ষ্মীর ভাঁড়ে।

যেদিন আসবে তুমি, সেই ভাঁড় ভেঙে অনেক সময় বের করব আমরা। আর সারাদিন সারারাত পাশাপাশি শুয়ে অনেক গল্প করব। কাঁথামুড়ি দিয়ে।

দেখতে দেখতে পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় ভরে যাবে ঘর। নিবিড়কৃষ্ণ অরূপ অন্ধকার কান্তিময় হয়ে উঠবে শারদবিভায়, চাঁদের নরম আলো মুছে দেবে সমস্ত বিষাদ।

আর সেই অপূর্ব আলোর মাঝে বসে অদৃশ্য আমরা মা-বেটা গল্প করেই যাব, করেই যাব, করেই যাব। নিরন্তর।

মাগো; শুধু তুমি একবার এলেই কোজাগরী পূর্ণিমা হয়ে যাবে আমার সব দুখজাগানিয়া রাত।

২৮ অক্টবর, ২০০৭

কলকাতায় এবার কেমন যেন ঠান্ডাটা বেশ নাছোড়বান্দা হয়ে গেল।

গত কয়েকবছরের দু-একদিনের বুড়ি ছোঁয়া হঠাৎ যেন এবার বেশ ক'দিনের টানা থেকে যাওয়া।

গোটা ডিসেম্বর মাসটাই এবার ভোর ভোর বেরতে হল। আটটা থেকে কলটাইম। ফলে আরও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগে উঠে তৈরি হয়ে বেরনো।

আমার নতুন ছবি সব চরিত্র কাল্পনিক। পুজোর পরে হুজুগ করে হঠাৎ যখন তোড়জোড় তখন ভরসা ছিল অনেকদিন আগের লেখা একটা চিত্রনাট্যের ওপর। দেখা গেল সেটা প্রায় আদ্যোপান্ত বদলাতে হচ্ছে—ফলে প্রোডাকশন যে তিমিরে সেই তিমিরেই।

লিখতে লিখতে বোঝা গেল বিষয়টা বেশ গোলমেলে।

মানুষের মন বরাবরই আমার ছবির বিষয়। এবারে মুশকিলটা হল, সেই মনটার অবস্থান। যেন স্বপ্ন আর বাস্তবের মাঝামাঝি জায়গায়।

শুধু মন না বলে কল্পমন বলাই বুঝি ভাল

নিক্কো পার্ক-এর কাছে নতুন অরোরা স্টুডিওতে টানা সতেরো দিনের শ্যুটিং।

রোজ ভোরে উঠে বাইপাসের ধোঁয়াশা মাখা পথে রওয়ানা দেওয়া।

ঝাপসা পথঘাট। রোদের রং ম্লান বেগুনি। কলকাতায় এবার শীত পড়েছে।

শীতে আবার বাবার শরীরটা কাবু।

এই প্রথম বোধহয় শ্যুটিং-এর প্রথম দিন বাবা সেটে এল না।

আগে চিরকাল নিয়ম করে বাবা আর মা পুজো দিয়ে ইউনিটের সবাইয়ের জন্য মিষ্টি নিয়ে পৌঁছে যেতই প্রথম শটের আগে।

মা নিজে হাতে ইউনিটের সবার বুকে মাথায় ঠেকিয়ে প্রসাদ তুলে দিত হাতে। বাবা এল এবার অনেকদিন পর। মধ্যে কোনও একদিন। তাও সামান্যক্ষণের জন্য।

রোজই প্যাক হচ্ছিল রাত করে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে প্রায় সাড়ে দশটা—এগারোটা। দিন দুয়েকের মাথায় শ্যুটিং শেষে বাড়ি ফিরেছি। তখনও পরের দিনের ছোটখাটো প্ল্যানিং, টুকটাক দু-একটা দরকারি ফোন, শেষ মুহূর্তের যোগাড়যন্ত্র।

হঠাৎ শোওয়ার ঘরের দরজা ঠেলে দুর্বল দুটো হাতের পাতা উঁকি মারল।

বাবা। কটন উলের গলাবন্ধ গেঞ্জির ওপর হাতকাটা সোয়েটার। তার ওপর ছাইরঙা চাদর জড়ানো।

—বল বাবা।

—কেমন হচ্ছে তোমার কাজ?

—ওই হচ্ছে?

—ওই হচ্ছে, মানে? ভাল হচ্ছে না?

—হ্যাঁ, হচ্ছে...একদম গোড়ার দিকে তো, এখনও একটু...

—এখনও একটু কি?

—ওই সবকিছু ঠিক হতে একটু সময় লাগে নেবে তো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—তার মানে? দু'দিনের কাজ ভাল হয়নি?

—না, তা হয়েছে।

বুঝলাম তেমন মনঃপূত হ'ল না উত্তরটা। কিছুক্ষণ চুপচাপ, আবার শীর্ণ শুকনো হাতের পাতা দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল।

বেরিয়ে গেল উলিকটে ছাইরঙা শালে মোড়া এক পৃথিবী মঙ্গলাকাঙ্ক্ষ। কলকাতায় এবার বেশ শীত পড়েছে। শ্যুটিং-এর শেষ দিন।

প্রায় প্যাক আপ হবে।

সেট-এর মধ্যেই খবর এল—বেনজির ভুট্টো নিহত।

কিছুক্ষণ চাপা ফিসফাস, গুঞ্জন। মৃদু আফসোসের টুকরো।

—এমনটা তো হওয়ারই ছিল। বোঝাই তো গিয়েছিল সেই অক্টোবর মাসে।

—সত্যিই, দিনে দিনে কি যে হচ্ছে চারিদিকে। তারপরই আবার স্থিতাবস্থা। আপাত শান্তিকল্যাণ। শ্যুটিং-এ মোবাইল বন্ধ থাকে। গাড়িতে উঠে খুলতেই একরাশ মেসেজ।

নানা জায়গা থেকে বেনজির-এর মৃত্যুসংবাদ দিয়ে। কিছু কিছু মেসেজ মিডিয়া থেকেও—আমার প্রতিক্রিয়া জানতে।

সত্যিই কি ভয়াবহ মৃত্যু! নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার কি অভ্রান্ত পরিকল্পনা!

মরে তো সবাইকেই যেতে হবে! কিন্তু যদি মরতে মরতেও জেনে যায় মানুষ যে তার জন্য কতটা বিদ্বেষ জমা হয়েছিল এই পৃথিবীরই আরেকটি মানুষের মনে!

সত্যিই কি এবার এত ঠান্ডা পড়েছে?

—জানলার কাচ বন্ধ কর, গোবিন্দ! গোবিন্দ গাড়ির জানলার কাচ বন্ধ করে দিল।

ধোঁয়াশার ঘোমটা পরা বাইপাসের আলোর সারি।

বাড়ি ফিরে দেখি টিভির সামনে বাবার চেয়ারটা খালি। প্রভাতী, ছবি টিভি দেখছে।

—দাদু কোথায়?

—ঘরে শুয়ে।

বাবার শোওয়ার ঘরে ঢুকে দেখি ছাইরঙা চাদরটা টেনে নিয়ে শুয়ে আছে বাবা।

—বাবা, টিভি দেখছ না?

নিষ্পলক শুকনো মুখ ফিরে তাকাল। নির্বাক

—বেনজির ভুট্টো মারা গিয়েছে, জান?

মাথা নাড়াল বাবা—জানে।

—টিভি দেখছ না?

—এত খুন জখম ভাল লাগে না আমার আর। সারাজীবন তো এই দেখে এলাম—আর ভাল লাগে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—তোমার শরীর ভাল আছে? শুয়ে পড়েছ যে!'

—এমনি শুয়ে আছি। কাজ কেমন হল?

—ভাল। এই শেডিউলটা শেষ হয়ে গেল আজ।

—তোমার জন্য বড়দিনের কেক এনেছিলাম। ছবি রেখে দিয়েছে। একটু খেও।

কলকাতার তাপমাত্রা কিছুটা যেন বাড়ল। কনকনে শীতে আরামের উত্তাপ।

শীর্ণ শরীর জড়িয়ে রাখা ছাইরঙা চাদরটা যেন এক পৃথিবী ওম নিয়ে জাপটে ধরল আমায়। আর অত শীত করছে না।

টিভিতে খবর চলছে। সন্ত্রাসের পর ছিন্নভিন্ন মানবশরীর। যেন মাটির ঢেলা। এবার গরম লাগছে। কানে। গলায়। ঘাড়ে। তারপরেই ভাবলাম—দূর!

ইসলমাবাদে বোমা ফাটলে কলকাতায় গরম লাগে বুঝি!

সিনেমার কল্পমনের ব্যাপারটাকে একটু বেশিই সিরিয়াসলি নিয়েছি বোধহয়। আজ না আমার শ্যুটিং শেষ! এতক্ষণ না আমার অন্য সহকর্মীরা সামপ্লেস-এলস-এ। তবে?

গলা তুলে বললাম—

কিন্তু! হালকা করে এসিটা চালিয়ে রাখ তো! হঠাৎ করে কিরকম গরম পড়ে গেল।

৬ জানুয়ারি, ২০০৮

AMARBOI.COM

এর মধ্যে বাবা হাসপাতালে ভর্তি হল, হঠাৎ-ই।

কয়েকদিন ধরে বিমর্ষ হয়ে ছিল কেমন, কথাও বলছিল না বেশি কারও সঙ্গে। সেদিন সকাল থেকে দু'বার বমি করল। তারপর থেকেই চোখের দৃষ্টি কেমন ঘোলাটে, একটা অস্থির অন্যমনস্কতা, আর সম্পূর্ণ মৌনতা।

'বাবা' বলে ডাকলে যেন কোনও সুদূর দেশ থেকে সাড়া দিচ্ছে কেবল দৃষ্টি দিয়ে। মুখে কিছু বলছে না।

চিন্তা হ'ল। তপনদা, ডাঃ টি কে ব্যানার্জি। মা'র অসুস্থতার সময় থেকে আমাদের পরিবারের সঙ্গে যুক্ত, আমাদের মেডিক্যাল অভিভাবক প্রায়। তপনদা সঙ্গে সঙ্গেই পরামর্শ দিলেন—বাড়িতে রেখো না, হাসপাতালে ভর্তি করে দাও।

শ্রী অরবিন্দ সেবাকেন্দ্র (ই ই ডি এফ) আমাদের বাড়ি থেকে পাঁচ মিনিটের পথ। মা'র অসুস্থতার একটা বড় সময় আমাদের বাড়ির সকলেরই ওখানে কেটেছে—নিয়মিত যাতায়াত করতে করতে আমরা ওই হাসপাতালের প্রায় সব সদস্যকে হয় মুখে, নয় নামে চিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর বাবার প্রতি ওখানকার ডাক্তার নার্সদের একটা আলাদা মনোযোগও আছে।

তক্ষুণি ফোনে যোগাযোগ করে ভর্তি করে দেওয়া হল।

বাড়ি থেকে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার সময় দোতলা থেকে একতলায় নামতে বাবার যেন কয়েক যুগ লাগল।

ভর্তির ফর্ম, কাগজপত্র, মেডিক্যাল রিপোর্ট গুছিয়ে ইনটেনসিভ কেয়ারে বাবাকে ভর্তি করিয়ে যখন ফিরে আসছি, তখন ওঁরা ই সি জি চালু করছেন।

বাবার পাঞ্জাবি ছাড়িয়ে হাসপাতালের পোশাক পরানো হচ্ছে।

ঘাড় ঘুরিয়ে একবার বাবার বেড-এর দিকে তাকালাম। শীর্ণ, ছোট্ট হয়ে যাওয়া একটা পিঠ, বাধ্য ছেলের মতো দু'হাত তুলে বাবা জামা পরছে—যেন স্কুলে যাবে।

দুই

রাত্তিরেই সিটি স্ক্যান হল। কতগুলো ইনফ্রাক্ট (Infract) ধরা পড়েছে—স্বাভাবিকভাবে মস্তিষ্কে যে রক্তচলাচল হওয়া উচিত সেটা ব্যাহত। ফলে বাবার চেতনা এবং স্মৃতির ওপর তার প্রকোপ বেশ তীব্র।

পরেরদিন সকালে এমার্জেন্সি পাস নিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

দেখি বাবা দিব্যি চোখ মেলে চেয়ে। আমায় দেখে চিনতেও পারল।

প্রথমেই প্রশ্ন,

—তুমি কোথা থেকে এলে?

—বাড়ি থেকে।

—তুমি জানলে কী করে আমি এখানে আছি?

যতটা অবাক হওয়ার কথা, ততটা হলাম না। হাসপাতালে এলেই এই স্থান-কাল-পাত্র বিভ্রান্তি মা'রও আগে হতে দেখেছি। বাবারও হয়েছে। সাধারণত সবাই তখন হাঁ হাঁ করে বোঝাবার চেষ্টা করে যে, তুমি যা ভাবছ তা ভুল, আমার পদ্ধতিটা একটু অন্যরকম। আমি চেষ্টা করি তাদের সেই তাৎক্ষণিক কাল্পনিক জগতটার মধ্যে একটু ঢুকতে। আমি পাল্টা জিজ্ঞেস করলাম

—তুমি এলে কী করে এখানে?

বাবা কিছুক্ষণ চুপ হয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে বলল,

—তুমি জানো না?

আমি একটু অজ্ঞানতার ভান করলাম।

—ঠিক মনে পড়ছে না। বলো।

বাবা প্রায় ফিসফিস করে বলল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—আমাকে তো এখানে ধরে এনেছে।

আমি কথা বাড়ালাম না। বললাম—ও!

এবার বাবার প্রশ্ন,

—তুমি জানতে পারলে কী করে? তোমায় খবর দিল কে?

আমি অল্পক্ষণ ভাবলাম, তারপর বললাম

—আমার অফিস থেকে খবর দিল। খবরের কাগজের অফিস তো! ওরা সব খবর পায়।

বাবাকে বেশ নিশ্চিন্ত দেখাল। ধীরে ধীরে বলল,

—আমাকে কিন্তু খুব যত্ন আত্তি করছে। কাল রাত্রে একটি ছেলে, এই তোমাদের বয়সীই হবে, বলল—মেসোমশাই আপনি এবার ঘুমোন।

আমি বললাম,

—হ্যাঁ, ওরা তোমায় চেনে তো।

মা যখন ভর্তি ছিল, তুমি তো রোজ আসতে। তোমায় চেনে তাই!

বাবার এবারের কথাটার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না।

—ধ্যাৎ! তোমার মা তো অরবিন্দ সেবা কেন্দ্র-য় ছিল।

আমি বললাম,

—হ্যাঁ! এটাই তো সেটা।

ওরা নতুন আই সি ইউ করেছে। তুমি তাই চিনতে পারছ না।

এরপর বাবা যেটা বলল, তার সঙ্গে পাল্লা বোধহয় কোনও কল্পনাশক্তি দিয়েই দেওয়া যায় না।

—কী যা তা বলছ? এটা আই সি ইউ হবে কেন?

—তবে কী এটা?

—এটা একটা রিসার্চ সেন্টার। এখানে যারা রয়েছে তারা কারা, জানো?

—কারা?

—এদের সব ধরে এনেছে—এরা নাকি আসলে হিউম্যান বম্ব

—কী!

—হ্যাঁ। সোনিয়া গান্ধীর মনে ভয় ঢুকে গিয়েছে। স্বামী গিয়েছে—ছেলেটা তো আছে, ও নিজে আছে। তাই যাকেই সন্দেহ হচ্ছে ধরে এনে পরীক্ষা করে দেখছে, তারা সত্যি সত্যি মানববোমা কিনা, অমনি তাদের ডি-অ্যাকটিভেট করে দিচ্ছে।

আমার আর কোনও কথা মুখে জোগাল না। শুধু বললাম,

—তুমি ভেবো না। একটু ভাল হয়ে যাও। তোমায় বাড়ি নিয়ে যাব। কেউ কিছু করবে না তোমায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একনাগাড়ে অনেকক্ষণ কথা বলার জন্যই হোক, আর শারীরিক দুর্বলতার কারণেই হোক, বাবা আর কথা বলল না। চোখ দুটো বন্ধ করল কিছুক্ষণ।

তিন

আমার বাবা বড় হয়েছে বাংলাদেশের গ্রামে। আমাদের মতো সুরক্ষিত জীবন ছিল না বাবার। স্বাধীনতা সংগ্রামের গোপন চিঠি পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে বালকবাহিনী ছিল—বাবা ছিল তাদের মধ্যে একজন। অমাবস্যার রাতে নদী সাঁতরে গোপন খবর পৌঁছে দেওয়ার অনেক অভিজ্ঞতার গল্প বাবার কাছে শুনেছি। তারপরে রাতারাতি ছিন্নমূল হয়ে এই বাংলায় চলে আসবার পরও বাবাকে ক্ষুব্ধ হতে দেখেছি, কিন্তু ভয় পেতে দেখিনি কখনও।

বাবার জীবনের একটাই ভয় ছিল—আমার মা'র অসুস্থতা। তাছাড়া, সর্ব অর্থেই সত্যিই বাবার মতো নির্ভীক মানুষ আমি বড় একটা দেখিনি।

হয়তো এটা সাময়িক কোনও ডিমেনশিয়া। ডাক্তাররা অন্তত তাই বলছেন।

বয়সের পলিতে ক্লান্ত মস্তিষ্ক যেন সদাজাগ্রত হয়ে থাকত কেবল মা'র ওষুধ কখন কোনটা বাদ পড়ে যাবে এই ভয়ে।

মা চলে যাওয়ার পর থেকে সত্যিই বাবা আর সচেতন সক্রিয়ভাবে মস্তিষ্ক সঞ্চালন করেছে বলে মনে হয় না। সেই আলস্যের পথ ধরে ঢুকেই পড়তে পারত হৃদয়ের সমস্ত জং, ছড়িয়ে পড়তে পারত মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষে।

কিংবা হয়তো বা এতদিনের নির্ভীক মস্তিষ্কটুকু ভারি হয়ে উঠত কোনও নিরালম্ব শূন্যতায়।

কিন্তু এই বিভীষিকা কোথা থেকে ঢুকে পড়ল আমার বাবার মাথার ভেতর!

চিরকাল মনে হয়ে এসেছে বাবাদের সময়টা যেন এক পুরাণকাল। সেখানে আমবাগানের ছায়া, সেখানে রূপোলি ইলিশ মাছের ঝাঁক, সেখানে বটের আঠার মতো ঘন দুধ, সেখানে ঈদের দিনে সেজেগুজে নৌকো করে বন্ধুর বাড়ির দাওয়াত-এ যাওয়া।

সেই জগতে লোভ নেই, ভয় নেই, ক্লান্তি নেই। ভালবাসার কোনও সীমানা নেই।

কেমন করে সেই জগতটাতে ঢুকে পড়ল পরমাণু চুক্তি-বেনজির ভুট্টো—রাষ্ট্রীয় অত্যাচারের অমন বিভীষিকাময় সদাজাগ্রত ত্রাস!

কথা তো দিয়ে এলাম, কিন্তু কোন বাড়িতে নিয়ে আসব বাবাকে? কারণ আমার বাবা বাড়ি হারিয়েছে ওপার বাংলায়, কিন্তু এখনও তো বাড়ি বলতে মানুষটা একটা নিরাপদ আশ্রয়ই বোঝে।

মহাভারতে পড়েছিলাম, বেদব্যাস শোকবিহ্বলা সত্যবতীর কাছে এসে বলেছিলেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—মাতা, সুখের দিন শেষ হয়েছে। পৃথিবী এখন বিগতযৌবনা। ক্রমশ পাপের বৃদ্ধি হবে। চলুন, আমরা এই প্রাসাদ ছেড়ে বাণপ্রস্থে যাই।

বাণপ্রস্থে বসে বাকি জীবনটুকু কেমন করে কাটিয়েছিলেন সত্যবতী, মহাভারতকার আমাদের সে কথা জানান না। আমরা জানি না, কোন অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু আমরা একথা জানি হস্তিনার অদূরে, যমুনার তীরবর্তী বহুপ্রাণীসমাকুল এক মনোহর খাণ্ডব অরণ্য ছিল। যে অরণ্য অগ্নির মান্দ্য উপসমার্থে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন কৃষ্ণার্জুন। নিহত হয়েছিল অসংখ্য প্রাণ।

কে জানে হয়তো সেই মহামারণযজ্ঞে সন্তানধাত্রী তক্ষকপত্নীর মতোই ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিলেন অসহায়া বৃদ্ধা কুরু প্রপিতামহী! তারপর একদিন সে ভস্মরাশির ওপরে নির্মিত হয়েছিল পাণ্ডবদের মহামহিম ইন্দ্রপ্রস্থ।

সুখের সময় সত্যি শেষ হয়েছে, বাবা।
এখন নিউক ডিল হবে। নন্দীগ্রাম হবে।
মানববোমা হবে।
স্তোকের দিনও শেষ হয়েছে, বাবা। বাড়ি হয়তো ফিরিয়ে আনব তোমায় ঠিকই। কিন্তু টেলিভিশনের পর্দার নিত্যকার রুধিরাক্ত অর্ধদগ্ধ মৃতদেহের তাড়া করা দুঃস্বপ্ন থেকে তোমাকে কতটা বাঁচিয়ে রাখতে পারব, জানি না।

AMARBOI.COM

২০ জানুয়ারি, ২০০৮

মাতৃভাষা

আসলে দু'জনে একই ভাষায় কথা বলত,
কেবল আমিই বুঝতে পারিনি....

মা এমনিতে বলত 'তুই'। রেগে গেলে বলত 'তুমি'।

পড়তে বসার সময় হলে ছ'টা পাঁচ বাজলে মা বলত 'সাড়ে ছ'টা বাজতে চলল, এখনও পড়তে বসলে না।'

আর আটটা পঁচিশে বই বন্ধ করলেও অবধারিতভাবে শুনতে হ'ত 'আটটা বাজতে না বাজতেই হয়ে গেল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি আর চিঙ্কু দু'টো ভাষার তফাৎ পরিষ্কার বুঝতাম।

আমি ছিলাম মা'র গুগল-সার্চ। প্রায়ই হয়েছে, ডেকে বলল, 'হ্যাঁরে, ওই সিনেমার সেই গানটা কী রে?'

আর, আমায় বুঝে নিতে হ'ত মা এখন ঠিক কোন গানটার কথা বলতে পারে। বলে দিলে একগাল হেসে মা বলত 'এইজন্যই তো তোকে বলি।'

মাতৃভাষার এই অধিকারটা কেবল আমার জন্যই তোলা ছিল। এই আদান-প্রদানে চিঙ্কুর বিশেষ একটা ভূমিকা ছিল না।

স্মৃতি আর বোধের সম্মিলনে যেশব্দ তৈরি হয়, মা'কে সেটা তক্ষুনি জোগান দিয়ে তখন বেশ একটা বাহাদুর ভাব হ'ত।

আজ স্মৃতিভ্রষ্ট বাবার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে চরম অপদার্থ মনে হয়।

২

আমার বাবা বাঙাল। ঢাকা বিক্রমপুর। মা'র আদিবাড়ি খুলনা হলেও জন্মকর্মো সব এপার বাংলাতেই।

আমাকে তাই চট করে বাঙাল বলে চিনতে পারে না কেউ। কেবল আমার মেজাজটা ছাড়া।

ঘটির অনেকগুলো ত্রুটিই আজও আমার বাচনভঙ্গিতে রয়ে গেছে।

আমি 'সতেরো' বলি না, 'সাতেরো' বলি। প্রয়োগটাকে তীব্র করার জন্য 'লোভী' শব্দটাকে 'লুভী' বলি—এগুলো সবই আমার মা বা দিদাই-এর কাছে শেখা।

দিদাই বারান্দাকে বলত বারান্ডা। মা'র উচ্চারণটায় ড'টা অত স্পষ্ট নয়। কেমন যেন 'দ' আর 'ড'-এর মাঝামাঝি কোথাও একটা তিরতির করত।

আজ আমি যতবার বারান্দা কথাটা উচ্চারণ করি, মনে মনে কোথায় যেন একটা মনখারাপ হয়—যেন পণ্ডিতি করে মা'র আদরের ভুলটাকে শুধরে দিচ্ছি।

বাবার বন্ধু ছিল অজিতকাকু। সতর্ক না হলেই বাবা 'ওজিত' বলে ফেলত, আর মা আর অজিতকাকু বেজায় হাসত। বাবা কোনওদিন 'সোত্যোজিৎ রায়' উচ্চারণ করেনি—বলত 'স-অ-ত-অ-জি-ৎ রায়।' বন্ধুবান্ধবের সামনে কী লজ্জাটাই না করত!

বাবা তখন মা'র সঙ্গে সবে প্রেম করছে। নতুন প্রেমিকাকে ইমপ্রেস করবার জন্য হয়তো বা কবিতা মুখস্থ বলতেন পঞ্চাশ বছর আগের মানুষেরা।

বাবা বলেছিল

—পচ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার...

কতদিন অবধি যে মা, বাবাকে এটা বলে ক্ষেপিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা-মা'র বিয়ের সময়, বাঙাল পুরুতমশাই বিবাহানুষ্ঠানের কোনও একটা পর্যায়ে এসে কনেকে বলেছিলেন, 'বরের কান্ধোটা ধরেন।' মা বুঝেছিল-কান দুটো ধরতে হবে। বিয়ের আসরে বাধ্য মেয়ের মতো দু'হাত দিয়ে বাবার দুটো কান মুলতে গেছিল—সবাই মিলে হাঁ হাঁ করে উঠেছিল।

আমার জন্মের আগের সেই পারিবারিক কিংবদন্তীগুলো যখন আজকের আমি'র সঙ্গে জুড়ে নিই, তখন মনে হয় এ সবই যেন আমার ভূমিষ্ঠ হবার এক হাস্যোজ্জ্বল নান্দীমুখ।

৩

মা'র কথা বলতে হলে বাবা সবসময়ে বলত 'তোমার মা।' মা মাঝে মাঝেই পুরনো অভ্যেসে বলে ফেলত 'সুনীল।'

হয়তো মা কোথাও গেছে, ফোন করেছে বাড়িতে বাবার সঙ্গে কথা বলবে বলে, ফোনটা ধরেছি আমি, অনেক সময় হয়েছে মা বলেছে,

—সুনীলকে দে তো ফোনটা।

আমার বেজায় আমোদ হ'ত। ইচ্ছে করে বাবার কাছে, এসে বলতাম,

—সুনীল, তোমার ফোন।

বাবা যারপরনাই লজ্জা লজ্জা মুখ করে গিয়ে ফোনটা ধরত। ভাবটা এমন, যে ছেলেদের সামনে এই আদিখ্যেতাটা না করলেই চলছিল না।

আজ থেকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের মায়ের মুখে কোনওরকম দরখাস্ত, আবেদনপত্র, ফর্ম ফিল-আপ ছাড়াই যে বাবার নামটা কেমন সহজতায় উচ্চারিত হচ্ছে সেটাই যেন ছিল আমার বড় হয়ে ওঠবার প্রথম রোমাঞ্চ।

চারবছর আগে। আমি তখন বম্বেতে। 'রেনকোট'-এর ডাবিং চলছে। হঠাৎ খবর এল মা'র একটা ভারি রকমের সেরিব্র্যাল অ্যাটাক হয়েছে।

চিঙ্কুরাও তখন কলকাতার বাইরে। বাড়িতে বাবা একা। বেশ কিছুদিন মা তখন প্রায় জড়ভরত, শূন্যমস্তিষ্ক, চেতনাহীন।

দ্বিতীয় দিন বাবার ফোন এল—

—কাউকে চিনতে পারছে না।

আমি সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম

— দু'দিন যেতে দাও, পারবে।

—কী করে বলছ পারবে? আমাকে আজ চিনতে পারেনি, জানো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— কী বলল?

— কিছু বলল না। আমি কত বললাম, আমি সুনীল, আমি সুনীল... কিছু বলল না।

সন্তানের সামনে মা'র নিজের স্বামীকে সম্বোধন করার যে ব্যক্তিগত ভঙ্গিটি এতদিন বাবাকে বিব্রত করেছে, আজ এই চরম বিপর্যয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কখন যে সে লজ্জা অন্তর্হিত, বাবা তা নিজেও জানে না। কে জানে, বাবার বোধহয় মনে হয়েছিল আজীবনের সঙ্গীর চেতনার সাড়া ফেরানোর জন্য 'সুনীল' ডাকটাই বুঝি এক অমোঘ জিয়নকাঠি।

আর যে আমি, এতদিন জানতাম বাবা সম্পর্কে মা'র ভাষা আর মা সম্পর্কে বাবা'র ভাষা আসলে কতটা আলাদা—ফোনের অপরপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সেদিন সেই বম্বের বিকেলে বুঝতে পারলাম—আসলে দু'জনে একই ভাষায় কথা বলত। আমি বুঝতে পারিনি এতদিন।

৪

মা-বাবাকে ছবি আঁকতে আমি বড় একটা দেখিনি।
সেটা যেন আমার শৈশবের এক প্রচ্ছন্ন পুরাণ।
ছোটবেলায় সঞ্চয়িতা পড়ে শোনাত মা।
'ছোট্ট মেয়ে রোদ্দুরে দেয় বেগনি রঙের শাড়ি'
মনে মনে সেই আমার প্রথম সিনেমা দেখা।

AMARBOI.COM

আমার নিতান্ত ছোটবেলায় বাবা-মা'র প্রাক্তন আর্ট কলেজের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের জায়গা ছিল সপ্তাহান্তের সন্ধ্যাবেলার অ্যাকাডেমি ফাইন আর্টস চত্বর। সবে হাঁটতে শেখা আমিও নিয়মিত যেতাম বাবা-মা'র সঙ্গে।

আর আমার যখন খেলতে ইচ্ছে করত, আমাকে ছেড়ে দেওয়া হ'ত অ্যাকাডেমির আর্ট গ্যালারির টানা লম্বা করিডর-এ। আমার কাছে সেটা ছিল টলোমলো পায়ে ছুটে বেড়াবার একটা সুদীর্ঘ পথ। মাঝে মাঝে আমি থামতাম দেওয়ালে টাঙানো বড় বড় ক্যানভাসগুলোর সামনে—এতা কী? এতা কী?

আর বাবা মা'র বন্ধুরা, পরে যারা আমার অমুককাকু তমুকমাসি হয়ে গেল, তারা সবাই আমায় রঙ চেনাত।

সে বয়সে বাচ্চারা লাল, নীল, হলুদ, সবুজ ছেনে সবেমাত্র খয়েরি বা বেগনি রঙটাকে চিনতে শেখে, সে বয়সে আমি Chrome yellow আর Yellow ochre এর তফাৎ জানি।

এখন বুঝি, যেই ভাষাকে আঁকড়ে ধরে কাছে এসেছিল আর্ট কলেজের দুই তরুণ তরুণী, বেছে নিয়েছিল এক বিচিত্রবর্ণ জীবন—যার বিস্তার সেই টলোমলো পা শিশুর কাছে অ্যাকাডেমির করিডর-এর মতোই সুদীর্ঘ, অন্তহীন; প্রথম সন্তানের মধ্যে সেই ভাষাকে সঞ্চারিত না করতে পারলে বুঝিবা কোথাও অসম্পূর্ণ মনে হচ্ছিল তাদের যুগলজীবন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চারবছর আগে ওই ভারি স্টোকটার পর আড়াই মাস কোমায় ছিল মা। ভাবিইনি মা বাড়ি ফিরে আসবে। দিনের পর দিন হাসপাতালে মাথার কাছে অধীর হয়ে বসে থেকেছি যদি একবার চোখ মেলে তাকায়। রোজ সন্ধেবেলা ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হয়ে গেলে হাসপাতাল থেকে বেরবার সময় মনে হ'ত—এই বুঝি শেষ দেখা, কাল এসে আর দেখতে পাব না। রোজ ঢোকার সময় বুক টিপটিপ করত—আজ বুঝি আরও খারাপ দেখব।

একদিন সকালবেলা বাবা আর আমি মাকে দেখতে গেছি।

মা'র চোখ খোলা, তাকাচ্ছে। চিনতে পারল আমাদের। মা'র হাতে স্যালাইন। আর ব্লাড, ড্রিপ দেওয়ার চ্যানেল করা। তার নীল রঙের প্লাস্টিকের ক্যাপ। কী মনে হতে বাবা জিগ্যেস করল,

—এটা কী রঙ, বলো তো?

কিছুক্ষণ ভেবে মা বলল

—সে-রে-লিয়ান ব্লু।

বাবার চোখে জল টলটল করছে

—এই তো! বলতে পারছে। ঠিক বলেছে তো!

তারপর ঝুঁকে নিচু হয়ে মা'র কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে যেন ফিসফিস করে বলল,

—হ্যাঁ। একটু হোয়াইট মিশিয়ে।

মাথা নাড়ল মা। মেনে নিয়েছে সেই রঙের রসায়ন।

আর আমি সেই সকালবেলার কেবিনে একটু দূরে দাঁড়িয়ে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে ভাবলাম—জীবনের আর যে কোনও ভাষার মতো মাতৃভাষাও বড় মধুর। বড় লাবণ্যময় একটা রহস্য আছে। সেটা না হয় অধরাই থাকল।

২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮

শুটিং-এর প্রথম দিনগুলো কেমন যেন বিরস হয়ে গিয়েছে আমার কাছে।

আমার ছবিতে কোনওদিন মহরৎ হয়নি। আমার মা বাবা কেবল আসত পুজো ইউনিট-এর সবার জন্য সন্দেশ নিয়ে।

এই পয়লা বৈশাখ আমার নতুন ছবির শুটিং শুরু হল। ছবির নাম 'আবহমান।

মনে পড়ে বছর আষ্টেক আগের এক পয়লা বৈশাখের কথা। রীণাদির 'পারমিতার একদিন'-এর শুটিং শুরু হওয়ার দিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হরি ঘোষ স্ট্রিটের কোনও একটা বাড়িতে শুটিং হচ্ছে। ছবিতে রীণাদি যে চরিত্রটা করেছিল—সনকা, তার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান।

উত্তর কলকাতার প্রশস্ত বাড়ির ছড়ানো উঠোনে সনকার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের ব্যবস্থা। শ্রাদ্ধের শুটিং দিয়ে ছবি শুরু।

মা, বাবা, আমি গিয়েছি প্রথমদিনের শুটিং-এ। মা'র হাতে যথারীতি প্রসাদী ফুল আর মিষ্টি।

উঠোন চত্বরে ঢুকেই মা'র চোখ পড়ল রীণাদির সনকার বেশে একটা ছবি বাঁধানো। শ্রাদ্ধের জায়গায় রাখা।

যেন কী এক প্রবল আন্তরিক আপত্তিতে ভুরু কুঁচকে উঠল মা'র। রীণাদিকে বলল,

—তোর ছবিটা এখান থেকে সরিয়ে ফ্যাল।

রীণাদি মজা করেই উত্তর দিল,

—ওটা তোমার মেয়ের ছবি নয় মাসিমা। ওটা সনকা।

মা চলে যাওয়ার পর থেকে শ্যুটিং শুরুর দিনগুলো সত্যিই আর অমন আনন্দের নয়।

বাবা একা একা আর পারেও না ঠেঙিয়ে আসতে অতদূর। শরীরেও দেয় না বোধকরি।

তবু যেন কেন এই পয়লা বৈশাখেও পোর্টল্যান্ড পার্ক-এর একটা বাড়িতে অসহ্য গরমের মধ্যে ঘামতে ঘামতে, শ্যুটিং-এর জোগাড়যন্ত্র করছি আর কেন যেন মনে মনে আশা করছি একটু পরেই কোনও একটা দরজার ফাঁক দিয়ে একটা শাড়ির পাড়, একটা চটি পরে খসখস করে চলা পায়ের আওয়াজ পাব।

প্রায় দু'বছর হয়ে গেল মা চলে গিয়েছে।

এর মধ্যে আমার তিনটে ছবি হয়ে গিয়েছে। চতুর্থ ছবি শুরু।

এতদিনে কি অভ্যেস হয়ে যাওয়ার কথা ছিল না?

বছর যখন বিদায় নেয়, নতুন বছরের সংখ্যা তারিখ লিখতে গিয়ে কতবার গুলিয়ে ফেলি আমরা। অভ্যাসবশত গত বছরের সংখ্যা লিখি আর চেকের পাতা নষ্ট হয়।

তারপর একসময় শুধরে যায় তো!

তাহলে কি কিছু কিছু বিদায়ের স্মৃতি সত্যিই শুধরোবার নয়।

না কি না শুধরোনোই ভাল?

জোর করে, ইচ্ছে করে মনসংযোগ করলেই মন সবকিছু বাতিল করতে পারে না বোধহয়।

যেই এই কথাটা যুক্তি দিয়ে বোঝালাম নিজেকে, বোঝালাম—যে কাজ, রোজগার কোনওকিছুই তো থেমে থাকতে পারে না, কোনও মানুষের অভাবে—অমনি মনে পড়ল বাড়িতে একা বসে থাকা বাবার কথা।

আমি তো লোকজন, অভিনেতা-অভিনেত্রী, ক্যামেরা-আলো'র মধ্যে বসে হয়তো বা কয়েকবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মিস' করব মা'কে।

আর সে মানুষটা যে কেবল অ্যাটেনডেন্ট আর নার্স পরিবৃত হয়ে পড়ে রইল বাড়িতে একা।

হয়তো বা জানলও না, যে নতুন করে শুরু হয়ে গেল আবার এক দীর্ঘ শূন্যতার একাকীত্বের নববর্ষ।

পোর্টল্যান্ড পার্ক-এর বিশাল বাড়ি।

তার বাইরে মাঝেরহাট ব্রিজ।

তার ওপারে মিন্ট। আমাদের কলকাতা শহরের টাঁকশাল ভবন।

মনে পড়ল বছর চল্লিশেক আগের একটা টুকরো ছবি।

মাঝেরহাট ব্রিজ দিয়ে ট্যাক্সি করে চলেছে এক যুবক, যুবতী এবং তাদের শিশুপুত্র।

অতবড় গেটওয়ালা বাড়ি শিশু আগে দেখেনি।

—ও'টা কী বাবা?

—ও'টা মিন্ট। ওখানে পয়সা তৈরি হয়।

—অত বড় বাড়িতে কত পয়সা তৈরি হয় বাবা?

—অনেক পয়সা।

—অত পয়সা দিয়ে কী হয় বাবা?

—বড় হও। বুঝবে?

AMARBOI.COM

২৭ এপ্রিল, ২০০৮

সত্যি কথা বল তপনদা, মা'কে বাড়ি নিয়ে যেতে পারব কি না?

তপনদা, ডাঃ তপন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নিরাশ করার মানুষ নন।

অথচ বুঝতেও পারছেন বোধহয়, যে সম্পূর্ণ নিশ্চিত করাটা বড্ড বেশি আশা দেওয়া হয়ে যাবে।

শান্ত গভীর স্বরে বললেন,

—অত চিন্তা কোরো না। দেখি না ক'দিন। চিকিৎসা তো চলছে।

চার বছর আগের এপ্রিল মাসের বারো তারিখ। আমি বম্বেতে, রেনকোট-এর ডাবিং-এ ব্যস্ত; বাবা কলকাতা থেকে ফোন করল সক্কালবেলা।

মা'র একটা ভয়ঙ্কর সেরিব্র্যাল অ্যাটাক হয়েছে, আই সি ইউ-তে ভর্তি করতে হয়েছে। মা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গভীর অচৈতন্যে, কোমার সুষুপ্তিতে।

চিঙ্কু আর দীপান্বিতা, আমার ভাই আর ভাইয়ের বউ, বেড়াতে গিয়েছে পাহাড়ে। আমি বম্বেতে গত একমাস। কলকাতায় বাবা একা।

চিঙ্কু দীপান্বিতা ফিরে এল পরদিনই, খবর পেয়ে। আমি হাতের কাজটুকু গুটিয়ে ফেরত এলাম আরও দু'টো দিন পর। পয়লা বৈশাখের দিন।

ততক্ষণে মা'র সিটি স্ক্যান, এমআরআই হয়ে গিয়েছে। মা'কে দেখলাম। হাসপাতালের বিছানায়। নিস্পন্দ, নিশ্চুপ। মা'র মস্তিষ্কের ছবি দেখালেন ডাক্তার। যেন থ্যাঁতলানো আপেলের কোয়া।

মা'র বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে হতবাক আমরা সকলে। নিজেরাই বোঝাচ্ছি নিজেদের, কৌশল করে সান্ত্বনা দিচ্ছি পরস্পরকে। আর ভেতরে ভেতরে কুরে কুরে খাচ্ছে থ্যাঁতলানো আপেল।

—সত্যি বলো না তপনদা, নিয়ে যেতে পারব তো মা'কে বাড়িতে?

কোনও সান্ত্বনা নেই, কোনও সুনিশ্চিত আশ্বাস নেই, কেবল চিকিৎসকের গম্ভীর মন্তব্য।

—দেখো না। চিন্তা কোরো না অত। চিকিৎসা তো চলছে।

চলে গেলেন তপনদা। সঙ্গে সঙ্গে গেলেন হাসপাতালের ডাক্তার, হাতের ক্লিপবোর্ড-এ মা'র জীবনের হিসেব নিকেশ নিয়ে।

আর আমি, হাসপাতালের সেই লম্বা করিডরে অপসৃয়মাণ দু'টো মানুষের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবলাম—তবে কি একেই বলে আস্থা? নিরাপত্তা?

আস্থা কথাটি সম্প্রতি বহুব্যবহারে ডেইলিসোপ।

'আস্থা' বলে একটা ছবি হয়েছিল বছর কয়েক আগে। বাসু ভট্টাচার্যর শেষ ছবি, রেখা অভিনয় করেছিল মূল চরিত্রে। ছবির বিষয়বস্তু বা আখ্যান বিন্যাসের সঙ্গে আস্থা শব্দটির তেমন কোনও গভীর সাযুজ্য ছিল না। আমার কেমন যেন মনে হয়েছিল, বাসুদা আসলে যতই প্রগতিশীল হোন না কেন, কোথাও যেন ভেতরে ভেতরে একটা চোরা কুসংস্কার কাজ করে থাকবে। 'অনুভব', 'আবিষ্কার'—এই সফল ছবিগুলোর আদ্যাক্ষর যেহেতু 'A'—আস্থা নামটাও যেন সেখান থেকেই তৈরি।

এখন তো টিভি খুললেই 'আস্থা'। গোটা একটা চ্যানেল—যেখানে বাবা রামদেব অনন্ত যৌবন এবং অমিত জীবনের সন্ধান দেন নিয়ম করে।

'আস্থা' বলে একটা বাংলা সিরিয়ালও চলত একসময়ে। মন্টুদা, মানে আমার অভিনেতা বন্ধু সুমন্ত মুখোপাধ্যায় পরিচালনা করতেন। কয়েকটা দৃশ্য লিখেও দিয়েছি আমি মাঝে মাঝে।

টিভির কথাটা এতবার করে বলছি কারণ সম্প্রতি 'আস্থা' শব্দটিকে ফিরে আসতে দেখলাম আবার টিভির পর্দায়। লোকসভার 'আস্থা ভোট' প্রসঙ্গে। সাম্প্রতিককালের সব চাইতে উত্তেজক রিয়্যালিটি শো। শুনলাম ওইদিন লোকসভা চ্যানেল-এর টিআরপি ছিল সব থেকে বেশি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিধানে দেখলাম আস্থা কথাটির অনেক অর্থ—আলম্বন, স্থিতি, প্রত্যয়, প্রতিষ্ঠা, আস্থান। আস্থান অর্থে যদি প্রতিষ্ঠান বুঝি, তাহলে তেইশে জুলাইয়ের সেই 'রিয়্যালিটি শো' কি আমাদের ভারতবর্ষ নামক দীর্ঘ করিডরটির প্রান্তসীমার এক নতুন আলোক বিচ্ছুরিত অন্ধকার?

যেখানে আস্থা, বিশ্বাস, নির্ভরতা শব্দগুলোকে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে এক গভীর সন্দেহ নিয়ে আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হবে এক ধূসর আই সি ইউ-র সামনে। যেখানে অনিশ্চিত কোমায় ক্রমশ ধুকধুক করতে করতে নিভে যাচ্ছে আমার দেশমাতৃকা প্রাণপ্রতিমা।

১০ আগস্ট, ২০০৮

এক

আমার নিত্যদিনের রুটিনে এখন একটা নতুন সংযোজন হয়েছে।

আমার জিম-যাত্রা।

কোনও এক জনপ্রিয় বাংলা সংবাদপত্রের সৌজন্যে সে খবরও এখন অনেকের অজানা নয়।

নিয়ম করে জিম-এ যাব, এক্সারসাইজ করব—এ কথা সত্যিই বড় চট করে ভাবিনি।

আমার অনেক ডাক্তার বন্ধুরা বহুবার চেষ্টা করেছেন, চিত্রতারকা বন্ধুরা নানারকম প্রলোভন দেখিয়েছেন—খুব একটা কাজ হয়নি।

আমাদের বাবা মা'র কাছ থেকে রং-তুলির টান ছাড়াও উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা দু-ভাই-ই অর্জন করেছিলাম কিছুটা মিষ্টি রক্তের আশীর্বাদ। ফলে নিয়মিত নিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস এবং ঘর্মাক্ত ক্যালরিক্ষয়ই আমার আজীবনের পথ্য।

ছোটবেলা থেকে যেহেতু খেলাধুলায় কোনও আগ্রহ ছিল না আমার, ফলে সামান্যতম শরীরচর্চাতে আজও আমার দেহ উন্মুখভাবে সাড়া দেয়।

মধ্যে গোপাল বলে আমার এক সুহৃদ আমাকে নিয়মিত যোগব্যায়াম করিয়ে চাঙ্গা রেখেছিল বহুদিন।

গোপাল এক অজানিত বিষণ্ণতার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে যায় বেশ কয়েক বছর আগে। আমার নিয়মিত যোগব্যায়াম চর্চারও সেখানেই ইতি।

সকালবেলা হাঁটার অভ্যেসটা নিশ্চয়ই ফলপ্রদ হতে পারত—কিন্তু বেশিদিন সেটাও ধাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠেকাতে পারলাম না।

আপাতত কয়েকটা তাগাদায়, কিছুটা বাধ্যতামূলক ভাবেই মাস খানেক আগে গুটিগুটি গিয়ে দক্ষিণ কলকাতার একটা gym-এ ভর্তি হয়ে এলাম।

উদ্দেশ্য—আট কেজি ওজন কমানো। রিসেপশনের মহিলা একগাল হেসে বললেন,

—কতদিনের মেম্বারশিপ?

আমতা আমতা করে বললাম,

—আপাতত মাস তিনেক।

আবার একগাল হাসি

—ভাল সময়ে ভর্তি হচ্ছেন। আমাদের এখন ভ্যালেন্টাইন ডে'র ডিসকাউন্ট চলছে।

চোখের সামনে ভেসে উঠল কৈশোর। পুজোর আগে হাফ হাতা জামা পরবে বলে দল বেঁধে ব্যায়ামের আখড়ায় ভর্তি হচ্ছে পাড়ার দাদারা।

দুই

আমি বরাবরই ভোরে উঠি। ফলে সকালবেলার জিমযাপন আমার কাছে সুবিধের। সময় ঠিক হল সকাল সাতটা থেকে সাড়ে আটটা—সপ্তাহে পাঁচদিন।

কেবল মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল, রোজ সকালে দেড় ঘণ্টা করে সময় যদি শরীরের পেছনে ব্যয় করি, মগজটাকে সময় দেব কখন? কারণ সাধারণত সকালের ওই সময়টাই আমার লেখালেখির সময়।

জিম-এ যাঁরা নিয়মিত যান, যেতে ভালবাসেন তাঁরা শরীরপ্রিয়। এবং এই বিশেষ জিমটি কিছুটা ব্যয়বহুল বলে সেখানে অবাঙালি গ্রাহক সংখ্যাই বেশি। আমি ধরেই নিয়েছিলাম সেখানে আমাকে বিশেষ কেউ চিনবেন না।

গিয়ে দেখলাম—ব্যাপারটা ঠিক ততটা সহজ নয়। অনেকেই আমাকে চিনলেন, কিন্তু সকলেই নিজের শরীর নিয়ে এত ব্যস্ত যে, পার্ট চাইবার তাগাদাটা তেমন প্রত্যক্ষভাবে তাড়া করে এল না। পরোক্ষভাবে, যেটা এল, সেটা বেশ মজার। তিনদিনের মাথায় দেখলাম আমি অন্যদের আয়না হয়ে গিয়েছি।

—স্যর, দেখুন তো কাঁধটা আরেকটু বাড়াব?

—আচ্ছা দাদা বাংলা ফিল্মে যাঁরা পার্ট করেন তাঁরা তো দুবলা আছেন। আপনারা কি ভাল হেল্‌থ হলেও নন-বেঙ্গলিদের নেন না?

বলতে যাচ্ছিলাম, সে কি কথা! জিৎ কেমন দাপটে নায়কের পার্ট করে বেড়াচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর মনে হল, কে জানে, এঁরা হয়তো বাংলা ছবি সম্পর্কে কিছু জানেনই না। কেবল বললাম,

—না, না, আমার ছবিতেই তো জ্যাকি শ্রফ, অভিষেক বচ্চন...

ট্রেড মিল, ক্লস ট্রেনিং ইত্যাদি ক্যালরি-বিনাশের যন্ত্রপাতিগুলো দোতলায় রাখা আছে।

জিমের ভাষায় ওটা কার্ডিয়ো বিভাগ।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শুনছি দিব্যি গমগম করে দেয়ালে লাগানো অত্যাধুনিক সাউন্ড সিস্টেমে 'বচনা ইয়ে হাসিনো' বা 'ফ্যাশন কি হ্যায় ইয়ে জলয়া' হচ্ছে। যেই না আমি ট্রেডমিল-এ পা রাখলাম কেউ একজন লজ্জা পেয়ে তড়িঘড়ি গিয়ে সিডিটা বদলে গজল চালিয়ে দিল।

বুঝলাম, সিরিয়াস ফিল্মমেকার হওয়ার জ্বালা কাকে বলে। আমাকে এখন মৃদুমন্দ গজলের তালে তালে হাঁপছাড়া দৌড়নো অভ্যেস করতে হবে।

মিনমিন করে বললাম,

—কেন! আগের গানটা তো ভালই ছিল। দেখলাম, সকলের কেমন যেন লাজুক লাজুক অবিশ্বাসী হাসি।

যেন ক্লাসরুমে ঢুকে স্কুলশিক্ষক হাতেনাতে ছাত্রদের সিগারেট খাওয়া ধরে ফেলেছেন।

আমার বিশেষ প্রশিক্ষণের দায়িত্ব যিনি নিয়েছিলেন তিনি তাঁর এক সহকারী যুবককে মোতায়েন করে দিলেন—উনি যেদিন আসতে পারবেন না, আমি যেন মন দিয়ে, সঠিকভাবে শরীরচর্চাটা করি। কোথাও যেন ভুল না হয়।

আর সেই অল্পবয়সী ছেলেটি পদে পদে ঋতুপর্ণ ঘোষের বিস্তর ভুল ধরতে পেরে এবং শুধরে দিতে পেরে বেশ ভারিক্কি ভাব করতে রইল।

দোষের মধ্যে বলেছিলাম

—এখানে তুমি আমার পরিচালক।

আমার ভুল হলে শুধরে দিও কিন্তু।

পরে মনে হল আমার এই অনুরোধটা বেচারা বড্ড সিরিয়াসলি নিয়ে ফেলেছে।

ট্রেডমিল যাঁরা নিয়মিত করেন তাঁরা নিশ্চয়ই জানবেন যে যেখানে incline বলে একটা বস্তু আছে, সেটা ভূমির ঢালের অনুরূপ—incline বাড়ালে চড়াইয়ের পল উচ্চতর হয়।

ট্রেডমিল-এ চড়ে হাঁফানোই নাকি প্রাথমিক উদ্দেশ্য, পাহাড়ে ওঠার সময় যেমন অনভ্যাসের হাঁফ ধরে—আর সেইসঙ্গে আমার ভেতরকার এতদিনের জমা ক্যালরি ঘামের প্রস্রবণ হয়ে নেমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসবে, তা হলেই বোঝা যাবে যে আমি অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাচ্ছি।

আমার প্রশিক্ষণ পরিচালক সেই অল্পবয়সী ছেলেটি আবার এত অত্মোৎসাহী যে, ট্রেডমিলে পা রাখামাত্র প্যাঁকপ্যাঁক করে বোতাম টিপে inclineটা নয় করে দিল।

আমি, কলকাতার রাস্তায় মোটে হাঁটি না, আমাকে হঠাৎ খাড়া রাস্তায় তুলে দিয়ে ওর প্রথাগত ভঙ্গিতে চেঁচাতে লাগল।

—কাম অন, ফাস্ট। কাম অন, ফাস্ট।

একদিকে জগজিৎ সিং-এর গজল, অন্যদিকে উৎসাহী যুবার চিৎকার—আমার তো দমের দফারফা। জিভ গলা শুকিয়ে একাকার।

হাঁফাতে হাঁফাতে incline-এর বোতামের দিকে হাত বাড়িয়েছি—'নয়'টা কমাব বলে, আমার প্রশিক্ষক তরুণ হাঁ-হাঁ করে এল,

—না না, আরও পাঁচ মিনিট। নইলে ফ্যাট ঝরবে কী করে? সত্যিই তো! হাঁফাতে হাঁফাতে, গজলের তালে তালে মাথা নাড়তে নাড়তে আবার কাল্পনিক পর্বত পথ। সহকারী যুবা কিছুক্ষণ আমাকে দেখল, তারপর তার চিয়ার-শ্লোগান বদলে চেঁচাতে লাগল।

—জয় মাতা দি

প্রথমটায় ধরতে পারিনি। একটু পরে মনে পড়ল, বৈষ্ণোদেবীর তীর্থযাত্রার অনেকটাই বোধহয় কোনও পার্বত্য পথে। কী আর করি! বৈষ্ণোদেবীর নাম করতে করতেই আবার ট্রেডমিল-এ মনোনিবেশ করলাম। আর একবার ভাবলাম ওকে চুপিচুপি বলি,

—বাঙালি হলে 'ভোলে বাবা পার করেগা'টাও ট্রাই করতে পার।

তিন

কয়েক দিন যেতে না যেতেই আমার ট্রেনার তার অভ্রান্ত অনুসন্ধান আমাকে জানিয়ে দিল,

—আপনার আপার বডি আর লোয়ার বডির কোনও কো-অর্ডিনেশন নেই। আপনার কোনও সেন্স অফ ব্যালেন্স নেই। আর আপনি কোনও ডিরেকশন নিতে পারেন না, ডান হাত তুলতে বললে বাঁ হাত তোলেন।

ভাবুন তো, কী আত্মধিক্কার হয় এরপর! নেহাত 'ট্রেডমিল দ্বিধা হও' বললে হঠাৎ মাটি ফাঁক করে একতলার মাল্টিজিম-এর ভারি ভারি মেশিনের ওপর গিয়ে পড়তে পারি, তাই চুপ করে রইলাম।

আমার মস্তিষ্কের ব্যালেন্স নিয়ে অনেকে অনেক সময় সন্দেহ প্রকাশ করেছে, যেটা আমার গা সওয়া। এতদিনে জানলাম আমার শরীরেও কোনও ব্যালেন্স নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুতো পরলে এই যে আমি কেমন পেঙ্গুইনের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে হাঁটি, চিরকাল ভেবে এসেছি সেটা জুতোগুলোর দোষ। এই সান্ত্বনাও যে এমন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে, কে জানত?

ডান-বাঁ জ্ঞানটা আমার বরাবরই কম—সেটা আমার ট্রেনার খুব ভুল বলেননি। আজ অবধি সেইজন্য গাড়ি চালানো শিখতে পারলাম না।

—তবে কী করণীয়?

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

ট্রেনার গম্ভীরভাবে বললেন,

—দেখি! আপনার pelvic jointটা মনে হয় একটু weak।

—কেন? আমার মা ছোটবেলায় আমায় পি জি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে পোলিও খাইয়েছিলেন যে!

—না, না, সে সব নয়। আসলে সারাক্ষণ বসে বসে কাজ—কোনও physical exercise নেই, গাড়ি করে ঘুরে বেড়ান, শরীরটাকে তো নাড়তে চাড়তে হবে।

যেন আমি এই পৃথিবীর এক নম্বর অলস এবং অকর্মণ্য। কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে বললাম,

—যে কোনও কর্পোরেট এক্সিকিউটিভও তো তাই। সবাই কি আর স্যাটারডে ক্লাব-এ গিয়ে টেনিস খেলেন? ট্রেনার অবিচলিত ভাবে বললেন,

—আরে! তাঁদের একটা regular sexual life আছে, আপনার তো সেটা নেই। তাতেও তো pelvic are-র একটা exercise হয়।

কী অভ্রান্ত সত্য!

চিরকাল জানতাম যে সুস্থ, পূর্ণ শরীর বড় আনন্দে প্রিয় সঙ্গীর সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যায়। শরীরটাকে সুস্থ ও পূর্ণ করতেও যে একজন সঙ্গী লাগে, সেটা বুঝিনি তো!

আমি তো তর্কটা থামানোর পাত্র নই

—তা হলে পৃথিবীর সব single মানুষই...

থামিয়ে দিল ট্রেনার,

—তারা হাঁটেন। আপনি হাঁটেন না। এবার চুপ করলাম। ট্রেডমিল-এ পা রাখলাম।

গজলের বিস্তারে ভরে যাচ্ছে জিমের দোতলা।

আর আমি যেন স্পষ্ট শুনতে পেলাম,

—তৃতীয় সুর, ষষ্ঠ সুর গুপি চলল বহু দূর—কোনও অদেখা রাজকুমারীর জন্য কত ক্রোশ রাস্তা চলেছে এক নিরক্ষর গ্রাম্য যুবক। জিমের জানলা দিয়ে নীচে রাস্তা। কে জানে সেখানে হাজার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বছর ধরে পৃথিবীর পথ হাঁটছে কত নির্জন মানুষ। কোনও পাখিনীড় চোখের অপেক্ষায়।

আমি হাঁফাচ্ছি, গলা শুকিয়ে আসছে। চোখের সামনে ঝাপসা।

কেবল নজরে পড়ল জিমের দেওয়ালে লাল কাগজের হৃদয়। তার তলায় লেখা—ভ্যালেন্টাইন উপলক্ষে বিশেষ ডিসকাউন্ট।

৮ মার্চ, ২০০৯

অনেক ছোটবেলায় মা আমায় গল্প বলে বলে খাওয়াত।

আমার নাকি খাওয়ার বড় বায়না ছিল, মুখে খাবারের গরস নিয়ে চুপটি করে বসে থাকতাম—গিলতাম না মোটে।

জানলার বাইরে রাস্তা দিয়ে পাড়ার অমুক কাকু, তমুক পিসি বাজার সেরে মুদির দোকান থেকে ফেরার পথে আমাকে দেখতেন, আর একটাই বাঁধা কথা ছিল তাঁদের,

—রিঙ্কু, গিলে ফেলো।

তাতে কাজ হতো কি না জানি না।

ফলে মা'র একটা আপ্রাণ চেষ্টা ছিল গল্প বলে বলে খাওয়ানোর। তখন থেকেই গল্প শোনার পোকা আমার মাথায়।

মা ভাবত, তাতেই বুঝি কাজ হবে।

গল্পটা ছিল মা'র স্বরচিত।

তিনটি ভাইয়ের গল্প। তাদের অদ্ভুত নাম—বুধুকেষ্ট, ধিনিকেষ্ট আর ক্যাবলাকেষ্ট। এখন ভাবি কী করে আমাদের দুই ভাইয়ের নামগুলো উতরে গেল—এই যার নাম দেওয়ার ছিরি!

তা, এই তিন ভাই, মানে বুধুকেষ্ট, ধিনিকেষ্ট আর ক্যাবলাকেষ্ট একটা গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে। যেখানে তাদের নানা ধরনের সব অ্যাডভেঞ্চার হচ্ছে...একজন কাঠুরের সঙ্গে দেখা হল, আরও কী সব হল...তারপর যখন আরও রোমহর্ষক কিছু একটা হওয়ার কথা, ততক্ষণে আমার খাওয়া শেষ হয়ে যেত। আর মা পত্রপাঠ গল্পটা সেখানেই বন্ধ করে আঁচাতে নিয়ে যেত আমায়।

পরের দিন আবার খাওয়ানোর সময় গল্প। আবার তিন ভাইয়ের জঙ্গলে প্রবেশ, কাঠুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ, তারপর এক থুত্থুরে বুড়ি, আবার সেই ভয়ঙ্কর কিছু হতে যাচ্ছে...খাওয়া শেষ।

এমনও হয়েছে মনে আছে, মা নিজেই গল্পটা গুলিয়ে ফেলত মাঝে মাঝে—আমি ঠিক করে দিতাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুধুকেষ্ট, ধিনিকেষ্ট আর ক্যাবলাকেষ্টর শেষ অবধি কী হল, আজও জানা হয়নি আমার।

হয়তো, মা কোনও একদিন এক অলৌকিক খাওয়ার পাতে শেষ করে দেবে গল্পটা।

তবু মা যখন অসুস্থ, শয্যাশায়ী—আর আমার কাছে হয়তো অনেক লোক, রাত অবধি মিটিং চলছে, ইন্টারকম-এ মা'র ফোন এল—রিঙ্কু, খাবি আয়।

আমি হয়তো তখন শুটিংজনিত গভীর কোনও সমস্যার মাঝখানে। বললাম,

—না, তোমরা খেয়ে নাও। আমার দেরি হবে।

ইন্টারকম-এ একটা মৃদু আকুতি,

—আয় না! আমি কেমন গল্প বলে বলে খাইয়ে দেব।

কিছুক্ষণের নীরবতা, তারপর আস্তে আস্তে ফোনটা রেখে দিত মা,

—আচ্ছা, তুই ব্যস্ত।

আমি ফিরে যেতাম শুটিং-এর মাঝখানে।

চোখের সামনে গহিন জঙ্গল। সেখানে শুটিং-এর তোড়জোড় চলছে। বুধুকেষ্ট, ধিনিকেষ্ট আর ক্যাবলাকেষ্ট হয়তো বা কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে আছে একপাশে। কাঠুরে, থুত্থুরে বুড়ি—কাউকে আর দেখতে পাচ্ছি না।

ওপরে খাওয়ার ঘরে টুংটাং শব্দ। বাবা, মা নিশ্চুপে রাতের খাবার খাচ্ছে—নার্স এসে মা'র গলার তোয়ালে ঠিক করে দিচ্ছে, ঠিক যেমন মা আমাকে দিত ছোটবেলায়।

হয়তো বা মা'র না-বলা গল্পটা আমিই শেষ করতে পারতাম মা'কে বলে বলে খাইয়ে।

কিন্তু, আমার না সামনে শুটিং! রূপকথার জঙ্গলে মানুষের বড় ভিড় যে!

২১ জুন, ২০০৯

লোভে পাপ, আর পাপ মানে প্যানক্রিয়াস্।

সিনেমায় অভিনয় করব বলে সেই যে প্রচুর জিম করে, খাওয়া কমিয়ে ছিপছিপেটি হলাম—শুটিং-এর পর আবার যে কে সেই।

তখন দায় পড়ে দু'মাসে চোদ্দো কেজি ওজন কমিয়েছিলাম। গা ছাড়া দিয়েই তার কিছুটা ফিরে এল।

তারপর নানাবিধ কাজ একসঙ্গে করলে যা হয়।

প্রত্যেকটা কাজেরই ধকল আছে, মানসিক চাপ আছে—জমছিল এক-এক করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গত দু'সপ্তাহ আগে একেবারে বিছানায় পড়ে গেলাম। মাথা ঘোরা, অপরিসীম ক্লান্তি, প্রায় অনড় করে দেওয়া দুর্বলতা আর প্রবল বমি।

গত ছ'মাসে এমনটি বহুবার হয়েছে—এমন প্রবলভাবে হয়নি।

নানারকম বড়ি-ট্যাবলেট কোনওটাই কাজ করল না। আল্ট্রা-সাউন্ড হল, পেটের এক্স-রে হল, রক্ত পরীক্ষা হল। সন্ধেবেলা রিপোর্ট যখন এল, রাজীবের (ডঃ রাজীব শীল) তো চক্ষু চড়কগাছ।

বুম্বা (প্রসেনজিৎ) আর রাজীব গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে ঠিক করল হাসপাতালই আপাতত আমার সঠিক ঠিকানা।

এক সপ্তাহের জন্য হাসপাতালে। নানা পরীক্ষানিরীক্ষা, নানা যন্ত্রপাতির নানারকম কার্যকলাপ। ঘণ্টা ঘণ্টায় ওষুধ। স্যালাইন। ইন্ট্রা ভেনাস ওষুধ।

দু'দিন পর বাড়ি ফিরলাম। আপাতত দশদিন গৃহবিশ্রাম। এখনও শরীর ক্লান্ত, টানা লিখতে পারি না, এসএমএস পড়তে কষ্ট হয়।

এটা ছোট ফার্স্ট পার্সন লেখার অজুহাত নয়, বিশ্বাস করুন, একটু সুস্থ হয়ে হাসপাতালের গল্প শোনাব আপনাদের।

১৬ মে, ২০১০

AMARBOI.COM

কলকাতা শহরের প্রিয় গাড়ির রং কী জানেন? সাদা। দিন দশেক আগে আমিও জানতাম না। সেই যে আগের 'ফার্স্ট পার্সন'-এ লিখলাম যে এর মধ্যে আমার একটা সপ্তাহখানেকের হাসপাতাল-বাস ছিল—সেখান থেকেই জানতে পারলাম আমার শহরের এই অনাবিষ্কৃত তথ্য।

আমায় ভর্তি করা হয়েছিল বেলভিউ ক্লিনিক-এ। দু'তলায়। ৬০৯ নম্বর ঘরে। হাসপাতালের ঘরে ঢুকে সাধারণত একটা বিষাদ এসে আক্রমণ করে যে কোনও রোগীকে।

আরও, বিশেষ করে যেহেতু মা প্রায় আড়াই মাস কোমা-আক্রান্ত হয়ে ভর্তি ছিলেন হাসপাতালে, এবং সেই গোটা আড়াই মাসটুকু জুড়ে হাসপাতালই ছিল আমার নিত্য গন্তব্য—যে কোনও হাসপাতালের স্থাপত্যের গা থেকে আজও আমি ওই উদ্বেগ বা বিষাদটাকে আলাদা করে ছাড়িয়ে নিতে পারিনি।

আমার জন্য নির্ধারিত ঘরে ঢুকলাম বেলা একটা নাগাদ। আর ঢুকেই চমক। বিছানার সামনের গোটা দেওয়ালটা একটা কাচের জানলা। যেন কলকাতার প্রতিটি মুহূর্ত-বদলকে দেখার জন্য একটা সওর মিলিমিটার পর্দা টাঙিয়ে রেখেছে কেউ। এপ্রিল মাসের দুপুরবেলা চড়া আলো, ঘন সংক্ষিপ্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছায়া—সামনে পার্ক সার্কাস থেকে রবীন্দ্রসদন অবধি যায় যে ফ্লাইওভার-টা, তার ওপর অজস্র গাড়ির অনবরত কুচকাওয়াচ। ফ্লাইওভারের ওপাশে ল্যান্সডাউন রোডের একটা অংশ চলে গিয়েছে আরও দক্ষিণে। আর সব ছাড়িয়ে সমস্ত দিগন্তের ওপরে ঝুলছে এক বিশাল ধূসর নীল নির্মেঘ আকাশ। আমার কতগুলো প্রাথমিক পরীক্ষা হবে বলে একজন জানিয়ে গেলেন। আমি জানলার ধারে বসে অপেক্ষা করতে-করতে দেখতে রইলাম জানলার বাইরে। কখন জানি না অজান্তে গুনছি কোন রঙের ক'টা গাড়ি। দেখলাম সাদার সংখ্যাই বেশি। ভাবলাম, সত্যি এরকম একটা খোলা জানলা দেওয়া ঘরে থাকলে মা বোধহয় আপনিই ভাল হয়ে যেত। আর প্রায় একইসঙ্গে মনে পড়ল, মা যখন শেষবারের মতো বাড়ি থেকে বিদায় নিয়েছিল একাকী কোনও এক নিরুদ্দেশ যাত্রায়, মা-র বাহন ছিল একটা সাদা গাড়ি। চারপাশটা কাচে ঘেরা।

দুই

প্রথম দিনের অনেকগুলো পরীক্ষা করানোর জন্য রক্ত ইত্যাদি সংগ্রহ করে নিয়ে গেলেন হাসপাতাল-কর্মীরা। আমায় একটু মৃদুভাবে অনুরোধ করেছিলেন সেই চিরাচরিত আকাশী-নীল হাসপাতালের পোশাক পরতে। আমি অনেক ওজর-আপত্তি করে আমার নিজের ঢোলা পাজামা আর ঢলঢলে টি-শার্টেই স্থিত হয়ে রইলাম।

আমার হাতে চ্যানেল লাগানো হয়ে গিয়েছে। ইন্ট্রাভেনাস, অ্যান্টিবায়োটিক এবং স্যালাইন শুরু হয়ে গিয়েছে। আমি হাসপাতালের বিছানায় একা-একা জানলার বাইরে তাকিয়ে।

প্রথমদিন নানা ডাক্তার আসবেন, নানা পরীক্ষা হবে—ফলে হাসপাতাল থেকে অনুরোধ করেছিলেন, সেদিন বিকেলবেলাটা আমার কোনও ভিজিটর যদি না আসেন।

ফলে ঘরে আমি একা। একজন এসে জিগ্যেস করলেন,

—টিভি চালিয়ে দেব, দেখবেন?

আমি রিমোট-টা বুঝে নিয়ে হাতের কাছে রাখলাম বটে, কিন্তু সেই মুহূর্তে ঠিক টিভি দেখতে ইচ্ছে করছিল না।

ততক্ষণে বাইরের ইস্পাতদুপুর কেমন যেন ক্লান্ত ম্লান বিকেলের চেহারা নিয়েছে। অফিস ভাঙার সময় হয়েছে, তাই গাড়ির স্রোত এখন অনেক বেশি। বিকেলের আলোয় সাদা গাড়িগুলোকেও ধূসর লাগছে।

বাইরের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে ভাবলাম—সত্যি তো! নিজের শহরটাকে একনাগাড়ে এতক্ষণ ধরে দেখিনি কতদিন!

কেবল গাড়িতে আসা-যাওয়ার পথে, জানলার কাচের বাইরের টুকরো-টুকরো দৃশ্যগুলোই আমার কাছে কলকাতা বলে একটা মস্তাজ গড়ে দিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার সন্ধ্যা নামবে, বুঝতে পারছি। আকাশের রং বদলাচ্ছে, আলোর রং বদলাচ্ছে, উঁচু উঁচু বাড়িগুলোয় আলো জ্বলে উঠছে। সত্যিই আমি জানলাম না, জানতে পারবও না—কার নির্দেশে অন্ধকার কলকাতা একসঙ্গে এক নিমেষে আলোকিত হয়ে উঠল।

কেবল সিইএসসি?

বিশ্বাস হয় না।

যে শহরটা আমার মহাবিশ্ব, অন্তরীক্ষ, সেখানে আকাশের যত তারা কোনও একটি সংস্থার নির্দেশে যেন জ্বলে উঠতে পারে না।

ভাবতেই-ভাবতেই মনে হল, কে জানে কোনওদিন এই জীবনেই হয়তো শুনে যাব, রাতের আকাশে চাঁদ যে ওঠে, সেটা বিশেষ কোনও বহুজাতিক সংস্থার নির্দেশে।

২৩ মে, ২০১০

বেলভিউ ক্লিনিকের যিনি প্রধান মেট্রন, তিনি কেন আমায় দেখে অত্যন্ত পরিচিতের একটা আন্তরিক হাসি হাসলেন, বুঝলাম না প্রথমে। তিনিই বুঝিয়ে দিলেন।

মা যখন কয়েকদিনের জন্য উডল্যান্ডস-এ ভর্তি ছিল, তখন উনি ওখানে কর্মরতা ছিলেন। ফলে মায়ের সুবাদে ওঁর সঙ্গে আমার প্রায় সকাল-বিকেল দেখা হত।

আমি ভর্তি হওয়ার পরই মেট্রন আমার ঘরে এলেন। কুশল-সমাচার জানতে এবং আমার হাসপাতালের দিনগুলোতে কোন কোন সিস্টার আমার নিয়মিত দেখভাল করবেন তাঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে।

তাঁরা সংখ্যায় বেশ ক'জন। অন্তত তিনজন। সকালের, দুপুরের, রাতের।

সঙ্গে করে যাঁকে এনেছেন তিনি এক বয়স্কা মহিলা, ছোটখাটো স্নেহময়ী চেহারা। অনেকটা আমাদের অভিনেত্রী গীতা দে এখন বয়সের ভারে চেহারা ভেঙে যেমন ছোট্টটি হয়ে গিয়েছেন। এই মহিলার বয়স অনেক কম—কিন্তু চেহারাটাই ক্ষুদ্রকায়। আপাতত আজ রাত্তিরটা আমি তাঁর হেফাজতে। মেট্রন চলে গিয়েছেন।

ঘরের মধ্যে কেবল আমি আর আমার সেবিকা। কিন্তু সিস্টার বলে আর কাঁহাতক ডাকা যায় একজন মানুষকে। আমি মৃদুস্বরে জিগ্যেস করলাম,

—আপনাকে কী বলে ডাকব?

—সিস্টার। যা সবাই বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—না। আপনার নামটা কি জানতে পারি?

—মিসেস কৃষ্ণা চক্রবর্তী। তেমন হলে মিসেস চক্রবর্তী বলতে পারেন।

মনে হল কোথাও যেন এই ক্ষুদ্রায়তন, কুশলী, স্নেহময়ী সেবিকা তাঁর একটা পেশাগত স্বীকৃতি চাইছেন। আমার আবার উল্টো জেদ। বললাম,

—আমি আপনাকে কৃষ্ণাদি বলে ডাকব। ভদ্রমহিলা খুশি হলেন কি না জানি না, পেশেন্টের আবদারে 'না' বলতে না শেখাটা বোধহয় এই হাসপাতালের সহবত। উনি আলাদা করে আপত্তিও করলেন না।

তারপর সাতদিন হাসপাতালে থাকাকালীন কৃষ্ণাদির সঙ্গে যে আলাপটা হল, কাজের ফাঁকে ফাঁকে যে আড্ডাটা মারতাম আমরা, যেখান থেকে জেনেছিলাম 'ওগো বধূ সুন্দরী' সিরিয়ালে যিনি ললিতা-র পার্ট করেন, তাঁকে কৃষ্ণাদির খুব পছন্দ—তখন কৃষ্ণাদিও বোধহয় মনে মনে মেনে নিয়েছিলেন যে, 'মিসেস চক্রবর্তী' বা 'সিস্টার' বলে ডাকলে আলাপটা এত দূর এগোত না।

পয়লা মে ছুটির দিন। বন্ধুবান্ধবরা অনেকেই দেখতে এল। সকলেই উদ্বিগ্ন। বিশেষ করে হাসপাতাল বেডে শায়িত আমি, হাতে চ্যানেল লাগানো, ড্রিপ চলছে—এমন চেহারায় আমায় দেখতে কারও ভাল লাগছিল না।

তবু সবাই মিলে আড্ডা মেরে মনটা ভাল হয়ে গেল।

এর মধ্যে সিটি স্ক্যান হয়ে গিয়েছে। এক-এক করে আমার শরীরের সুপ্ত, গুপ্ত ব্যাধিদের প্রকাশ্যে এনে নানাবিধ পরীক্ষা চলছে। পরীক্ষার আধুনিক বিধিগুলো বড় ক্লান্তিকর। একটার পর একটা সারাদিন ধরে সেরে যখন আবার খাটে এসে শুইয়ে দেওয়া হল আমায়, তখন বাইরে বিকেলের আলো। সাধারণত বাইরে রোদ থাকলে রোগীর চোখের আরামের জন্য পর্দা টেনে দেওয়া হয়।

কৃষ্ণাদিও তাই করতে যাচ্ছিলেন, আমিই বারণ করলাম। সামনে জানলার বাইরে যথারীতি ছড়িয়ে আছে আমার কলকাতা শহর।

বিকেলের আলোয় মেদুর হয়ে আসছে জানলার বাইরের মহানগর, আগের দিনের সিনেমার back projection-এর মতো।

আমরা যারা সাধারণ ছোটখাটো পাড়ায় থাকি, খুব বেশি হলে দোতলা বা তিনতলা বাড়িতে—এত বিশাল, এত ব্যাপ্ত শহরটাকে দেখার সুযোগই বড় কম হয়।

ফলে বিদেশ গেলে যেমন উঁচু বাড়ি থেকে হয় ম্যানহাটান, নয় লন্ডন—একটা ছবির মতো করে দেখতে পাই আমরা-ঠিক, তেমন যেন দেখাচ্ছে আমার শহরটা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্ধের আলো জ্বলে উঠেছে আবার। উল্টোদিকের বাড়ির প্রজ্জ্বলিত ক্যাপসুল লিফ্ট-টা ওঠানামা করছে নিজের নিয়মে।

হঠাৎ মনে হল, চ্যানেল বাঁধা কব্জিতে রবারের নলটা কেমন যেন ফাঁস পাকিয়ে জড়িয়েছিল—যেন গঙ্গাফড়িংয়ের ডানা। জানলার কাচের বাইরে, লিফ্ট-এর ওঠানামার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে, খাটে বসে নিজের গঙ্গাফড়িং ওঠাতে-নামাতে লাগলাম। আর সঙ্গে সঙ্গেই, নিতান্ত দুর্ভাগার মতো মনে হল—এটা কোনও সিনেমার একটা শট হতে পারত। (চলবে)

৩০ মে, ২০১০

সন্ধেবেলায় ভিজিটিং আওয়ার। বেশ কয়েকদিন হাসপাতাল বন্দি বলে খবরও রটে গিয়েছে যে, ঋতুপর্ণ ঘোষ এখানে ভর্তি আছেন।

মধ্যে একদিন সিটি স্ক্যান করতে নীচে নামতে হয়েছিল। আমি এমনিতে দিব্যি সুস্থ। ঘরের মধ্যে হাঁটাচলা করে বেড়াচ্ছি—হঠাৎ দেখি নীচে যেতে হবে বলে চালক-সমেত একটা হুইলচেয়ার এসে হাজির। আমি প্রথমটায় ভীষণ বাধ্য রোগীর মতো হুইলচেয়ারে চেপে বসলাম। সামান্য ওজর-আপত্তি করিনি তা নয়। কিন্তু হুইলচেয়ার-চালক অত্যন্ত বিনীতভাবে দৃঢ় আপত্তি করতে লাগলেন—মনে হল তাঁর কথার অবাধ্য হলে হাসপাতালের নিয়ম ভাঙা হবে।

লিফ্ট-এ করে হুইলচেয়ার চেপে নীচে নামলাম। সিটি স্ক্যান-এর জন্য ভিজিটর-রা যেখানে অপেক্ষা করেন, সেই অঞ্চলটা পার হতে হয়। হঠাৎ দেখলাম, বেশির ভাগ ভিজিটরের নজর আমার দিকে। এবং তাঁরা নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছেন। বুঝলাম তাঁদের কৌতূহলের বিষয়বস্তু আমি। হঠাৎ যেন আমার কিছু হয়নি এমন একটা কঠিন ভাব করে সেই বিনীত হুইলচেয়ার চালককে প্রায় মৃদু ধমকে, হুইলচেয়ার থামিয়ে, নেমে গটগট করে হেঁটে সিটি স্ক্যান ঘরের দিকে চলে গেলাম।

ভিজিটর-রা যাঁরা এতক্ষণ অসুস্থ ঋতুপর্ণ ঘোষকে দেখছিলেন, অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন নিশ্চয়ই যে, এ আবার কি নতুন মশকরা! সিটি স্ক্যান যখন চলছে, বিমানের ঘোষণার মতো অদৃশ্য যান্ত্রিক-কণ্ঠ আমাকে নিশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করতে বলছে। আমি তখন শুয়ে-শুয়ে একটা কথাই ভাবছি, বাকি পথটুকু হুইলচেয়ারে করে এলে কী অসুবিধে হত আমার? না কি আমার যাঁরা পরিচিত নন অথচ দেখে চিনতে পারছেন—তাঁদের কাছে নিজেকে সদা সুস্থ-সবল প্রমাণ করার কোনও দায় আছে, না কি হুইলচেয়ারে উপবিষ্ট ঋতুপর্ণ ঘোষকে নিয়ে তাঁদের থেকেও আমার নিজের অস্বস্তিটা বেশি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাক। সেদিন সন্ধের ভিজিটিং আওয়ার-এ ফিরি। কোনও এক বন্ধু এসেছে—কথা বলছি। শীত-শীত লাগছিল। গায়ে একটা পাতলা ঘি রঙের নরম পশমিনা। এটা সাধারণত আমার সব যাত্রার লোটাকম্বল। গায়ে জড়িয়ে বসে কথা বলছি। হঠাৎ দেখি, দরজা ঠেলে ঢুকল একটি সাত-আট বছরের ছেলে—ফুটফুটে মিষ্টি, কটা চোখ। কিছুক্ষণ হাঁ করে আমায় দেখল। তারপর জিজ্ঞেস করল—এটা কি সিস্টারদের ঘর? আমি তার কৌতূহলের উত্তরে নির্বিকারভাবেই বললাম,

—না। তুমি পাশের ঘরটা দ্যাখো।

ছেলেটি ছুটে চলে গেল। দরজা বন্ধ হল। আমি আবার আড্ডায় মনোনিবেশ করলাম।

মিনিট পনেরো বাদে দরজা আবার ফাঁক হল। সাত-আট বছরের ক'টা চোখ আমার দিকে তাকিয়ে। এবার একটা অদ্ভুত প্রশ্ন,

—তুমি কি স্টার জলসা-য় থাকো?

আমি একটু অবাক এবং অপ্রস্তুত হলাম। মনে ভাবছি : তবে কি আমি যখন 'ঘোষ অ্যান্ড কোম্পানি' অনুষ্ঠানটা করতাম, সেই বসার ঘরটা আমার বাড়ি বলে বাচ্চাটির ধারণা? যে-বাড়িটা কেবল 'স্টার জলসা'-তেই দেখা যেত একসময়।

মাথা নেড়ে বললাম,

—না বাবা। আমি আমার বাড়িতে থাকি।

তারপরের প্রশ্নটার জন্য আমি সত্যিই প্রস্তুত ছিলাম না। কটা চোখ, মিষ্টিমুখ আমাকে ধীরে-ধীরে প্রশ্ন করল। এবার তার চোখে এবং গলায় কিছুটা সংশয়,

—তুমি কি 'বেহুলা'-র রান্নাঘরে থাকো?

প্রথমটায় কিছু বুঝতে পারলাম না। তারপর আস্তে-আস্তে মনে পড়ল যে, 'বেহুলা' বলে ইদানীং যে বাংলা সিরিয়ালটা হচ্ছে, তাতে চাঁদসদাগর-এর বাড়ির রান্নাঘর মানেই চাঁদের ছ'জন অকালমৃত পুত্রের ছয় বিধবার অভিমান-ঘর। ন্যাড়ামাথা এবং ঘিয়ে রঙের চাদরে তা হলে কি সাতবছর আমাকে সেই বিধবাদের একজন ভাবল? এবারও নিরাশ-করা উত্তর দিতে হল,

—না, বাবা। আমি সেখানেও থাকি না।

শিশুমনের কল্পনার দৌড় কত, তা নিয়ে ভাবতে-ভাবতে মনে হল যে, টেলিভিশনের বাক্সটা কি সত্যিই ধীরে ধীরে একটা সমান্তরাল জীবন হয়ে যাচ্ছে আজকের পৃথিবীতে? চেনা যে কোনও মুখকে যেখানে অনায়াসে স্থাপন করা যায়, অস্থায়ীভাবে হলেও যাঁরা এই অন্য-পৃথিবীর বাসিন্দা হয়েই অনেকদিন বেঁচে থাকেন দর্শক-মনে?

পরের দিন দোসরা মে। সত্যজিৎ রায়ের জন্মদিন। আমার মনে ছিল না, একদিন এই হাসপাতাল থেকেই পৃথিবী চিরবিদায় দিয়েছিল চলচ্চিত্রের এই অমর জাদুকরকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ তাঁর জন্মদিন। বিশেষ করে সেবিকা কৃষ্ণাদির নানা স্মৃতিচারণে আরও বেশি করে মনে হতে লাগল যে, মানুষটা এখান থেকেই, এই তলার কোনও একটা ঘর থেকেই, আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

যেমন কোনও প্রিয়জন-বিচ্ছেদ শেষ অবধি আমাদের আয়ত্তাধীন নয়—তেমনই এই মানুষটাকেও আমরা হারিয়েছি আমাদের সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়।

জানতাম, আজ নানা বাংলা টেলিভিশনের বিভিন্ন চ্যানেলে তাঁরই ছবি দেখাবে। 'আকাশ বাংলা'-য় দুপুরবেলা 'অপুর সংসার' দেখানো হচ্ছে। আমিও দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়া মিটিয়ে মধ্যাহ্ন বিশ্রামটা নিয়োজিত করলাম টিভির পর্দায়।

ছবি চলছে। আর মাঝে-মাঝেই দীর্ঘ কমার্শিয়াল ব্রেক। তখন চ্যানেল পাল্টাতে গিয়ে দেখি, রিমোটের নম্বরের হিসেবে, দু'টো চ্যানেল আগেই, দূরদর্শন-এও, 'অপুর সংসার' হচ্ছে। এটা বোধহয় শুরু হয়েছে 'আকাশ বাংলা'-র মিনিট কুড়ি পরে। অতএব একটা মজার খেলা পেয়ে বসল আমায়।

'আকাশ বাংলা'-র ব্রেক-এ নিমেষে বোতাম টিপে চলে যাই দূরদর্শন বাংলায়। একটা যেন অন্যটার Recap। দূরদর্শন বাংলার পর্দায় যখন আসন্নপ্রসবা অপর্ণার ভরা মুখখানা ট্রেনের জানলায়, আকাশ-এ তখন ধীরে-ধীরে অপর্ণা বিরচিত অপুর অবিন্যস্ত, পীড়িত মুখ আয়নার প্রতিফলনে। যেন এক অমোঘ জ্যোতিষী, এক মুহূর্তে দু'টো চ্যানেলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জুড়ে দিচ্ছেন মহাকালকে। একটু আগে যেটা হয়ে গিয়েছে, সেটা যেন দেখতে ও জানতে পারছি দু'টো বোতামের দূরত্বে।

বিকেলের দিকে ঝড় উঠল। আমার ছ'তলার জানলার কাচের বাইরে ঘন হয়ে উঠল আকাশ। ধীরে-ধীরে মেঘের দল যেন ল্যান্সডাউন রোডের দিক থেকে ছুটে আসতে লাগল সশব্দে আমার জানলার দিকে, যেন মোড়ে দাঁড়িয়ে-থাকা ট্র্যাফিক পুলিশ তাদের সদ্য-সিগ্‌নাল মুক্ত করেছে।

কালো আকাশের গায়ে, জানলা-ঘেঁষা বিদুৎ-ঝলকের সামনে, আদিগন্ত কলকাতার তোলপাড় দেখতে দেখতে—হঠাৎ কেমন যেন দার্শনিকের মতো মনে হতে লাগল : বাইরের জগতে যাই হোক না কেন, সত্যিই কি আমরা সকলে প্রত্যেকে নিজেদের কুঠুরিতে নেই? ঠিক এই মুহূর্তে, যেমন আমি। আমার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শয্যায় কত নিরাপদ, অথচ বাইরের পৃথিবী ভেঙে পড়ছে প্রায়। ঠিক যেমন আমার রোজকার জীবনটা। কতগুলো খুচরো অশান্তি ছাড়া, যা নির্বিঘ্নভাবে স্বচ্ছন্দ। সেখানে সত্যি আমারই এই কলকাতা শহরে আমার মা বা সত্যজিৎ রায় আর আছেন কি না, তার সঙ্গে আমার আর কোনও আপাতসম্পর্ক নেই। (চলবে)

৬ জুন, ২০১০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্দাম হাসি। গ্যালারি জুড়ে হাহা হিহি। কিছুতেই আর থামছে না।

কারণ মাঝখানের গোলাকার মঞ্চে তখন একজন মুখে রং-মাখা জোকারের কৌতুক চলছে।

আসলে, কয়েকদিন আগেই আমাদের 'জোকার' সংখ্যাতে যেটা লিখেছিলাম আমরা, তাতে জোকার ছিল এক বিপ্রতীপ কারুণ্যের কৌতুকময় প্রতিমা।

যে কেবল আলোকবৃত্তের নীচে, দর্শকদের সামনে, কৌতুকের মুখোশ পরে আড়াল করে তার যাবতীয় কান্না।

'কার্টুন' সংখ্যার 'ফার্স্ট পার্সন' লিখতে বসে আমার সেই উপমাটা চট করে মনে এল।

গত দু'সপ্তাহ ধরে আমার বাবা হাসপাতালে। দুর্বল হাঁটু নিয়ে পড়ে গিয়ে কোমর ভাঙলেন। বুড়ো বয়সে অপারেশন করা ঠিক হবে না ভেবে ট্র্যাকশন দেওয়া হল।

শয্যাশায়ী বাবার ধীরে ধীরে একটা শ্বাসকষ্ট শুরু হল। প্রথমে মৃদু, তারপর ধীরে ধীরে প্রবল হল। তখন বিপদাশঙ্কা দেখে আমাদের বাড়ির প্রবীণ চিকিৎসক তপনদা, ড. তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হতে হল।

তপনদা এলেন। বাবাকে দেখলেন, এবং আমাকে প্রচণ্ড বকলেন। এই বয়সে নাকি অপারেশনটাই নিরাপদতম উপায়। অন্যথায় বয়স্ক রোগী স্থবির অবস্থায় শয্যাশায়ী থাকলে শ্বাসকষ্ট অবধারিত।

বাবাকে আর বাড়িতে রাখা গেল না। আইসিসিইউ-তে ভর্তি করা হল। সিটি স্ক্যান-এ দেখা গেল বাবার একটা মৃদু স্ট্রোক মতো হওয়াতেই পড়ে গিয়েছিলেন।

চিকিৎসার রূপবদল হল। বাবার এক-এক করে নানা ব্যাধির সন্ধান পাওয়া গেল। এখন জানি না কতদিন হাসপাতালে থাকবে বাবা।

আমি বাড়িতে একা।

হাসপাতালের ফোনের জন্য উৎকর্ণ হয়ে আছি আর 'কার্টুন' সংখ্যার 'ফার্স্ট পার্সন' লিখছি।

১১ জুলাই, ২০১০

আশ্চর্য জন্তু নিয়ে কভার স্টোরি।

'ফার্স্ট পার্সন' লিখতে গিয়ে মনে হল আমার নিজেকে নিয়ে লেখার চেয়ে বেশি সঠিক বিষয় আর কী-ই বা আছে।

আমি যে সবার দেখা আশ্চর্য জন্তুদের অন্যতম, এ-বিষয়ে নিশ্চয়ই কারও কোনও সন্দেহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকতে পারে না। আমার পরিচিতজনের অধিকাংশই আমার সঙ্গে একমত হবেন। লিখলে হয়তো বেশ মজা করে লেখাও যেত অনেকটা।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, আমার এখন এই মুহূর্তে সেই মনের অবস্থাটা নেই।

বাবা হাসপাতালে। ডাক্তার প্রায় জবাব দিয়ে দিয়েছেন। এখন দিন গোনার পালা।

চলচ্ছক্তিহীন বাকশক্তিরহিত একটি মানুষ। ধীরে-ধীরে তাঁর ফুসফুস ভরে যাচ্ছে বিষাক্ত সংক্রমণে। অকেজো হয়ে পড়ছে কিডনি। আর ঘন ঘন শ্বাসকষ্টের প্রতিনিয়ত আক্রমণ।

আমি কয়েকদিন হল হাসপাতাল যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি।

বাড়িতে বসে খবর নিই। জানি, আমার বা চিকিৎসকদের আর নতুন করে করবার কিছু নেই।

একসময়ে আমাদের এই ইন্দ্রাণী পার্কের বাড়িটাতে আমরা অনেকে ছিলাম।

বাবা, মা, ভাই, ঠাকুমা, পিসিমণি।

পিসিমণির বিয়ে হয়ে গেল।

ঠাকুমা চলে গেল। চিরকালের মতো।

চিঙ্কু বিয়ের পর আলাদা সংসার পাতল।

রয়ে গেলাম বাবা, মা, আমি।

চার বছর আগে মা চলে গেল এই বাড়ি থেকে। এবার কেবল আমি আর বাবা।

গত একমাস বাবা হাসপাতালে।

আর ইন্দ্রাণী পার্কের এই দোতলা বাড়িতে আমি একা। হয়তো বাকি জীবনটার জন্য প্রস্তুত করে দিচ্ছে আমায় একটা মানুষ। যে অচল। যে মূকবধির প্রায়। চেতনারহিত হয়ে শুয়ে আছে শ্রী অরবিন্দ সেবাকেন্দ্র-র বিছানায়।

আমি জানি এগুলো সবই প্রস্তুতি। বিদায় দেওয়ার সাহস-শক্তির প্রস্তুতি। একলা থাকার প্রস্তুতি।

তবু তার মধ্যে রোজকার কাজ নিজের নিয়মে করে যেতে হচ্ছে। যতটা সম্ভব ত্রুটিহীন ভাবে। অন্যদিকে আমার বাড়ি থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে ক্ষীণ শ্বাসটুকু ফেলছেন আমার জন্মদাতা।

আর, আমি 'ফার্স্ট পার্সন' লিখছি।

এবার বলুন, আমার থেকে বড় আশ্চর্য জন্তু আর কে আছে?

১ আগস্ট, ২০১০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গত ২৯ জুলাই বাবা চলে গেলেন।

আমাদের পারিবারিক ক্যালেন্ডার-এ আরেকটা নতুন তারিখ যোগ হল।

তারিখ মনে রাখার মতো জ্ঞান বা বোধ যখন থেকে হয়েছে, তখন থেকে বাড়িতে পাঁচটি তারিখ খুব বিশিষ্ট ছিল।

বাবা, মা, চিঙ্কু আর আমার জন্মদিন। আর বাবা-মা'র বিয়ের তারিখ।

তারপর চিঙ্কু-র বিয়ে হল। একটা নতুন তারিখ ঢুকল বাড়িতে।

তার সঙ্গে নতুন করে যোগ হল চিঙ্কু-র স্ত্রী দীপান্বিতা আর কন্যা তিন্নি-র জন্মদিন।

চার বছর আগে মা চলে গেল। একটা অন্য তারিখের স্বাক্ষর রেখে।

আর গত ২৯ জুলাই বাবা।

বয়স যদি কোনওভাবে জীবনসীমা বা আয়ুর নির্ধারক হয়, তবে হয়তো এরপরের তারিখটা হবে আমার মত্যুদিন। কারণ আমি বড় ছেলে। আফসোস : সব মানুষের মতো সে-তারিখটা আমি জেনে যেতে পারব না।

৮ আগস্ট, ২০১০

AMARBOI.COM

হাজরা রোডের ওপর দিয়ে আলিপুরের দিকে যেতে পোটোপাড়াটা ছাড়ালেই একটা ব্রিজ। সেখান থেকেই ডানদিকে তাকালে দেখা যেত একটা বিশাল লাল পাঁচিল।

ছোটবেলায় জানতাম ওটা জেলখানা। আরেকটু বড় হতে নামটা জেনেছি—আলিপুর সেন্ট্রাল জেল। যেমন ছোটবেলায় জেলখানা বলতে বুঝতাম হাল্লার বন্দিশালা। বড় হয়ে সেটা একটা অর্ধচন্দ্রাকার শীর্ষদ্বার বড় বাড়ি। যার ভিতর থেকে ছাড়া পেয়ে বেশির ভাগ সময়েই যেন সিনেমা দেখা শেষ করার মতো করে বেরিয়ে আসতেন অমিতাভ বচ্চন।

তারপর যখন মন সিনেমায় আরও নিবিষ্ট হল, তখন নিজের মনেই প্রশ্ন জাগত যে, কাবুলিওয়ালা-য় রহমতের জেল খাটবার পুরো অধ্যায়টুকুই (শুনেছিলাম সেটির কাহিনিকার ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র স্বয়ং) কি পরে তপন সিংহ মহাশয়কে ঠেলে দিয়েছিল লৌহকপাট-এর দিকে?

'জেল' নামটার কোনও বাংলা হল না। সংস্কৃত 'কারাগার' শব্দটা যেন ওই কঠিন লোহার শিকের গায়ে ধাক্কা খেতে-খেতে ক্রমশ অশক্ত হয়ে পড়ল। বহুদিন অবধি শুনতাম আন্দামান বেড়াতে গেলে সেলুলার জেল দেখাটা নাকি অবশ্যকর্তব্য। আমি সত্যিই বুঝিনি কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকগুলো দ্বীপান্তরিত মানুষের দীর্ঘশ্বাস-তাড়িত একটা বিশাল ইমারতের মধ্যে নতুন করে কী আবিষ্কার করেন পর্যটকরা?

অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি দেখেছিলাম 'সাজাহানের মৃত্যুশয্যা'। বন্দি সম্রাট অলিন্দের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছেন সুদূর-সৌধ তাজমহলের দিকে—এক অম্লান স্মৃতির দিকে তাকিয়ে। জেলখানার বাইরেও যে বন্দিদশা হয়, সেই ছবি দেখে বুঝলাম।

সম্প্রতি প্রায় রোজ বুঝেছি হাসপাতালে ভিজিটিং আওয়ার শেষ হওয়ার ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে।

লোহার রেলিং দেওয়া খাটে অচেতন হয়ে আছে রোগবন্দি বাবা, আর আমরা নিয়মিত হাজিরা দিচ্ছি ঘড়ি-সময় ধরে—সাক্ষাতের আয়ু যেখানে মাপা।

বাবার একটা বন্দিদশা শেষ হল।

কাচের গাড়িতে বন্দি হয়ে বাবা রওনা দিল—যেন পুলিশ ভ্যানে হাত-পা বাঁধা বন্দি।

তফাতটা এই যে বন্দি-বাবা কেমন করে যেন মুক্তি পেয়ে গেল—যা কেবল ছোটবেলায় স্বপনকুমার-এর গল্পে পড়েছি।

মুক্তি পেয়ে কোথায় চলে গেল? ভাবতে ইচ্ছে করে যে মা'র কাছে।

ধীরে ধীরে আমার সামনে প্রতিনিয়ত গজিয়ে উঠতে থাকছে জেলখানার শিক। যার ভিতরে আমি বন্দি। যার ভিতর আমার যাবজ্জীবন কারাবাস।

যার প্রতিটি শিক এমন শক্ত স্মৃতি দিয়ে গড়া যে সে জেলখানা ভেঙে বেরোয় কার সাধ্যি!

১৫ আগস্ট, ২০১০

আমাদের কোনও অনভিপ্রেত আচরণে যখন বাবা বা মা কাউকে ক্ষুব্ধ হতে দেখেছি, একটা অভিমানী উক্তি বারবার করে ফিরে আসতে শুনেছি—

—রাখ তো। এই তো ছেলের নমুনা! কত ছাতা দিয়ে মাথা ধরবে?

তাতে আসলে বেশিরভাগ অভিমানের অংশটা এত বেশি থাকত, যুক্তির ভাগটা তুলনায় এত কম, যে, এই অদ্ভুত বাক্যগঠনের ব্যাকরণ নিয়ে বলতে গিয়ে ব্যাকুল হয়েও শেষমেশ চুপ করে গিয়েছি।

'ছাতা দিয়ে মাথা ধরে' কী করে, ছাতা মাথার ওপর ধরা যায়, মাথার পিছনে ধরা যায়—কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ছাতা দিয়ে মাথা ধরবে, বাক্যাংশটা বেশিরভাগ সময়ই আমার কানে 'জাল দিয়ে মাছ ধরবে'-র মতো শোনাত।

কিন্তু বাবা বা মা'র সেই অভিমানের মুহূর্তে তিরস্কারের ব্যাকরণ নিয়ে কথা বলতে গেলে, আরও অনেক আপাত-কৌতুকাচ্ছন্ন বেদনাহত বাক্যবাণ নিঃসৃত হবে ভেবে চুপ করে যেতাম।

আবার কখনও কখনও পড়াশোনা বা অন্যান্য কর্তব্যে, তারুণ্যের বিচ্যুতিতে মা'র একটা সহজ খেদোক্তি শুনেছি, প্রধানত আমাদের জীবনে বাবার দৈনন্দিন প্রত্যক্ষ অবদান স্মরণ করিয়ে দিয়ে,

—এখন কিছু বুঝবে না। ছাতার মতো দাঁড়িয়ে আছে তো লোকটা, ছাতা যেদিন সরে যাবে, সেদিন বুঝবে।

এটায় ব্যাকরণের ত্রুটি যতটা না কানে বাজত, তার থেকে বেশি করে লাগত ভুল অলংকারের প্রয়োগ। 'ছাতার মতো দাঁড়িয়ে থাকা' আবার কী? স্তম্ভ হয়, মহীরুহ হয়—নিতান্ত ছাতা কেন?

কিন্তু প্রতিবাদ নৈব নৈব চ। ওই যে বললাম—তাতে বাক্যগঠনের কোনও ভ্রান্তি-সংশোধন হবে না, বরং প্রস্রবণের মতো নিঃসৃত হবে অভিমান।

ও! তা তো বলবেই। এখন লেখাপড়া শিখে দিগ্‌গজ হয়েছ—বাপ মা'র ভুল তো ধরবেই। তা এই আমাদের কর্তব্যের আনুমানিক সারাংশ 'ছাতা দিয়ে মাথা ধরা' বনাম বাবার পিতৃদায়িত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'ছাতার মতো দাঁড়িয়ে থাকা'-এর টানাপোড়েনেই কেটে গেল বাল্য, কৈশোর, তারুণ্য ও যৌবন। একসময় বাপ মা'র বয়স হল। আমরা বড় হলাম। সংসারে ছাতার ভূমিকাভিনয়ের শিল্পী বদলাল।

বাবা-মা আমার সন্তানবৎ হয়ে গেল। সেদিন বাবার শ্রাদ্ধবাসরে দানের অন্যান্য উপচারের মধ্যে হঠাৎ পেতলের থালায় শোয়ানো একটা ছাতা দেখে মনে পড়ে গেল মা'র গলায় বহুদিন আগে শোনা, আর সম্প্রতি বহুদিন না-শোনা সেই বাক্য দু'টো। মুহূর্তের জন্য পুরোহিতের মন্ত্র কেমন যেন দূরাগত অস্পষ্ট উচ্চারণ মনে হল, চোখের সামনে বসে থাকা আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবরা ঝাপসা হয়ে গেল।

যে-প্রশ্নটা সারাজীবন মা'কে করতে পারিনি, সেখানে, আমার ভাইয়ের পাশে শ্রাদ্ধের আসনে বসে, মনে মনে জিগ্যেস করলাম,

— মা গো! 'ছাতা দিয়ে মাথা ধরা' বলতে কি তুমি এটাই বোঝাতে এতদিন?

বুঝতে পারছি ক্রমশ আমার 'ফার্স্ট পার্সন'গুলো ঘ্যানঘ্যানে হয়ে উঠছে দিন-দিন। রোববার সকালে উঠেই এত বিষাদ ভাল লাগার কথা নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু কী করব বলুন, গত তিনবছর ধরে তো আমার সব আনন্দ-দুঃখ আপনাদের সঙ্গেই ভাগ করেই নিয়েছি।

আর ক'টা দিন সহ্য করুন না হয়!

২২ আগস্ট, ২০১০

এত বেদনার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড আগে কখনও পাইনি। টেলিভিশনে ঘোষণা চলছে। আর দু'টো সোফায় বসে, যে দু'জন মানুষের সেই খবরটা পরম আগ্রহে, পরম আনন্দে দেখার কথা—তারপর যতগুলো চ্যানেলে যতবার তার রিপিট দেখানো হবে—সেগুলোও গোগ্রাসে গেলার কথা—তারা আজ নেই।

আমার ঘাড়ে সেই দায়িত্বটা চাপিয়ে টিভির পাশের টেবিলটার ওপরে রাখা জোড়া ছবিটার ভিতর থেকে আমার দিকে চেয়ে-চেয়ে হাসছে।

এতদিন টেবিলটায় মা-র একার একটা ছবি থাকত। এখন বাবা-মা দু'জনে ওই টেবিলটায় কাছাকাছি ঘেঁষে বাসা বেঁধেছে।

পুরস্কার সাজিয়ে রাখার ব্যাপারটায় আমার চিরকালের অনীহা। ফলে আমার ঘরে আমার পাওয়া কোনও পুরস্কার নেই।

সেগুলো সব আমার বাবার সম্পত্তি। পুরস্কারটা পাওয়াটুকু অবধি। তারপর অবধারিত ভাবে বাবাকে এনে দিয়ে দেওয়া—এটা যেন বাবার নতুন স্ট্যাম্প সংগ্রহের খাতায় আরেকটা ডাকটিকিটের মতো একটা নতুন সংযোজন।

একবার আমার কোনও একটা পুরস্কার বাবা বাজার করার সময় বাজারের থলিতে লুকিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, নিত্যকার যোগাযোগের বাজার-বন্ধুদের দেখাবে বলে।

আমি পরে জানতে পেরে পেল্লায় চেঁচিয়েছিলাম।

মা কেবল শান্তভাবে বলেছিল,

—প্রাইজটা কি তোর একার?

এরপর আর কোনওদিন আমার পুরস্কার নিয়ে বাবার কোনওরকম আদরের 'আদেখলাপনা'-র কোনও প্রতিবাদ করিনি।

পুরস্কারগুলো সাজানো থাকত বাবা-মা'র বসার ঘরে। ওদের অতিথিদের জন্য।

আপাতত ঘরটা ভেঙে আমার স্টাডি তৈরি করা হচ্ছে।

মনে হচ্ছে এবার থেকে সেখানেই পুরস্কারগুলো থাকবে। নইলে বাবার কষ্ট হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর, আমার পুরস্কার নিয়ে বাবার বাড়াবাড়ির যে-যে ঘটনাগুলো সেদিন আমাকে অপ্রস্তুত করেছে, সব ক'টা যেন আজ সব পুরস্কারের থেকে বেশি স্বর্ণাভ, বেশি উজ্জ্বল, এবং অনেক অনেক বেশি দামি।

সেগুলো আজীবন অমলিন রাখার একটাই কুঠুরি।

আমার হৃদয়।

২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১০

এবার পুজোয় বেশ একটা মজার ঘটনা ঘটল। গোবিন্দ, যে আমার গাড়ি চালায়—সে, আর বিশু, যে আমার দেখাশুনো করে, দু'জনে পালা করে ছুটি নিল পুজোর চারটে দিন—নইলে আমি একেবারে একলা পড়ে যেতাম।

গোবিন্দ সপ্তমী আর অষ্টমী, আর বিশু নবমী, দশমী। গোবিন্দ ছাড়া আমি একেবারেই অচল—এই পুজোর বাজারে কোথাও ট্যাক্সি নিয়ে বেরোনোরও মানে হয় না। ভিড়ে ফেঁসে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা। ফলে প্রথম দু'টো দিন বাড়িতেই কেটে গেল। নবমী-র দিন ভোরে গোবিন্দ ফিরল—এবার বিশুর বাড়ি যাওয়ার পালা।

পুজোর তিনটে দিন কেটে গিয়েছে—বাড়ি থেকে এক পা বেরোইনি। গোবিন্দকে বললাম—চল। আমরা একটু ঠাকুর দেখে আসি।

দু'টোই ঠাকুর, ম্যাডক স্কোয়ার আর বাগবাজার। ম্যাডক স্কোয়ার-এর পুজো মা-র শেষ ঠাকুর দেখা। আমি আর বাবা ধরে ধরে নিয়ে গিয়েছিলাম। গোবিন্দও সঙ্গে ছিল। আর বাগবাজার ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি বাবার হাত ধরে।

সকাল ন'টা। তখনও মহানগরীর রাস্তায় ঢল নামেনি।

ম্যাডক স্কোয়ার-এর প্যান্ডেলে তেমন ভিড় নেই। গোবিন্দ আর আমি গাড়ি থেকে নেমে টুক করে ঠাকুর দেখে এলাম।

বাগবাজার পৌঁছতে-পৌঁছতে প্রায় বেলা দশটা। ততক্ষণে রোদ এবং দর্শনার্থী দুই-ই বেড়েছে। গলির মধ্যে গাড়ি ঢোকার নিয়ম নেই।

আমার ইচ্ছে ছিল, গোবিন্দ সঙ্গে আসুক। গোবিন্দই গুঁইগাঁই করল,

—না দাদা, যদি পার্কিং নিয়ে ঝামেলা হয়। আমি থাকি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি দিব্যি নেমে, হেঁটে, গলিটুকু পার করে প্যান্ডেলের দিকে রওনা দিলাম। মিনিট দুই পরে হঠাৎ রাস্তার অন্যান্য মানুষ, যাঁরা ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছেন, তাঁরা নিজেদের মধ্যে ফিসফাস শুরু করলেন,

—ঋতুপর্ণ ঘোষ। ঋতুপর্ণ ঘোষ...

আসলে আমি একা-একা পায়ে হেঁটে ঠাকুর দেখে বেড়াচ্ছি, কোনও পুজো-বিচারকদের বাসে করে নয়—এটা বোধহয় কোনও কারণে তাঁদের কাছে আজব ঠেকেছিল।

যাক গে, নানাবিধ আন্দাজ, অনুমানকে অতিক্রম করে, রোদচশমায় মুখ ঢেকে মণ্ডপে ঢুকলাম। ঠাকুর দেখলাম। মণ্ডপে আবার অনেক অনুরাগীর ভিড়। তাঁরা আমার সঙ্গে ছবি-টবিও তুললেন। আমি একটা কাষ্ঠহাসি হেসে, আমার যে-প্রোফাইলটা তুলনামূলকভাবে ভাল, সেদিক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পরের পর ছবি তুলতে দিলাম। একজন মহিলার কথায় বেশ হাসি পেয়ে গেল। এগিয়ে এসে বললেন,

—ঠাকুর দর্শন করলাম। এবার আপনাকে দর্শন করি?

জোরে জোরে আর হাসি কী করে? সেই ঠিক প্রোফাইল-এর প্রসন্ন কাষ্ঠহাসি। এবার ফিরতে হবে গাড়ির কাছে। আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে ভিড় জমবে বুঝতে পারছি।

অত্যন্ত অনুশীলিত সাবলীলতায়, কালো চশমা পরে, বেশ গটগট করে হেঁটে ফিরছি গলি দিয়ে—হঠাৎ দু'টো জিনিস একসঙ্গে চোখে পড়ল :

গোবিন্দ বোধহয় কোনও একটা নিরাপদ জায়গায় গাড়ি পার্ক করে, একটা সানগ্লাস পরে, চাবির রিং ঘোরাতে-ঘোরাতে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। দেখে একটু আশ্বস্ত হলাম—যাক। মোড়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ফোন করে ডাকতে হবে না।

আর দেখি, রাস্তার ধারে, দু'পাশে সবজি বাজার বসেছে। আশ্বিন সকালের আলোয় ঝলমল করছে তরিতরকারি। বিশুটাকে পার্সলে পাতা আনতে বললেই বলে, নাকি আমাদের বাজারে পাওয়া যায় না।

এখানে দেখছি দিব্যি কচি সবুজ পার্সলে। গোবিন্দ এসে পাশে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণ। জিগ্যেস করলাম,

—গোবিন্দ, পার্সলে পাতা নিয়ে নেব?

আর গোবিন্দ—যে আদ্দেক সময় তোতলায়, আমায় সাধারণত 'আপনি' বলে, বকুনি খেলে ঘাবড়ে গিয়ে 'তুমি' বেরিয়ে যায়—সে বেশ স্মার্টলি বলল,

—নিতে পারো।

আমি আর গোবিন্দ ঝুঁকে পার্সলে পাতার দর করছি, হঠাৎ একটা অদ্ভুত মন্তব্য কানে আসতে ফিরে তাকালাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই তরুণী—নতুন শাড়ি, কপালে বড় টিপ, শ্যাম্পু করা চুল—তাদের একজন ঠারেঠোরে আমাকে আর গোবিন্দকে দেখিয়ে অন্যজনকে বলছে,

—বাবা! এবার এটাকে জুটিয়েছে? পারেও!...

বুঝলাম, তাদের তাৎক্ষণিক অনুমানে গোবিন্দ আমার সাম্প্রতিক বয়ফ্রেন্ড।

গোবিন্দ দেখলাম কথাটা শুনেছে। ভেবেছিলাম লজ্জা পাবে। দেখলাম, মোটেও কোনও বিকার হল না। অন্তত সাময়িক ভাবে একজন সেলিব্রিটি-র সমকামী-প্রেমিকের ভূমিকায় অভিনয়টা অটুট রেখে দিল, আর আমরা দিব্যি স্বামী-স্ত্রী'র মতো সকালের বাজার সেরে গাড়িতে উঠলাম।

গাড়ি চলছে বাড়ির দিকে। আর আমি নিজে মনে-মনে প্রচণ্ড হাসছি, কাউকে ফোন করে যে গল্পটা বলব তার উপায় নেই—কারণ গাড়িটা চালাচ্ছে খোদ গোবিন্দ।

ফেরার পথে বাঁদিকে পড়ল মহম্মদ আলি পার্কের পুজো। সকালের আলোয় নজর করলাম, পার্কের সাইনবোর্ডে 'মহম্মদ আলি পার্ক' কথাটা বাংলায় লেখা এবং উর্দুতে।

কেন জানি হঠাৎ মনে হল, মানুষের কল্পনায় যদি দু'জন আপাত অসম মানুষের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে, তা হলে সমগ্র ভারতবাসীর কল্পনা দিয়েও কেন হিন্দু-মুসলমান প্রণয় আজও তৈরি হ'ল না। সেটা কি আমাদের মানবিক দুর্বলতা?

পাশাপাশি, অনেকগুলো নামের মধ্যে মনে পড়ল একজন এমন মহৎ কল্পনার অধিকারীর নাম : লালন।

আমাদের এই সংখ্যার নায়ক।

AMARBOI.COM

৩১ অক্টবর, ২০১০

'বেডরুম' শব্দটা আমি কেবল ইংরেজিতে বইতেই পড়েছি ছোটবেলায়। শব্দটার সঙ্গে কোনও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। আমাদের বাড়িতে ছোটবেলায় আলাদা করে কোনও শোওয়ার ঘর বলে কিছু ছিল না।

ছিল মা-বাবার ঘর, ঠাকুমার ঘর, আমাদের ঘর।

প্রত্যেক ঘরেই একটা খাট ছিল। কিন্তু সেই আসবাবটাই কখনও ঘরটার নামকরণ করেনি।

আমার মনে হয় যৌথ পরিবার ভাঙার পর, অন্দরমহল বলে আর যখন কিছু রইল না তখন বেডরুমগুলোই বোধহয় ছোট ছোট অন্দরমহল হয়ে গেল।

কত্তারা অফিস চলে গেলে ওইটাই বাড়ির গৃহিণীর পৃথিবী। সেখানেই তাঁর ট্রানজিস্টর, সেলাইয়ের বাক্স, ঠাকুরের আসন। কেবল টিভিটা আর টেলিফোনটা বসার ঘরের অহংকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা বা ঠাকুমাকেও দেখেছি দিনের বেলাটা নিজেদের ঘরেই কাটাতে। সেখানে বিছানাতে বসেই বই বা কাগজ পড়া, ধোপার হিসেব নেওয়া, বিকেলের চা-টা তারিয়ে-তারিয়ে খাওয়া আবার ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন এলে তাদের সঙ্গে সেই খাটে বসেই পা ছড়িয়ে আড্ডা মারা।

সন্ধেবেলা বাবা অফিস থেকে ফিরলে ওখানে বসেই চা খাওয়া, সাংসারিক কথাবার্তা—মাঝে মাঝে বারান্দায় গিয়ে দু'জনে বসা।

আমি আর আমার ভাই আমাদের ঘরে বসে পড়েছি, আমি চিরকাল হেঁটে। ভাই খাটে বসে। লেখার টেবিলের ধার মাড়াইনি কোনওদিন। তাই ছিল আমাদের বাড়িতে।

বাড়ির লোকেদের ঘর। সেই অধিবাসীদের নামে। সব ক'টাতেই খাট ছিল। কোনওটাই বেডরুম ছিল না।

এমনকী গরমকালে দক্ষিণের খোলা হাওয়া আসত বলে বসার ঘরের সোফা সরিয়ে আমার আর ভাইয়ের বিছানা হত মাটিতে। আমাদের মাথার কাছে ঘুমোত আমাদের অ্যালসেশিয়ান 'রূপসী'।

কেবল মশারির আচ্ছাদন কেমন করে যেন দিনের বেলার ঘরগুলোকে রাত্তিরে বেডরুম করে দিত।

এখন আমাদের বাড়ির দোতলায়, বাবা-মা যে-অংশটায় থাকত, সেখানটা নতুন করে মেরামত হচ্ছে, আমি বেশি সময়টা ওখানেই কাটাই।

ওদের ঘরটা বন্ধ। যে-খাটে মা'র আড়াই বছরের রোগশয্যা, যে-খাটে আমার চিরকর্মঠ বাবাকে শুয়ে থাকতেই দেখেছি গত এক বছর—সেই খাট-সহ ঘরটা বন্ধ।

পাছে মেরামতের ধুলো-জঞ্জাল ঢোকে সেই ঘরে।

মাঝে-মাঝে খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেলে কেন যেন অকারণেই ভাবি, আরেকটু পর সকাল হবে— মা-বাবার ঘরের দরজা খুলবে। ওরা ঘুম ভেঙে উঠে এসে বসবে আমার পাশে।

আমাদের শরতে-আলোর দক্ষিণের বারান্দায়। তারপর বেলা বাড়ে। কেউ আসে না। আমি ব্যস্ত হয়ে যাই।

বুঝি এতদিনে বাবা-মা'র ঘরটা শুধু বেডরুম-ই হয়ে গিয়েছে।

২১ নভেম্বর, ২০১০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই যে কবি শিখিয়ে গেলেন 'জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে' আর অমনি বার-বার মনের মধ্যে গুনগুন করতে-করতে আমরাও (আমি অন্তত) ভেবে নিলাম, জীবন এবং মরণ একটাই রাস্তা, আর 'সীমানা ছাড়ায়ে' মানে একই সঙ্গে দু'টোর সীমানা, অতএব সীমানাটা একটাই।

তারপর ছোটবেলায় 'নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু' শুনতে-শুনতে মনে হয়েছে এ দু'টোও বোধহয় হাসি-কান্নার মতো মিলে-মিশে আছে।

তখনও মৃত্যু দেখার বয়স হয়নি। ঠাকুমা যখন চলে গেলেন একানব্বই বছর বয়সে, তখন সান্ত্বনা দিতে-আসা আত্মীয়-স্বজনরা সকলেই বলেছিলেন,

—মনখারাপ কোরো না। এ একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে।

ভেবেছিলাম, মৃত্যু হলেও বোধহয় ভালই হয় কখনও-সখনও।

আমার প্রথম দেখা মৃত্যু আমাদের পোষা অ্যালসেশিয়ান রূপসী-র। তিন মাসে এসেছিল। চোদ্দো বছর বয়সে চলে গেল।

আমি ওর বিশাল দ্যুতিমান শরীরটার ধীরে-ধীরে নিথর অশক্ত হয়ে-আসা নিজের চোখে রোজ দেখেছি। তবু কখনও কল্পনা করতে পারিনি যে, এমন দিন আসতেও পারে, যেদিন এই পৃথিবীতে রূপসী নেই!

রূপসী যেদিন চলে গেল, আমি তখন পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দিচ্ছি। পরের দিন বারান্দায় যেতে খটকা লাগল। যে-রূপসী শেষের দিকে চলতেও পারত না, আমার ছোটমামা ভেটেনারি ডাক্তার বলে বাড়ি এসে দেখে যেতেন—সেই রূপসী গেল কোথায় ওর বারান্দার কোণ ছেড়ে?

মা-কে জিগ্যেস করতে দেখলাম, মা চোখে আঁচল চাপতে-চাপতে শক্ত হচ্ছেন,

—পরীক্ষা দিয়ে এসেছিস। আগে খেয়ে নে। বলছি।

আমার মরিয়া হয়ে-যাওয়া অসহায়তার সামনে মা-র নির্লিপ্তির অর্গল রইল না বেশিক্ষণ।

জানলাম, বাবা আর চিন্টু রূপসী-র শেষকৃত্য করে এসেছে। ঠিক হয়েছিল, পরীক্ষা শেষ হলে আমায় জানানো হবে।

রূপসী চলে গেল।

আমি একটা বিচ্ছেদ বুঝলাম, মৃত্যুটা সম্যকভাবে বুঝলাম না। হয়তো আমার চোখের আড়াল হয়ে কেমন যেন থাকা-না-থাকার মধ্যে বাস করতে লাগল রূপসী।

চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করত—প্রমাণ দেখাও যে, রূপসী আর নেই। কোনও দিনও আসবে না।

আবার বুঝতাম, সেটাও বাতুলতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর বড়-বড় হতে নানা প্রিয়জনের (বেশির ভাগই বৃদ্ধ) মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে রূপসীর সেই মৃত্যুজিজ্ঞাসা কখন হারিয়ে গেল, জানি না।

তারপর এল আমার জীবনের বড় দু'টো ধাক্কা।

মা—তারপর বাবা—চলে গেল।

এদের কারও শেষ নিশ্বাস ত্যাগের সময় আমি পাশে ছিলাম না। মা বাড়িতে, আর আমি তখন উড়োজাহাজে—বম্বে থেকে কলকাতা আসছি।

বাবা ভোররাত্তিরে পৌনে পাঁচটায়, হাসপাতালে, আমি বাড়িতে—হাসপাতাল থেকে ফোন করে খবর দিলেন কর্তৃপক্ষ।

মনে আছে, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পুরো শেষকৃত্যটুকু শেষ করলাম। দহনান্তে চুল্লির নীচে অবধি গিয়ে অস্তিম ভস্মটুকুও নিয়ে এলাম। গঙ্গায় গিয়ে ভাসিয়ে দিলাম।

প্রচুর বন্ধুবান্ধব, অনুরাগী এলেন দেখা করতে, সান্ত্বনা দিতে। এই বাড়িতে আমি যে একা হয়ে গেলাম, তা-ও শুনলাম। তখনও বুঝলাম কতটা, জানি না।

সেদিন রাতে ঠিক চারটের সময় ঘুম ভেঙে গেল। আমি ঠায় বসে মিনিটের কাঁটা দেখছি। ধীরে-ধীরে হৃৎপিণ্ড Adam's apple হয়ে উঠছে।

ঘড়ি কাঁটা বদলাচ্ছে—চারটে কুড়ি, সাড়ে চারটে, চারটে চল্লিশ, পৌনে পাঁচটা। আমি হাসপাতালে ফোন করলাম। প্রায় রোজ যেমন ঘুম থেকে উঠেই করতাম—আচ্ছা ৩০৭ নম্বরের পেশেন্ট কেমন আছেন?

ওপারে অস্বস্তিকর নীরবতা। কিছুক্ষণ পর সিস্টারের গলা এল,

—দাদা, উনি তো কাল...

ব্যস, আমার যেটুকু জানার ছিল জানা হয়ে গেল।

তা হলে সব সত্যি! বাবার কাচের গাড়িতে চলে যাওয়া। বান্টি-র (সঞ্জয় নাগ) সমানে শ্মশানে দাঁড়িয়ে মিউনিসিপ্যালিটি-র ডেথ সার্টিফিকেট বার করা, চিঙ্কু-র নিঝুম হয়ে শ্মশানের এককোণে বসে থাকা, মেজোমামা, ছোটমামা, বিল্টুদা, রানি, ঝিল্লির (আমার ভাইবোন) সব ক'টার উপস্থিতি সত্যি।

আমি যে জ্বলন্ত চুল্লিতে ঢোকানোর সময়, ট্রেনের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ যেভাবে পরিজনকে বিদায় দেয়, তেমন করেই বাবাকে বলেছিলুম,

---সাবধানে যেও। মা অনেকদিন অপেক্ষা করছে।—এর একটাও আমার কল্পনা নয়। স-অ-ব সত্যি!

ফোনটা রেখে আমার লেখার টেবিলে বসলাম। সকালের আলো পরদার ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে পড়েছে বিছানায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেবল মনে হল, ট্রেনে তো তুলে দিলাম, এখন কোন স্টেশনে পৌঁছল, চা খেয়েছে কি না, ট্রেন লেট কি না—কিচ্ছুটি তো জানা হল না।

৪ মার্চ, ২০১২

এই সমস্ত কথাই বারবার মনে হচ্ছিল 'ই ই ডি এফ' বা অরবিন্দ সেবাকেন্দ্র-র ৩১৪ নম্বর বেডে বসে।

এই ওয়ার্ডেরই অন্যদিকের একটি ঘরে আমি ভোরবেলা এসে দেখেছিলাম নিদ্রিত বাবাকে। অন্যান্য দিনের বিশ্রামের সঙ্গে তফাতটা শুধু এই যে, দুই নাকে তুলো গোঁজা।

আড়াই মাস যখন মা কোমা-য় পড়েছিল এই ওয়ার্ডেরই সামনের কোনও একটা ঘরে—প্রত্যেকদিন, প্রত্যেকবার হাসপাতালে ঢোকার আগে কী যে চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে ঢুকতাম, মনে হত—গিয়ে দেখতে পাব তো? গটগট করে কোনও দিকে না-তাকিয়ে সোজা মায়ের ঘরে।

খাটে শায়িত মা। মৃদু নিশ্বাস চলছে। ব্যস্ শান্তি। ফিরে গেলাম। আবার। আবার। আবার...

সেই ই ই ডি এফ-এ আপাতত আমার বাস। শুটিং-এর সময় আমাকে পেড়ে ফেলেছিল যেসব অসুখ, যেগুলোর কথা বলছিলাম এর আগের আগের 'ফার্স্ট পার্সন'-এ—সেগুলোর জন্য একটা বিশদ চেক-আপ করাতে।

আমার ডায়াবেটিস আছে, আমি জানি। এবং নয়-নয় করে প্রায় কুড়ি বছর। ফলে ওই রোগটার ওপর আমার 'বিশেষ' একটা পাহারাও আছে। আমি জানতে চেয়েছিলাম—এই যে কথায়-কথায় হাত-পা ফুলে-ওঠা, অ্যালার্জি, ক্র্যাম্পস ইত্যাদির বিষয়ে যাবতীয় চেক-আপ করে নিয়ে সেইমতো বাড়িতে এসে ওষুধ খাব। ড. তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (আমি তপনদা বলি, পরিচিত TKB নামে) স্পষ্ট বলে দিলেন, আটচল্লিশ ঘণ্টা থেকে বাহাত্তর ঘণ্টার ব্যাপার। সেই হিসেবে কাজও রাখলাম বিস্তর।

শুটিংয়ের কারণে দীর্ঘদিন কোথাও যাইনি। ফলে ইচ্ছে করেই কতগুলো অনুষ্ঠানে যোগ দেব ঠিক করেছিলাম।

তখনও বুঝিনি, বিধাতা অন্যভাবে সাজিয়ে রেখেছেন আমার দিনগুলোকে। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরল। আমার হিমোগ্লোবিন লেভেল ধরা পড়ল ৬.৫। একসময় কেবল ৫-এ নেমে এল। দুর্বলতা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারাক্ষণ ঘুম-ঘুম ভাব—আমার আর ছুটি পাওয়া হল না।

৩১৪ নম্বর ঘরে আমি হয় বই পড়ি, নয় ঘুমোই, নয় জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকি। আমি যেন 'ডাকঘর'-এর অমল। কেবল রাজা-র চিঠিটা এখানে হাসপাতালের ছাড়পত্র হয়ে গিয়েছে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। শরীরের যা অবস্থা, কোনও চিকিৎসকই বলতে পারছেন না কবে ছাড়া পাব।

এদিকে একগাদা কমিটমেন্ট। অন্য অনেক অনুষ্ঠান 'অসুস্থ', 'হাসপাতাল-বন্দি' বলে কাটিয়ে দেওয়া যায়। যে-দু'টো কিছুতেই পারব না—'মিলনী' বলে একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর অনুষ্ঠান, দ্বিতীয়টা একটা বিতর্কসভা।

আমাকে 'মিলনী'-র হয়ে অনুরোধ করেছিলেন আমার অগ্রজপ্রতিম সুবীরদা (সুবীর মিত্র, ওরফে লাল্টুদা)। সুবীরদা আর আমি কয়েক বছর 'আনন্দবাজার'-এ সহকর্মী ছিলাম—তখন আমি 'আনন্দলোক' সম্পাদনা করি, আর সুবীরদা ছিলেন 'আনন্দলোক'-এর চারটে বাংলা ম্যাগাজিনের মাথা।

এই মানুষটার মতো আন্তরিক, ভদ্র এবং সজ্জন আমি এখনকার দিনে দেখতে পাই না—ফলে সুবীরদাকে কথা দিলে সে-কথা আমায় রাখতেই হবে।

অন্যটা ব্রততী মুখার্জির শিল্পকলা প্রদর্শনী, আমার উদ্বোধন করার কথা। সেই মর্মে কার্ড পর্যন্ত ছাপানো হয়ে গিয়েছে।

অতএব তপনদার পায়ে পড়া,

—তপনদা, আমি এঁদের কথা দিয়েছি, কী করব?

তপনদা নিতান্তই নাছোড়বান্দা।

—ভাল করে বাথরুম যেতে পারছ না, ফাংশনে যাবে মানে?

—মানে, যেতেই হবে তপনদা। প্লিজ, তুমি দ্যাখো!

অনেক ভেবেচিন্তে বললেন,

—আচ্ছা, দু'টো সন্ধে প্যারোলে ছুটি পাবে। কিন্তু ম্যাক্সিমাম এক ঘণ্টা। সঙ্গে হসপিটাল স্টাফ যাবে।

বিনোদ, আমার হাসপাতালের পেয়াদা। বিকেল চারটে থেকে সাদা ধবধবে জামা পরে তৈরি।

আর আমি—আমার ঘরের পরদা টেনে দিয়ে তৈরি হতে শুরু করলাম। পোশাক পরা হয়ে গিয়েছে।

এবার আয়নার সামনে দাঁড়াতেই বুঝলাম : মুখ-জুড়ে ক্লান্তির বিষাদ।

ভুরু আঁকা হল, চোখে পেনসিল পড়ল, ঠোঁটে লিপলাইন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর আমার যে নাইট ডিউটি করে, শাবানা, সে হাঁ করে দেখছে।

আমি এখনও নিজে দুল পরতে পারি না। তাই শাবানা পরিয়ে দিল।

দিয়ে, অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

—কী সুন্দর দেখাচ্ছে গো? যেন ফিল্মস্টার!

'মহাভারত'-এ কোথায় যেন পড়েছিলাম নটীদের জন্য এক বিশেষ নরক নির্ধারিত আছে। নামটা মনে পড়ল না। ভাবলাম, সময় করে নৃসিংহদা-র থেকে পরে জেনে নেবখন।

১১ মার্চ, ২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

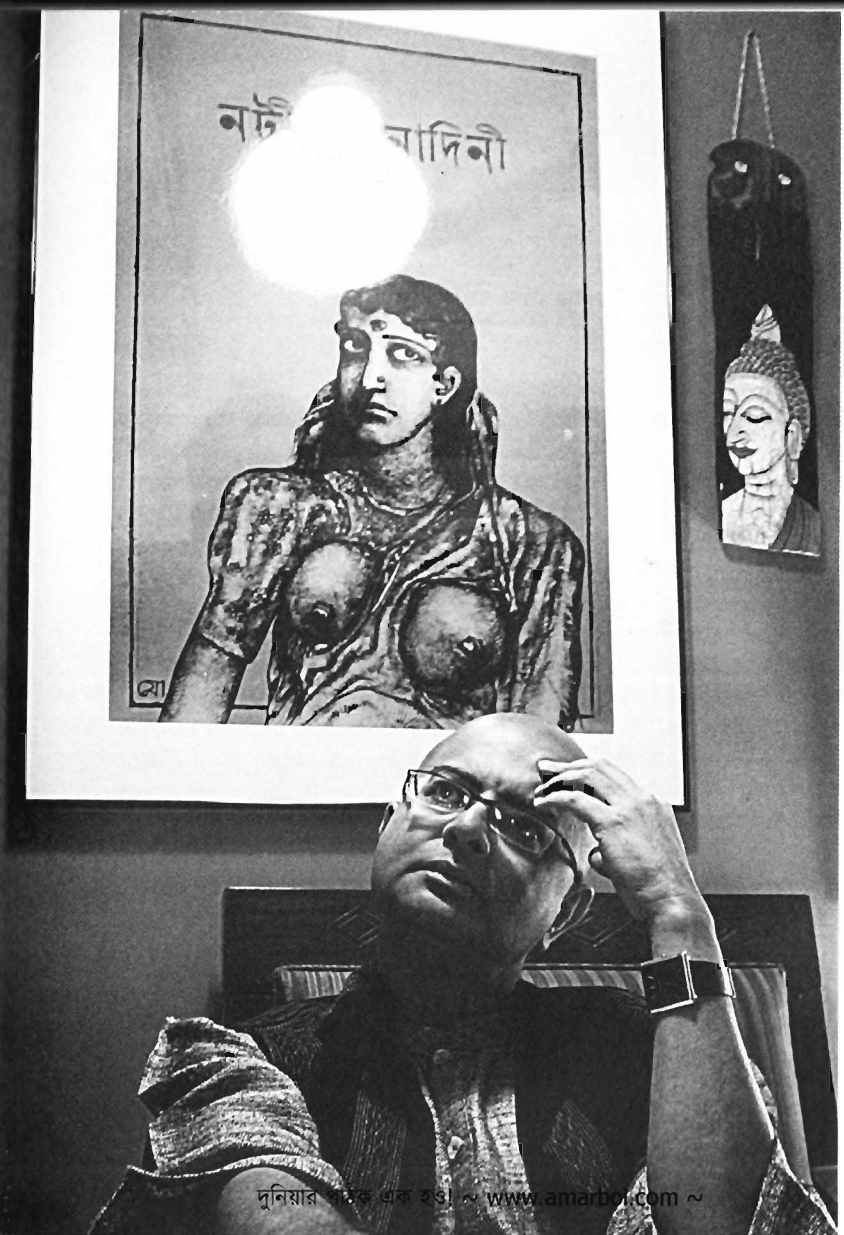

চারবাংলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক

জয়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় করে দিয়েছিল রীণাদি। আজ থেকে প্রায় সতেরো বছর আগে।

একটা গাঢ় সবুজ রঙের পিসবোর্ড মলাটের খাতা ছিল রীণাদির। হয়তো এখনও আছে। লাইনটানা এক্সারসাইজ বুক। রীণাদির কবিতার খাতা। তাতে নিজের হাতে প্রিয় কবিতাগুলি টুকে রাখত রীণাদি। যখন কোনও অনুষ্ঠানে কবিতা পড়তে যেত, সঙ্গে যেত খাতাটি।

বহুদিন ধরেই রীণাদির পছন্দের নানা কবিতা এক এক করে এসে জমা হয়েছে ওই খাতায়। নানা কালিতে লেখা। কখনও সময় নিয়ে গোটা গোটা করে। কখনও একটু তাড়াহুড়োর হস্তাক্ষরে।

মনে আছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দ ভৈরবী' ছিল। বুদ্ধদেব বসুর 'ইলিশ' ছিল। সুনীলদার 'স্মৃতির শহর'—এর কিছু কবিতা ছিল। আর বেশ পর্যাপ্তভাবে ছিলেন জীবনানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ।

ছোট একটা প্রায়-অপ্রাসঙ্গিক গল্প বলি। তখন উনিশে এপ্রিল করছি। সরোজিনী—অর্থাৎ রীণাদি যে প্রথিতযশা নৃত্যাঙ্গনার চরিত্রটি করছিল, তার একটি অতি প্রিয় বহুকালসঞ্চিত রান্নার রেসিপি খাতার প্রয়োজন ছিল ছবিতে। অনেক খুঁজে শেষ পর্যন্ত রীণাদির কবিতার খাতাটিই ব্যবহার করা হয়েছিল। রান্নাঘরের মোমবাতিজ্বলা বৃষ্টির রাতে, গাঢ় সবুজ জামা পরা চুমকি (দেবশ্রী রায়), গাঢ় সবুজ শাড়ি পরা রীণাদি, আর সেই গাঢ় সবুজ মলাটের খাতাটি আজও উনিশে এপ্রিলের ডিভিডি চালালেই দেখতে পাবেন।

সেই গাঢ় সবুজ খাতার হলদে হয়ে যাওয়া পাতা থেকে কোনও এক গ্রীষ্মের দুপুরে রীণাদি প্রথম পড়ে শুনিয়েছিল—

আমি তখন নবম শ্রেণী, আমি তখন শাড়ি

মনে আছে তাড়াতাড়ি করে রীণাদির খাতা থেকে মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয় টুকে নিয়েছিলাম কোনও একটা প্যাডের পাতায়। বাড়িতে এসে ভাল করে লিখে রাখতে রাখতেই মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল কবিতাটা।

'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়' বলতে আজও আমার সেদিনের সেই দুপুরবেলার হলদে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোয় রীণাদির প্রায় জীর্ণ হয়ে আসা কবিতা খাতার হলদেটে পাতাটা দেখতে পাই। দেখতে পাই কালো কালিতে মেয়েলি ছাঁদে লেখা কতগুলি বিলাপবিদ্ধ পংক্তি।

কেন যেন মনে হয়, মালতী ইস্কুলের সেই অনামী মেয়েটি যদি কখনও লুকিয়ে লিখত তার বঞ্চিত হতাশ জীবনলিপি, হয়তো বা এমনটাই হত তার হস্তাক্ষর।

দুই

জয়ের সঙ্গে দ্বিতীয় বার পরিচয় করিয়ে দিল দেবু। দেবব্রত দত্ত। আমার বন্ধু ও সিনেমা-সহকর্মী।

সেও এক দুপুরবেলা। এবার, আমাদের বাড়িতে। দেবু এসেছে, যেমন প্রায়ই আসে।

সদ্য লেখা 'মালতীবালা বিদ্যালয়'-এর প্রসঙ্গ ধরেই আড্ডা হচ্ছে, হঠাৎ দেবু আমাকে প্রায় স্তব্ধ করে দিল অন্য একটি কবিতা বলে—

অতল, তোমার সাক্ষাৎ পেয়ে চিনতে পারিনি বলে
হৃদি ভেসে গেল অলকানন্দা জলে

মনে হল, একী শুনলাম আমি! আমার মাথাটা যেন কেমন রিমঝিম করছে। 'হৃদয়ের এ কূল ও কূল দুকূল ভেসে যায়' তো কতবার শুনেছি, কিন্তু 'হৃদি ভেসে গেল অলকানন্দা জলে।'

যেন প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে কুলকুল করে বেরিয়ে আসতে চাইছে হৃদয়, সত্যি যে সে আছে সে তো কবিতায় বা বায়োলজিতে পড়েছি মাত্র—বুঝলাম যেন সেই প্রথম।

ভেসে তো যেতই মনে না করিয়ে দিলে

আমার চারপাশের চেয়ার-টেবিল খাট বিছানা ভাসিয়ে নিয়ে বয়ে চলেছে অলকানন্দা। আমারও যেন নিস্তার নেই—ভেসে তো যেতে হবেই সেই খরস্রোতে। কেবল, কেউ কি এসে তুলবে আমায় হাত ধরে? তুলবে কি? কে মনে করাবে, না কি মনে পড়বে নিজে থেকেই? যদি আমায় পড়ে তাহার মনে...

পরের দিনই জয়ের যে-কটা কবিতার বই কিনতে পাওয়া যেত, কিনে ফেললাম। ভাগ্যিস বইগুলো তখনও তেমন মোটা ছিল না। আমার কাঁধের ব্যাগে নিত্যসঙ্গী হয়ে ঘুরত বইগুলো। আর, অযাচিত আবৃত্তিতে ঝালাপালা করে দিতাম বন্ধুবান্ধবদের কান।

তিন

আমার 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়' পড়ার একমাত্র গুণমুগ্ধ শ্রোতা ছিল আমার মা। কতবার যে কাজের মধ্যে থেকে প্রায় অকারণেই ডেকে এনে বলেছে—

ওই কবিতাটা একবার বল না, বাপি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডায়বেটিস-এ ভুগে দৃষ্টিশক্তি কমে এসেছিল মা'র।

ছোট ছাপা লেখা পড়তে অসুবিধে হত।

জয়ের কবিতার অনেক ক্যাসেট খুঁজে খুঁজে এনে দিয়েছি মা'কে, লোপা যখন 'বেণীমাধব' গাইল, তক্ষুণি কিনে এনেছিলাম মা'র জন্য। ইচ্ছে করলে শুনবে বলে।

মা'র তবু আমার পড়াটাই পছন্দ ছিল। বলত —ওগুলো যেন বড্ড বেশি ঠিকঠাক। তোর আনাড়ির মতো পড়াটাই ভাল।

পরে এটা নিয়ে রীণাদির সঙ্গে একান্তে আর গৌরীদির (গৌরী ঘোষ) সঙ্গে 'এবং ঋতুপর্ণ' অনুষ্ঠানে কথাও বলেছি আমরা—'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়' ঠিক কেমন করে পড়া উচিত, তাই নিয়ে।

পেশাদার আবৃত্তিকারদের কবিতা পড়া নিয়ে একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। সেখানে সচরাচর স্বরক্ষেপ, উচ্চারণ শুদ্ধতা, কাব্যনাট্যভঙ্গির একটা বিশেষ উচ্চকিত ভূমিকা থাকে।

যার আড়ালে কেন যেন আমি, হয়তো বা আমার মা-ও মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়ে পড়া, সুলেখার বান্ধবী, শহর থেকে আসা উজ্জ্বল বেণীমাধবের সঙ্গে ব্রিজের ধারে একবার দেখা হওয়ার সেই রক্তাক্ত অভিঘাতটুকু একান্তে আঁকড় ধরে রোজ একতলার জ্যোস্নামোছা মেঝেতে শোয়া মেয়েটার বিনিদ্র দীর্ঘশ্বাসটুকুও হারিয়ে ফেলতাম।

কখন যেন কবিতা পড়িয়েরা তাঁদের কণ্ঠস্বর বাচনভঙ্গির রাজকীয়তা দিয়ে যেন অজান্তেই আচ্ছন্ন করবেন সেই অভাগিনীর প্লুতস্বর, প্রায় যেন 'বিদায় অভিশাপ'- এর দেবযানী আর মালতীবালার এই মেয়েটি তাদের স্বকীয়তায়, দৃঢ়তায়, অভিমানে, অপমানে একইরকম স্পষ্টকণ্ঠী হয়ে উঠত—দেবগুরুকন্যা আর মফরস্বলের এই অনামী সেলাই দিদিমণির আর যেন কোনও তফাত থাকত না।

চার

ছাত্রজীবনে সত্যজিৎ রায়ের ছবি যেমন মুক্তি পেলেই প্রথম শো-তে দেখাটাই ছিল অবশ্য কর্তব্য, জয়ের বইও তেমন বেরোনো মাত্রই পড়েছি। অনেক ভাল কবিতাও পড়েছি। তবু প্রথম পড়া মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয় কেমন যেন সঙ্গী হয়ে রইল, জীবনভর। মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয় নিয়ে সহজেই একটা ছোট ছবি করা যেত। করা হয়নি।

জি-বাংলার জন্য কয়েকটি টেলিফিল্ম বানানো হয়েছিল। দেখানো হত রোববার সন্ধেবেলা, 'রোববার-এর বায়োস্কোপ' বলে একটা অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানের নামটা আমিই দিয়েছিলাম। তখনও জানতাম না 'রোববার' নামটা অত সহজে আমার পিছু ছাড়বে না। সেই টেলিফিল্মগুচ্ছ'র প্রথম ছবিটি ছিল আমার বানানো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোড়ায় ছবিটির নাম ছিল বুলা। সে-ও ছিল এক কালো, অবিবাহিতা, অল্পশিক্ষিতা সেলাই-দিদিমণির গল্প। ছবিটা যখন শেষ হচ্ছে ধীরে আমার মনের মধ্যে ছবিটা নামটা বদলে গেল। নতুন নাম হ'ল—কুড়ি নম্বর মালতীবালা লেন।

জয় আমার বড় আদরের কবি। এখন, আদরের মানুষও। ওর কবিতাকে ক্যামেরা দিয়ে ছুঁতে পারি, এমন স্পর্ধা আমার সত্যিই নেই।

বড়জোর ওর কবিতার কিংবদন্তি আমার ছবির শীর্ষনামে এক নব-অভিজ্ঞান হয়ে থাকুক। আমার কাছে সেটাই যথেষ্ট পাওনা। অবশ্য জয় গোস্বামীর কতো কবির জন্য শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে সেটা যথেষ্ট কিনা, জানি না।

এও জানি না, আজ থেকে অনেক বছর পর 'স্ত্রীর পত্র'র মাখন বড়াল লেন-এর মতো মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়ও বাংলা সাহিত্যে উইমেন স্টাডিজ-এর একটি নতুন উৎসমুখ হয়ে উঠবে কি না!

৯ ডিসেম্বর ২০০৭

AMARBOI.COM

নটীদের জন্য নির্দিষ্ট এক নরক আছে। মহাভারতকার অন্তত তাই বলেছেন।

সে নরক ইহজগতে না পরলোকে, আমরা জানি না। কিন্তু নটী তার ললাটলিখন বদলে অর্জন করে নিয়েছে নিজের জন্য এক অক্ষয় স্বর্গবাস, এমনটি আমরা বড় একটা দেখিনি।

কয়েকদিন আগে সুচিত্রা সেন যখন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালবাসিনী হলেন, এবং তাঁর রোগাক্রান্ত জীর্ণকায়া প্রতিকৃতির জন্য অধীর লোভে প্রতীক্ষা করছিলেন মিডিয়া সম্প্রদায়, তখন বারেকের জন্যও মনে হয়েছিল—সত্যিই বুঝি নটীর কপালে স্বর্গবাস লেখা নেই। মহাভারত রচিত হওয়ার এই এত বছর পরেও।

অসুস্থ সুচিত্রা সেন সম্পর্কে মিডিয়ার আগ্রহ নিছক নির্লোভ কুশলসংবাদ মাত্র নয়। যে মহিলা বাইরের পৃথিবীর সমস্ত প্রলোভন বিসর্জন দিয়ে সসম্মানে, সুচিন্তিতভাবে, নিজের জন্য বেছে নিয়েছেন স্বেচ্ছা নির্বাসন—তাঁকে তাঁর রোগাবসাদের অনবধানে ক্ষণেকের জন্য বে-আব্রু করার নির্লজ্জ আগ্রাসী প্রয়াস বুঝিয়ে দিল যে, নটীকে তার স্বেচ্ছায় জীবনযাপনের অধিকার আজও সমাজ দেয়নি।

বাসবদত্তা, বসন্তসেনা, আম্রপালী ইত্যাদি আধা ইতিহাস-আধা সাহিত্য সৃজিতা নগরনটীরা যেমন চিরকাল মানবজ্ঞানসীমার সমস্ত দিগন্ত ব্যেপে চির কুহকিনী হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে আছে, কবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোন মহামানব এসে তাঁকে পরিত্রাণ করবেন—তা সে সন্ন্যাসী উপগুপ্তই হোন, আর গৌতম বুদ্ধ স্বয়ংই হোন না কেন—কারণ সেই সকল তামসহর স্পর্শ না পেলে নটীর নিন্দিত জীবন তো নরকযাত্রার জন্য বৈতরণীর তীরে গিয়েও দাঁড়াতে পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের দেহত্যাগ আর বিনোদিনীর মঞ্চত্যাগ প্রায় সেই স্বতসিদ্ধ পৌরাণিক সমীকরণেই সরল করে মিলিয়ে দেওয়া যায়। ঠিক যেমনটি যায় সুচিত্রা সেনের বেলুড় মঠে ফিরে ফিরে যাওয়ার চিরচাতকিনী প্রতীক্ষা।

ঐতিহাসিকভাবে বেশিরভাগ বিখ্যাত নটীর ইহজীবনই শেষ হয়েছে ধার্মিকতায়, এবং প্রতিটি নটীর উদ্ধারকর্তাই কোনও ধর্মীয় পুরুষ, (প্রায় কোনও ক্ষেত্রেই কোনও সাধিকা নন), একে কি নিছক কাকতালীয়ই বলব না এর বীজ লুকিয়ে আছে পুরুষতন্ত্রের এক আপাতপবিত্র অনুশাসনের শৃঙ্খলে, সে কথা সমাজবিদরা জানেন।

জানতে বড় ইচ্ছে করে, জীবনের শেষপ্রান্তে ক্লান্ত অলস স্বর্ণনূপুরশিঞ্জিত পাদু'খানিকে টেনে এনে কোনও এক মহামানবের হাত ধরে বৈতরণীর তীরে এসে দাঁড়িয়েছেন ইতিহাস বা পুরাণের যে যে নটীরা, তাঁরা কি শেষ খেয়ায় নৌকোয় পা রেখে তীরের দিকে অন্তিমভাবে ফিরে তাকিয়ে কাকে দেখেছিলেন—কোনও ধর্মীয় বিভাকে, না এক প্রবঞ্চক পুরুষকে?

শ্রীরামকৃষ্ণের ইহলীলা শেষ হওয়ার পর এবং নিজের প্রত্যক্ষ নটীজীবন শেষ করার পরও তিপ্পান্ন বছর বেঁচেছিলেন বিনোদিনী দাসী। অহীন্দ্র চৌধুরীর স্মৃতিচারণায় জানতে পারি, তখনও নিয়মিত থিয়েটার দেখতে আসতেন বিনোদিনী। রামকৃষ্ণর অক্ষয় আশীর্বাদ 'তোর চৈতন্য হোক' বিনোদিনীর কাছে 'তুই মঞ্চত্যাগিনী হ' হয়ে পৌঁছয়নি আদপেই।

দ্বিতীয় আত্মজীবনী লেখার সময় লিখেছেন বিনোদিনী।

'আজ-কালকার থিয়েটার মাঝে মাঝে দেখি; কেমন নেশা! সব কাজের মধ্যেও থিয়েটার যেন টানে। দেখি, আজ-কালকার সব নতুন নতুন অভিনেতা অভিনেত্রী, সু-শিক্ষিত, সুমার্জ্জিত, কত নতুন নাটক, কত দর্শক, কত হাততালি, সোরগোল, হৈ-হৈ, সেই ফুটলাইট—সেই দৃশ্যের পর দৃশ্য—সেই যবনিকা পড়ার সময় ঘণ্টার ঢং ঢং শব্দ,—আর কত কথাই না মনে পড়ে! আমরাও তো একদিন এমনি করে সাজতেম, সেই সেকালের মত দর্শক, সেই সেকালের মত রঙ্গসাথী, সেকালের সাজপোষাক, সেকালের নাটক, সেকালের গ্যাসের ফুটলাইট, সেকালের আবহাওয়া।'

বিনোদিনী দাসী সে সময়কার গ্ল্যামার সাম্রাজ্ঞী। তাঁর নায়িকাসুলভ বিভঙ্গ, তাঁর অভিনয় কুশলতা, তাঁর রূপসজ্জা দক্ষতা, সবকিছুই কিংবদন্তি। কিন্তু ইতিহাস তাঁকে কিংবদন্তি করেছে পুরুষতন্ত্রের হিসেবে নিষ্ঠুর মঞ্চরাজনীতির এক আবেগ আলেখ্য হিসেবে। বিনোদিনী আজও আমাদের মনে বেঁচে আছেন সে সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী বলে নয়, স্টার থিয়েটার গড়বার জন্য গুর্মুখ রায়ের কাছে আত্মবলিদানের সেন্টিমেন্টাল রোমাঞ্চকর অধ্যায়ের জন্য।

বিনোদিনীর গ্ল্যামারের একটা বড় অংশ বোধকরি তাঁর নিষিদ্ধ জন্মেতিহাস। বিনোদিনী বাংলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থিয়েটারের শহিদ। কারণ আমরা স্পষ্ট করে জানি যে এই রমণীকে এক বিশেষ পুরুষের 'শয্যাসঙ্গিনী' হতে হয়েছিল—ইতিহাস তার সাক্ষী, তিনি নিজেও তাঁর অকপট আত্মজীবনীতে সে কথা আড়াল করেননি।

বিনোদিনীর চৈতন্যলীলা আজও বিখ্যাত পরমহংসের আশীর্বাদধন্য বলে। উত্তুঙ্গ গ্ল্যামারের শীর্ষে দাঁড়িয়ে একজন নায়িকা পুরুষের পার্ট বেছে নিচ্ছেন, নিজের ভেতর থেকে খুঁড়ে বার করছেন এক শিল্পীকে সে জন্য নয়।

নটীর জন্য নরক নির্ধারিত, তা মহাভারতকার জানতেন।

কিন্তু কখন যে তাঁর অলক্ষে মেনকা, ঘৃতাচী, রম্ভা, উর্বশীরা স্বর্গের ইন্দ্রসভায় পৌঁছে গিয়েছিলেন—আমরা জানি না।

যিনি জানেন তিনি হয়তো বলতে পারেন আজও প্রতি সন্ধ্যায়, ইন্দ্রসভার মেহফিলে চিকের আড়ালে যে আয়ত চক্ষুদু'টি উজ্জ্বল হয়ে থাকে, 'বিনি' বলে ডাকলে তারা চঞ্চল হয়ে সাড়া দেয় কি না?

১৮ মে, ২০০৮

AMARBOI.COM

আমার ছায়াঘেরা ছোটবেলায়, আর অনেক ছায়ার মধ্যে একটা বড় ছায়া ছিল দু'টো আমগাছের। আমাদের পাড়ার গা ঘেঁষে নিউ থিয়েটার্স দু'নম্বর, আপাতত টেকনিশিয়ানস্ টু, স্টুডিওটা দাঁড়িয়ে থাকত একটা বিশাল ভূতুড়ে বাড়ির মতো। আর তার ভেতরে ছিল অনেক আমগাছ, শুনেছি টিপু সুলতানের আমলের গাছ তারা—অনেক সাধ করে সে সময়ের কোনও রাজা-উজীর সুলতানকে খুশি করার জন্য গোলাপখাস গাছের চারা এনে লাগিয়েছিলেন।

পুজোর পর পর যখন কার্তিক মাস পার হয়ে অঘ্রান মাসের দিকে হাঁটত বছর, আমগাছের ডালের শুকনো পাতা ঝরতে ঝরতে পাঁচিলের গায়ের শান্ত পুকুরটার ওপর কেমন একটা গালচে পেতে দিত। আবার ফাল্গুন পার হয়ে চৈত্রমাসের দিকে পা ফেললেই গাছগুলো ভরে যেত নতুন নতুন ছোট্ট ছোট্ট সবুজ পাতায়, বৈশাখ মাসের বাতাস বয়ে আনত পুকুরের ঠান্ডা জলের ছোঁয়া আর সদ্য ফোটা আমের মুকুলের গন্ধ নিয়ে। তারপর কাঁচা আমে ভরে যেত গাছ। আর আমাদের পাড়ার ছেলেরা পাঁচিল বেয়ে উঠত আম পাড়তে—আম পাড়তে, নামী সেই ছুতো করে পাঁচিলের ওপারে একঝলক উঁকি মারতে—জানি না।

কারণ ওই পাঁচিলটার ওপারেই ছিল রহস্যের এক অপার জগৎ। সিনেমার তারকারা তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেবল কতগুলো ঝকঝকে নাম, পর্দার সাদা কালো মুখ আর উল্টোরথের পাতার বেগুনি রঙের আবছা ছবি—টেলিভিশনের বাক্স ভরে বাড়িতে তাদের নিত্য আসা যাওয়ার সময় সেটা নয়।

ফলে স্টুডিও'র ওই পাঁচিলের ওপারে, আম কুড়োনোর ফাঁকে হঠাৎ বুঝি ধরা দিত কোনও একটা প্যানকেক মুখ, বেশিরভাগ সময় 'ওই দ্যাখ' 'ওই দ্যাখ'-এর ফিসফিসে রোমাঞ্চর ফাঁকে কে যে সেই রুপোলি তারা—সেটা ভাল করে ঠাহর করার আগেই জঙ্গলে হঠাৎ দেখা হরিণের মতোই কোনও একটা পুরনো বাড়ির আড়ালে মিলিয়ে যেত সেই মায়াবী মানুষগুলো।

সেই পাঁচিল ঘেরা স্টুডিওতে, সেই গোলাপখাস আমবাগানের ছায়ায়, সেই পুরনো টিপু সুলতান আমলের বাড়িটায় একটি ঘরে একজন ফরসা পোশাক পরা, ফরসা মানুষ ছিলেন। তাঁর মুখে রং ছিল না, রঙের জৌলুস ছিল, তিনি কখনও আমপাড়া ছেলেদের দেখে ত্রস্ত পায়ে মিলিয়ে যাননি আড়ালে। শান্ত গলায় শাসন করতেন মাঝে মাঝে—নামো, ওখানে উঠেছ কেন? পড়ে যাবে।

তাঁর ভঙ্গিতে কোনও অধৈর্য নেই। তাঁর কণ্ঠস্বরে কোনও উত্তেজনা নেই। কোনওদিন তাঁর শুভ্রবসনে ধুলো লাগেনি। কোনওদিন তাঁর পিচ্ছিল গৌর ত্বকে কোনও মাছি বসেনি।

স্বয়ংবর সভায় দময়ন্তী যেমন করে চিনে নিয়েছিল নলরূপী দেবতাদের দিব্যচিহ্ন, ঠিক তেমন করেই যেন সেই ডানপিটে পাড়ার ছেলেরা ধরে নিয়েছিল ইনিই সেই পাঁচিল ঘেরা সবুজদ্বীপের রাজা।

আরও কয়েকবছর পরে তাঁর নাম জেনেছি। তপন সিংহ।

AMARBOI.COM

দুই

আমাদের পাড়ার মোড়ের বাড়িটায় ভাড়া থাকতেন সুনীতিদাদু। শিল্প নির্দেশক সুনীতি মিত্র। তখনও শিল্প নির্দেশনা কাকে বলে বোঝবার বয়স বা বুদ্ধি কোনওটাই আমাদের হয়নি। গোদা করে বুঝতাম যে, সুনীতিদাদু সিনেমায় কাজ করেন। আর সুনীতিদাদুকে খুব করে ধরলে স্টুডিও'র ভেতরে ঢোকা যায়। গেটে বসে থাকা দারোয়ান আর হাঁক পেড়ে ভাগিয়ে দিতে পারে না। কে জানে, ওই বয়সে তাই জন্য সুনীতিদাদুকে ঈশ্বরের মতো শক্তিশালী মনে হত।

সুনীতি মিত্র বহুদিন অবধি তপন সিংহর ছবির শিল্প নির্দেশনা করেছেন। ফলে কেবল দু'নম্বর স্টুডিও'র (কালক্রমে স্টুডিও'র নামটা ছোট হতে হতে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি মহলে কেবল দু-নম্বর বলেই এসে দাঁড়িয়েছে) ভেতরে সেট নির্মাণ ছাড়াও ছোটখাটো আউটডোর লোকেশনের জন্য সুনীতিদাদুর স্বাভাবিক ভাঁড়ার ছিল আমাদের ছোট্ট পাড়াটা। পাড়ার দোতলা, তিনতলা মধ্যবিত্ত বাড়ি, বাড়ির সামনের রোয়াক, বড় লোহার গেট—আর সব থেকে বেশি করে বোধহয় আমাদের পাড়ার গাড়িঘোড়াবিহীন নিরুপদ্রব নিরিবিলি—সব মিলিয়ে প্রায় যেন কোনও ফিল্ম সিটি'র তৈরি করে দেওয়া মধ্যবিত্ত পাড়া, সারাদিন শুটিং করলেও কেউ তেমন ভিড় করবে না, কেউ তেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপত্তি করবে না। কেবল ইস্কুল ফেরত বাচ্চার হাত ধরা মা হঠাৎ তাঁর বাড়ির সামনে রাংতার রিফ্লেক্টর দেখে হয়তো একটু ভুরু কুঁচকোবেন, তারপর হাঁটার গতি পাল্টে দ্রুতপায়ে ঢুকে যাবেন বাড়িতে, হয়তো কোনও ফেরিওয়ালা সুর করে হাঁক দিতে দিতে গলির মোড়ে জটলা দেখে থমকে দাঁড়াবে ব্যস এইটুকুই।

আমাদের পাড়ার গলির মধ্যেই 'আপনজন'-এর সময় তাড়া খেয়ে দৌড়েছেন শমিত ভঞ্জ, স্বরূপ দত্ত। রিকশা করে এসেছেন 'হারমোনিয়াম'-এর আরতি ভট্টাচার্য এবং ছায়া দেবী, আমাদের উল্টোদিকের বাড়িতে 'আঁধার পেরিয়ে'র সময় ট্যাক্সি করে এসে নেমেছেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। আমাদের পাড়া নিয়ে যদি কখনও কোনও বই লেখা হয় এই ঘটনাগুলো নিশ্চয়ই একটা আলাদা পরিচ্ছদ জুড়ে থাকবে। কারণ, ষাট-সত্তরের দশকে আমাদের সাধারণ, মধ্যবিত্ত পাড়ার রোজকার আটপৌরে জীবনে প্রথম গ্ল্যামারের গয়না পরিয়েছেন তপন সিংহ। এখন যাঁকে আমি অনেক শ্রদ্ধায় তপনদা বলি। আর মাঝে মাঝে ডিভিডি'তে তাঁর পুরনো ছবি দেখতে দেখতে ঠোঁটের ফাঁকে অজান্তে একটা হাসি এসে দাঁড়ায়—পাত্র পাত্রীর পেছনে কতগুলো চেনা রেলিং, চেনা ল্যাম্পপোস্ট দেখতে পেয়ে।

AMARBOI.COM

তিন

এবছর, দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পেয়েছেন তপনদা।
আনন্দের খবর নিঃসন্দেহে। ঠিক যেমন সৌমিত্রদার শ্রেষ্ঠ অভিনেতার জাতীয় পুরস্কার।
বড় দেরি হয়ে গেল—অভিযোগ করছিলেন সবাই।
রুমাদি'র (গুহঠাকুরতা) গাওয়া গানটা মনে পড়ছে—চিনিতে পারিনি বঁধু, তোমারই এ আঙিনা
তাই দেরি হল যে, দেরি হল যে তোমার কাছে
আসিতে
সত্যিই হয়তো কয়েক বছরের জন্য পথ ভুল করেছিল জাতীয় পুরস্কার।
আনন্দের কথা এই যে, শেষ পর্যন্ত পথ খুঁজে পেয়ে গেছে ঠিক।

তপনদা অসুস্থ। বাড়িতে বিছানাবন্দি—এমনটাই শুনেছিলাম শেষ।
তাঁর শান্ত নিরাময় কামনা করি।

সামনে পুজো এসে গেল, আর কিছুদিন পর দু-নম্বরের আমগাছে পাতা ঝরতে শুরু করবে, তারপর আরও কিছুদিন কেটে গেলে, সবুজ পাতায়, নতুন মুকুলে ভরে যাবে গাছ। ট্র্যাফিকে যানজটে, গাড়ির ধোঁয়ায় প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড-এর বাতাস এখন ভারি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঋতুবদলের খবর সে কি পারবে অমন চট করে নিয়ে যেতে?

পৌঁছে দিতে নিউ আলিপুরের সেই বাড়িটার দোতলায়।

সেখানে ক্লান্ত শরীরে, শ্রান্ত দেহে বিশ্রাম করছেন আমার ছোটবেলার সেই গৌরবর্ণ সবুজ দ্বীপের রাজা।

তপন সিংহকে বাংলা সিনেমা রাজসিংহাসন দেয়নি।

বোধকরি, তাঁর ছবি জনপ্রিয় হত বলে, কারণ অতিশিক্ষিত বাঙালি ভাবতে ভালবাসেন যে জনপ্রিয়তা আসলে শিল্পের শত্রু। জনপ্রিয়তাকে পরিহার করে যে শিল্পী কাজ করতে পারেন, তিনিই খাঁটি শিল্পী। তারপর তাঁকে জনপ্রিয় করার ভার সেই অতিশিক্ষিতদের। তপনদার ছবি কখনও কারুর প্রচার দাক্ষিণ্যের তোয়াক্কা করেনি।

তাই বুঝি বাঙালি সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণালের ত্রিকোণ পার্কের মধ্যে প্রবেশাধিকার দেয়নি তপনদাকে।

দাদাসাহেব ফালকেও খুঁজে পাননি নিউ আলিপুরের বাড়ি।

কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই জানো তপনদা, এই বিশাল বাংলার অগণিত দর্শক তোমাকে সত্যিই 'রাজা' বলে জানে। ভালবাসে চিরকালের 'আপনজন' বলে।

ভাল থেকো তুমি। আনন্দে, শান্তিতে, তোমার উজ্জ্বল গৌরব নিয়ে গরীয়ান হয়ে থেকো,

আমার ছোটবেলার গল্প বলার সবুজ দ্বীপের রাজা!

৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৮

AMARBOI.COM

রেডিও'র ভেতর থেকে কাদের গলা আসে, ঠাকুমা? ওরা কি রেডিও'র ভেতর থাকে?

আমার আর ঠাকুমার, দু'জনেরই দাঁত পড়ার বয়স। ফোকলা দাঁতে ঠাকুমা হাসল।

—বড় হও, বুঝবা।

এ কেমন এড়িয়ে যাওয়া উত্তর হল? আমি যে ভেবেছিলাম আমাদের খাবার ঘরের লাগোয়া করিডরে লেসের কভার ঢাকা রেডিওটার ভেতরে অনেক মানুষ থাকে, ছোট ছোট—লিলিপুটদের মতো।

তাদেরই গলায় খবর শুনি, নাটক শুনি আর গান যখন হয়, তখন আরও অনেকে পাশে বসে বাজনা বাজায়।

একদিন ইঁদুরে কেটে দিল রেডিও'র পেছনটা। রেডিও বিকল।

আর আমার মনে মনে ইঁদুরটা প্রায় রুদ্রপ্রয়াগের চিতার মতোই ভয়ঙ্কর নরখাদক -- রেডিও'র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেতরে ছোট্ট মানুষগুলোকে নিশ্চয়ই খেয়ে ফেলেছে, তাই রেডিও আর চলছে না।

ক্রমে ঠাকুমার দাঁত আরও পড়ল আর আমার পড়া দাঁতগুলো গজাল।

রেডিও'র ভেতরের রহস্য তখনও আমার কাছে সরল নয়, কিন্তু ওর ভেতরের মানুষগুলোকে আমি আমার প্রত্যেকটা পড়ে যাওয়া দাঁতের মতোই ইঁদুরের গর্ত খুঁজে খুঁজে তাদের অবশ্যম্ভাবী বিনাশের ভবিতব্যে ঠেলে দিয়েছি। কেবল একটিই গলা বেঁচে রইল তাদের মধ্যে।

সেই অভ্রান্ত সুরেলা জাদুকণ্ঠ।

রেডিও ছেড়ে সে কেমন এক মায়াবী পথে এখন নতুন কেনা ট্রানজিসটর-টার মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

গলার মানুষটির নামটা বড় সাদামাটা—লতা।

মা, পিসিমণির সম্বোধনে 'লতা মঙ্গেশকর' লতাই ছিলেন, যেন রোজকার চেনা পাশের বাড়ির মেয়েটি। সন্ধ্যা মুখার্জী, মান্না দে, শ্যামল মিত্র'র পাশাপাশি দু'জন মানুষ কেবলমাত্র নামটুকু হয়েই বেঁচে রইলেন—হেমন্ত আর লতা।

ছোটবেলার 'সুভাষচন্দ্র' দেখতে গিয়ে বাড়ি ফিরলাম একটাই দৃশ্য সম্বল করে। বালক সুভাষচন্দ্র পথের ধারের ভিখারির গলায় 'একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি' শুনছে।

পরে জেনেছি, আসলে সে-ও আমার মতো লতা মঙ্গেশকরের গানই শুনছিল। কিন্তু ওই গ্রামের পথে, খোলা আকাশের নীচে, গ্রামবাংলার যন্ত্রানুষঙ্গে, লতা মঙ্গেশকরের সুরেলা আর্তি একজন অকাল শহিদের অন্তিম বিলাপকে আমার সেদিনের মনের মধ্যে এমন করে বসে গিয়েছিল যে, বাকি ছবিটা জুড়ে নেতাজির নানারকম বীরকীর্তি—সব যেন কেমন, পানসে হয়ে গেল। আজও আমার কাছে 'সুভাষচন্দ্র' ছবিটার প্রধান এবং প্রবল পরিচয় ওই একটাই গান।

এবং আমার ধারণা অনেক বাঙালি দর্শকই এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে একমত হবেন।

পরে শুনেছি, কোনও এক বিশেষ দেশাত্মবোধক অনুষ্ঠানে লতা মঙ্গেশকরের গলায় 'মেরে বতন কে লোগো' শুনে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কেঁদেছিলেন।

ঘটনাটা শোনামাত্রই আমার মনে পড়ে গিয়েছিল 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।' প্রধানমন্ত্রী নেহরু, সিনেমার বালক সুভাষচন্দ্র আর আমি কোথায় যেন একটাই মানুষ হয়ে গিয়েছিলাম।

এখন ভাবলে মনে হয়, কিছুটা হয়তো বুঝতেও পারি যে নেহেরু উত্তর ভারতবর্ষে, এক নতুন ভারতপ্রতিমা নির্মাণে ইন্দিরা গান্ধী, 'মাদার ইন্ডিয়া'র নার্গিস-এর পাশাপাশি, লতা মঙ্গেশকরের ভূমিকা বোধকরি কিছু কম নয়।

দুই

'আইকন' শব্দটা আজকাল বড্ড দায়সারাভাবে ব্যবহৃত হয় দেখি। ঠিক যেমন Breaking News শব্দটার গুরুত্বটাও অমুক-তুমুকের হাঁচি-কাশির খবর দিয়ে দিয়ে আটপৌরে হয়ে গিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আইকন' শব্দটার মহার্ঘতা একটা সংস্কৃতির বিরাট সময়খণ্ড জুড়ে কেবল দু-একজন বিশিষ্ট মানুষ সম্পর্কেই ব্যবহৃত হতে পারে।

লতা মঙ্গেশকর অবশ্যই সেই দু-একজনের অন্যতম একজন।

'তিলোত্তমা' যদি হয় রমণীর পুঞ্জীভূত লাবণ্যোৎকর্ষ, লতা মঙ্গেশকর শব্দটি তা হলে নিঃসন্দেহে ভারতীয় নারীর স্বরোৎকর্ষের প্রতীক।

প্রাক্-নারীবাদী যুগে, ভারতীয় সিনেমায় চিরন্তন ভারতীয় নারী কেবল অবিমিশ্র পবিত্রতা, বিশুদ্ধ প্রেম, অবিচল পতিনিষ্ঠা, চরম দুঃসহ ত্যাগ ও অসংশয়ী ঈশ্বরভক্তি দিয়ে চিহ্নিত হয়ে এসেছেন মহারাষ্ট্রের এই লোকোত্তর শিল্পীর গলা ব্যবহার করে।

বৈজয়ন্তীমালা, মীনাকুমারী থেকে শুরু করে শর্মিলা, রাখী, হেমা মালিনী কারুর কণ্ঠস্বর আলাদা করে আমাদের অনেকেরই মনে নেই—আমরা তাঁদের গলার আওয়াজকে মনে রেখেছি লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠস্বর দিয়ে।

এর পেছনে অনেকটা ভূমিকা ছিল এই কিন্নরীকণ্ঠী 'আইকন'-এর, ভারতের নারীত্বের লাবণ্যকে যিনি কেবল তাঁর কণ্ঠস্বর দিয়ে রূপায়িত করে ফেলেছেন। লতা মঙ্গেশকর বললে একটাই ছবি মনে আসে—মাইকের সামনে শ্বেতবসনা, দুই বেণী করা, গায়ে আঁচলচাপা দেওয়া একজন সাধারণ দর্শনী মহিলা।

তাঁর সহস্রাধিক গানের ভুবন জুড়ে যেখানে প্রতিভাত হয়েছে নারীর নানা বিভঙ্গ, তাঁর নিজের ছবিটি এই বিশাল গানের জগৎ জুড়ে স্থির, অবিচল।

AMARBOI.COM

ফলে ক্রমশ এই ছবির চিত্রটি ফ্যাকাশে হতে হতে প্রায় প্রেক্ষাপটের ভূমিকা নিয়েছে, যার সামনে বিচিত্র বেশভূষণ নিত্যনবভঙ্গিতে নারীত্বকে নানাভাবে বিভূষিত করেছেন নানা নায়িকা। লতা মঙ্গেশকর অপূর্ব সুন্দরী বা নিদারুণ স্টেজ পারফরমার হলে এমনটি হত কি না সন্দেহ।

নেপথ্যকণ্ঠের অমন দুর্লভ সার্থক উদাহরণ বোধকরি একমাত্র এই গায়িকা।

তিন

লতা মঙ্গেশকরের প্রথম বাস ছিল আমার রেডিও'র মধ্যে।

ধীরে ধীরে তিনি এসে আস্তানা গাড়লেন আমাদের ট্রানজিসটরে। তারপর রেকর্ড প্লেয়ারের তলার বাক্সটায় রাখা কালো কালো চাকতিগুলোতে।

পুজো আসছে। শৈশবের অনেক স্মৃতি মাথায় করে।

পাড়ার পুজোয় মাইকে গান বাজানোর দায়িত্বটাই তখন যেন এক বিরাট শৈল্পিক অধিকার। অন্যমনস্কতার ছুতো করে লতা মঙ্গেশকরের একই গান পরপর বাজিয়ে ফেলেছি, আবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোনবার লোভে এমন বেশ কয়েকটি শারদীয়া চোট্টামি এখনও বেশ মনে আছে।

এই যে সেদিন কোন চ্যানেল-এ ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে বললাম—

পুজোর আনন্দ ছোটবেলাতে অন্যরকম ছিল।

তখন আকাশে আরও নীল ছিল, রোদে আরও সোনা ছিল।

ঠাকুমার দুধসাদা কাপড়ে ছিল কাশফুলের নরম। আর মা'র নতুন শাড়িগুলো ক'দিনের মধ্যেই যেন মা'র গন্ধটা পেয়ে যেত।

যেটা বলা হয়নি সেটা এখন বলছি, আমার ছোটবেলায় প্রতি পুজোয় নতুন করে পুজোর গান গাইতেন লতা মঙ্গেশকর।

সেদিনের সেই শরতের আকাশে, ধূপধুনোর গন্ধে, ঢাকের আওয়াজের সঙ্গে মিশে থাকত এক মারাঠি মহিলার গলা, যাঁকে ছাড়া বাংলার পুজো আজ কেমন যেন পানসে হয়ে গিয়েছে।

২৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৮

কলেজ জীবনে বসে ষাটের কলকাতার কফি হাউসের শীলিত কৌতুকাড্ডার অনেক টুকরো টুকরো মণিমাণিক্য অজান্তে কুড়িয়েছি, প্রায় কলকাতার এক হীরকমণ্ডিত সময়ের প্রতি আগ্রহবশত—কিংবা হয়তো অনেক সময় একটা স্বাভাবিক সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সূত্রে।

আজকের সত্যজিৎ জন্মবার্ষিকী সংখ্যা নামকরণ করতে গিয়ে কেন যেন সেই নামটাই মনে এল।

সত্যজিৎকে 'ড্যাঙা' বলে ডাকাটা প্রায় যেন কালজয়ী ভাবে বিখ্যাত করেছিলেন ঋত্বিক ঘটক। এই ঠাট্টার মধ্যে যে কী পরিমাণ অনুরাগ ছিল, সেটা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি ঋত্বিকের নিজের শারীরিক দৈর্ঘ্যর দিকে একনজর তাকালেই।

সুদীর্ঘ সেই মানুষটা যখন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর উচ্চতা দিয়েই কেবলমাত্র তাঁকে সম্ভাষণ করেন, অন্য গুণগুলোকে সযত্নে সংগোপনে আড়াল ক'রে—যে বৈশিষ্ট্য তাঁকে নিজেকে বর্ণনা করার জন্যই অতটাই অমোঘভাবে নির্ভুল, তখন সত্যিই মনে হয় কী নিষ্কলুষ অনাবিল সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে কাজ করে চলেছেন এই মানুষগুলো।

বুঝি সেই মানুষটার পক্ষেই এত অবলীলায় বানানো সম্ভব একটা 'অযান্ত্রিক'। একটা 'সুবর্ণরেখা'।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা সুবিধে ছিল। তাঁর নামটাকে ছোটবড় ভাঙচুর কোনও কিছু করেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অকাব্যিক করা মুশকিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কথাটা বলতে যদি না-ও বা চাই, শুধু 'রবীন্দ্রনাথ' শব্দটার মধ্যেই কতটা নির্ভার ওজন আছে—সেটা বাক্যবন্ধর গুণ না ইতিহাসের কারসাজি, এখন বলা মুশকিল। কিন্তু অপভ্রংশের নামগুলো যেমন 'রবি ঠাকুর', 'গুরুদেব' এমনকী 'কবিগুরু'—প্রকাশ্যের বা আড়ালের সম্ভাষণের এই বিবিধ নামাবলি কেমন যেন একটা মানুষেরই নানা ডাকনাম, যারা স্বচ্ছন্দে, অতি অনায়াসে লুকিয়ে থাকে তাঁর আগুস্ফলম্বিত জোব্বার পকেটে। আর প্রয়োজন মতো ফুটে বেরিয়ে আসে সব সৌন্দর্য আর সৌরভ নিয়ে—বর্ষার যূথীমালিকা বা বসন্তসমাগমের পলাশের মতো।

কলকাতার শেষ রেনেসাঁ-পুরুষ সত্যজিৎ-ও কেবল স্বাভাবিক গুণেই অনেকগুলো নাম পেয়েছিলেন। গোটা টালিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রি তাঁকে ডাকত 'মানিকদা' বলে। যতদূর জানি, সেটাই তাঁর ডাকনাম।

তাঁর হীরকখচিত প্রতিভা কখন যে তাঁর ডাকনামটাকেই তাঁর যথার্থ সংক্ষিপ্ত পরিচয় করে দিয়েছিল গোটা ইন্ডাস্ট্রির কাছে, তার সচেতন ইতিহাস আমার অজানা।

এখন, ভাবলে মনে হয় ভাগ্যিস সত্যজিৎ রায়ের অমন সাধারণ অথচ তাৎপর্যপূর্ণ একটা ডাকনাম ছিল—নইলে কেমন করে ওই দীর্ঘায়তন, গম্ভীরকণ্ঠ, মিতবাক মানুষটির সঙ্গে ভাব জমাত টালিগঞ্জ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি? তার সঙ্গে কিছু বেনোজলও ঢুকেছিল—অনেককেই শুনি সত্যজিৎ প্রসঙ্গ এলেই 'মানিকদা' বলে সম্বোধন করতে, পরে জেনেছি, ডাকনামে ডাকার অন্তরঙ্গতা তো বাদই দিলাম, এঁদের সঙ্গে সত্যজিতের প্রায় চাক্ষুষ পরিচয়ও ছিল না। এটা ওই চলমান অশরীরী 'অরণ্যদেব'কে 'বেতাল' করে জনপ্রিয় করে নেওয়াই অনেকটা।

টালিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রি সত্যজিতের আড্ডাঘর নয়। তিনি স্টুডিওতে যেতেন কাজ করতে, কাজ করে ফিরে আসতেন বাড়ি। সত্যজিতের আড্ডাচক্র প্রধানত তাঁর নিজের বাড়ির বৈঠকখানায়। আর কিছুটা হয়তো যৌবনারম্ভের কফি হাউসে, সিগনেট প্রেস-এর জমায়েতে... ইত্যাদিতে।

সেখান থেকেই শুনেছিলাম, তাঁর এই অদ্ভুত নামকরণ, ওরিয়েন্ট লংম্যান পাবলিকেশনটির সঙ্গে হয়তো বা তখন প্রথম পরিচিত হচ্ছেন কলকাতার মানুষ।

'দ্য টল ম্যান ফ্রম দি ইস্ট' বা 'প্রাচ্যের সেই দীর্ঘ মানুষটি' যিনি তাঁর সমস্ত পাশ্চাত্যতা দিয়ে ততদিনে বাংলার মুখ হয়ে গেছেন পৃথিবীর দরবারে—তাঁকে বন্ধুবান্ধবরা সকৌতুকে নাম দিলেন 'ওরিয়েন্ট লংম্যান'।

শুনে খুব মজা পেয়েছিলাম।

এর পরেই আরেকটি নামকরণ হয়েছিল সত্যজিতের। একই কৌতুকগোষ্ঠী থেকেই বোধকরি। 'ইস্টার্ন বাইপাস' সেটা তাঁর বাইপাস সার্জারি আর ই এম বাইপাস নির্মাণের সন্ধিক্ষণে।

কৌতুকের একটা সর্বনাশা আগ্রাসী আনন্দ আছে। সে জরা, ব্যাধি, মৃত্যুকেও তোয়াক্কা করে না। জানি না, জীবদ্দশায় সত্যজিৎ এই নামকরণটি শুনে গেছেন কি না, হয়তো বা গ্রহণও করেছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর স্বভাবোচিত উচ্চকিত কৌতুকহাস্যে, কিন্তু আমার কোথায় যেন একটু খারাপ লেগেছিল।

বিশেষ করে যখন শালপ্রাংশু, সুঠামদেহী সেই মানুষটির প্রতিকৃতিতে শিরাকুঞ্চনের মালিন্য ধীরে ধীরে প্রকট হয়ে উঠছে তাঁর প্রতিটি জন্মদিন-আলেখ্যে। কেমন করে যেন ভেতর থেকে মনে হত, এই নামটা, ঠাট্টা করে হলেও—না দিলেই হয়তো।

কে জানে হয়তো জড়-সংস্কার কিন্তু সেই সংস্কারই তো প্রতিমা বানায়। মূর্তি নির্মাণ করে।

সংযোজন : আমাদের সাম্প্রতিক সংখ্যা 'উনিশে এপ্রিল'-এর ফার্স্ট পার্সন-এ একটা তথ্যভ্রান্তি আছে। ইতিমধ্যেই কয়েকজন দায়িত্ববান পাঠক সেদিকে নজর আকর্ষণ করা চিঠি পাঠিয়েছেন।

সত্যজিৎ চলে গেছেন ১৯৯২ সালে। আমি লিখেছিলাম ১৯৯১। ভুল লিখেছি, স্বীকার করছি। তবে সত্যজিৎ কবে চলে গেলেন আমাদের ছেড়ে সেটা মনে রাখার দায়িত্ব আমি ইতিহাসের হাতে ছেড়ে দিলাম। আমার মন না হয় সে দায়িত্ব না-ই বা নিল।

সেটা তো আজীবনের জন্য ওরিয়েন্ট লংম্যান-এর অন্নদাবতী।

৩ মে, ২০০৯

AMARBOI.COM

জুলাই মাসের শেষাশেষি এসে পৌঁছলে সম্পাদকীয় লিখতে হলেই কেমন যেন একটা বিষয় নিয়ে লিখতে হাত নিশপিশ করে। 'আনন্দলোক'-এ থাকাকালীন ছ'বছরের অভ্যেস। জুলাই-অন্তে উত্তমকুমার। আমরা জানতাম ওই সংখ্যার কোনও মার নেই।

আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আমি একটা অভিনয়ের কাজ করছি—আপনারা হয়তো এতদিনে জেনে গিয়েছেন। নানা কাজের ফাঁকে অভিনয়ের কাজটার জন্য নিজেকে তৈরি করার কয়েক ধরনের চেষ্টাচরিত্র করছিলাম।

আমার তো অভিনেতা হিসেবে কোনও ট্রেনিং নেই। আর তা ছাড়া পঁয়তাল্লিশ পার করে এসে নতুন করে অভিনয়ের মতো একটা শিল্পমাধ্যমে প্রবেশ করাটা যে এত দুঃসাধ্য, জানলে হয়তো রাজিই হতাম না পার্ট করতে। দু-একদিন মেকআপ টেস্ট এবং রিহার্সাল গোছের কিছু একটা করতে গিয়ে হাড়ে হাড়ে টের পেলাম যে—পেশি, স্নায়ু, শারীরিক ক্ষমতা বা উদ্দীপনার এই ভাঁটার বেলায় নতুন করে সমুদ্রে সাঁতার কাটার ইচ্ছেটা প্রায় যেন প্রহসন।

অনেক শিবের গীত হল। ধান ভাঙাতে আসি। কী বলছিলাম যেন—উত্তমকুমার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওই যে বললাম অভিনয় শেখার কাজ—আপাতত তো সম্বল আমার ডিভিডি লাইব্রেরি। ছবিতে আবার আমার দু'টো চরিত্র। একজন পরিচালক, আরেকজন পঞ্চাশ দশকের যাত্রাভিনেতা।

পরিচালক আমার প্রায় সমসাময়িক, তাকে আয়ত্ত করাটা ততটা ঝকমারি নয়।

কিন্তু পঞ্চাশ দশকের বাংলা মঞ্চের একজন অভিনেতার চরিত্রটা বেশ ভাবাল। কেবল তো মঞ্চে অভিনয় করার দৃশ্য নয়—তাঁর ব্যক্তিজীবনও আছে। সেই সময়কার জীবনের একটা গতি, ছন্দ এবং তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তখনকার মানুষের চালচলন, কথা বলার ধরন, ওঠা-বসা, মাটিতে বসে ভাত খাওয়া—সেগুলোকে এমনভাবে রপ্ত করতে হবে, যাতে মনে হয় আমি সেই সময়কারই মানুষ—কাজটা বড় সহজ নয়।

অতএব আমার ডিভিডি লাইব্রেরির বাংলা বিভাগের পঞ্চাশ-ষাট দশকের ছবিগুলোয় হাত পড়ল।

সত্যজিৎ, মৃণাল, ঋত্বিক, তপন সিংহ, তরুণ মজুমদার তো বারবার দেখা। অজয় কর, অসিত সেন, অগ্রদূত—এইসব পরিচালকের কাজ আবার নতুন করে দেখতে দেখতে মনে হল, এ যেন একটা গয়নার ভল্ট, যার সামনে অবহেলায় পড়ে রয়েছে কত দুর্মূল্য অভিনয়ের হিরে-মানিক।

পুরু মেক আপ, চোখে কাজল, ঠোঁটে রং—নারীপুরুষ নির্বিশেষে, কিন্তু অভিব্যক্তির যে সততা, তার সামনে রং মাখবার সব মেকি মুছে যায় নিমেষে।

উত্তমকুমারকে এঁদের মধ্যেও সময় সময় বিশিষ্ট লাগে আরও কতগুলো অন্য কারণে।

স্টারদের চরিত্র হতে নেই, স্টার থাকতেই হয়—ফলে উত্তমকুমার অভিনীত বহু চরিত্রকে বাধ্য হয়ে উত্তমকুমারীয় কিছু ম্যানারিজম-এর কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে হয়েছে।

কিন্তু তার পরেও একটা মানুষ, যিনি জানেন তাঁকে একটা বিশেষ সংলাপ প্রায় অস্বাভাবিক নাটকীয় ভাবে ঘাড় বেঁকিয়ে বলতে হবে, কারণ তিনি নায়ক—সেই আপাদমস্তক অবাস্তবতার মধ্যেও কী করে, কোন জাদুবলে, খাঁটি অভিনয়ের সত্তাকে ছুঁয়ে গেলেন উত্তমকুমার—সেটা বুঝতে পারলাম না। আর পারলাম না বলেই তিনি আজও 'মহানায়ক'।

শৌমিক, আমাদের ছবির চিত্রগ্রাহক, আমার সঙ্গে ছিল। সমানে আমাকে দেখিয়ে গেল যে সঠিক আলোটা নিতে একবারের জন্যও ভুল করেননি উত্তমবাবু—কিন্তু কোথাও সে প্রচেষ্টাটা আমরা দেখতে পাই না। সিনেমা অভিনয় মঞ্চাভিনয় নয়। সেখানে আলো, ক্যামেরা, ক্যামেরার নড়াচড়া—সবকিছুকে সঙ্গে নিয়েই অভিনয় করতে হয়। কিন্তু মহা-অভিনেতা বুঝি তিনিই, যিনি দর্শকদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করেন যে, তিনি নড়লেন বলেই ক্যামেরা নড়ল—উল্টোটা নয়।

প্রথমবার লস এঞ্জেলস-এ গিয়ে দেখেছিলাম জন ওয়েন-এর নামে একটা এয়ারপোর্ট আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনছি টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনের নাম নাকি উত্তমকুমারের নামে হবে। মৃত্যুর প্রায় ত্রিশ বছর পরে এ সম্মানও কি তাঁর প্রতিভার প্রতি যথার্থ অর্ঘ্য?

২ আগস্ট, ২০০৯

লম্বা, কালো, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা যে চেহারাটা বালিগঞ্জ প্লেস-এর সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুলের লম্বা করিডরটায় বেত হাতে দাঁড়িয়ে থাকতেন; আর আমরা তখন ফাইভ-সিক্স-এ পড়ি, সেই বেত্রহস্ত 'ক্র্যাফ্‌ট স্যর'-এর ভয়ে নিশ্চুপে গুটিসুটি লাইন করে ক্লাসে ঢুকতাম, তাঁর কলমে যে একটা আশ্চর্য লাইন আছে 'আকাশ মুক্তাফলের ন্যায় নীলাভ' যদ্দুর মনে পড়ছে—সেটা ভাবিওনি কোনওদিন।

কমলকুমার মজুমদার নামটা আজও আমার মনে দু'টো সহযোগী শব্দ নিয়ে এসে পৌঁছয়—ক্র্যাফ্‌ট স্যার। তখনকার সাউথ পয়েন্ট স্কুলে প্রথাগত শিক্ষকতার বাইরে অনেক গুণীজন ছিলেন—উৎপল দত্ত, শেখর চট্টোপাধ্যায়কে আমি দেখিনি। উদয়শংকরকে দেখেছি নিতান্ত ভঙ্গুর দশায়। কিন্তু কমলকুমার মজুমদার অনেকটা সময়জুড়ে আমার স্কুলের ছাত্রজীবনে বিচরণ করেছেন আমার চেতনাপটে। কমলবাবুর তিনটে পরিচয় আমার মনে আছে।

এক, ক্র্যাফ্‌ট টিচার হিসেবে। কেনই বা আমাদের ক্র্যাফ্‌ট ক্লাসটা হত—কী যে শিখতাম আমরা, কিছু বলতে পারব না—কেবল এটুকু মনে আছে যে, প্লাসটাসিন দিয়ে কী সব ফুল পাতার নক্সা করতাম আমরা খাতায়। আর কমলবাবু নিজের টেবিলে বসে বই পড়তেন।

ক্রমশ ক্লাসটা হুল্লোড়ে পরিণত হত, ফিসফাস, গুজগুজ, চেঁচামেচি—এর প্লাসটাসিন আরেকজনের চুলে আটকানো হত। আর ক্রাফ্‌ট স্যার হঠাৎ বই থেকে চোখ তুলে টেবিলের ওপর বেতের বাড়ি মেরে সজোরে হুঙ্কার দিতেন,

—কী, হচ্ছেটা কী?

অন্য কমলবাবুকে আমি চিনেছি স্কুল লাইব্রেরিতে। অন্যান্য শিক্ষকের মতো কমলবাবুকে স্টাফ রুমে বসতে দেখিনি কখনও। বেশিরভাগ সময়টাই লাইব্রেরিতে বসে বই পড়তেন, এবং জানি কীভাবে আড়চোখে নজর রাখতেন ছাত্র ছাত্রীরা কে কী বই পড়তে নিচ্ছে। আমার যেহেতু বরাবরই খেলাধুলোয় ইচ্ছে বা আগ্রহ নেই, বই পড়াটা একটা বিরাট নেশা ছিল। এবং একদিন দেখলাম ক্রাফ্‌ট স্যর নিজে এসে একটা বই দিয়ে বললেন,

—এইটা পড়েছিস?

ঘাড় নাড়লাম—না।

বললেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—নিয়ে যা বাড়ি। ভাল না-লাগলেও পড়বি, মাঝপথে ছেড়ে দিবি না। বইটার নাম আমার আজও মনে আছে। কারণ ওই নামটার সঙ্গে সেদিনই আমার প্রথম পরিচয়—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প।

দুই

আমাদের স্কুলে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী কোনও অনুষ্ঠান হত না নিয়মিত। কোনও এক বছরে এলাহি আয়োজন করে কলামন্দির ভাড়া করে চার-পাঁচদিন ব্যাপী একটা অনুষ্ঠানে সব ক্লাসের জমে থাকা প্রাইজগুলো দেওয়া হত।

আর তার সঙ্গে হত নানারকম অনুষ্ঠান।

নানা ক্লাসরুম, কমনরুমে, প্রেয়ার হলে রিহার্সাল চলছে।

ইন্দ্রনাথ গুহ পরিচালনা করছেন—'ম্যাকবেথ'। সলিল ভট্টাচার্য (আমাদের ছবি আঁকা শেখাতেন) করাচ্ছেন 'রক্তকরবী'। আর কমলবাবু ক্ষীরোদপ্রসাদের—'আলিবাবা'—একদিন ক্লাস থেকে আমাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হল—ক্রাফ্‌ট স্যর ডেকেছেন। আমায় আবদাল্লা করতে হবে—বোধহয় আমার কালো রং আর কোঁচকা চুলের জন্য।

'আলিবাবা' হয়ে উঠল না সেবার। সহসা মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেল। আমরা 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' করলাম—কমলবাবু আগেও স্কুলের ছাত্রদের দিয়ে করিয়েছেন। এবার আমার ছোট পার্ট। কপিসেনাদের এক বাঁদর। লম্বা গ্যাসবেলুন দিয়ে ল্যাজ হল আমাদের।

আর আমার মনে আছে রামের কোমরে ছিল একটা কলার কাঁদির বেল্ট। হনুমান এসে প্রথম দৃশ্যে যেই খবরটা দেয়, রাম অমনি বেল্ট থেকে একটা কলা ছিঁড়ে উপহার দিল হনুমানকে। এই গভীর রসবোধ সেই বয়সেও আমাদের সবাইকে হাসাত।

মজার নাটক, হুল্লোড় হবারই কথা—তার মধ্যেও আমরা অকারণ গালগল্পে মশগুল হলেই ছিপটির আওয়াজটা পেতাম।

অমনি সব চুপ।

আজ সেই স্কুল জীবনের পর প্রথম পর্দাভিনয়ের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে, আছেন নিশ্চয়ই আশেপাশে কোথাও সেই কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকায় মানুষটি—খারাপ করলেই বজ্রকণ্ঠে ধমকে উঠবেন,

—কী, হচ্ছেটা কী?

২৩ আগস্ট, ২০০৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ আসা একপশলা বৃষ্টির মতো ধাঁ করে এসে উধাও হয়ে যাওয়ার নামই বুঝি দুর্গাপুজো। যে বৃষ্টিটার জন্য সারাবছর দুরুদুরু আনন্দতৃষ্ণায় অপেক্ষা করে থাকে বাঙালি মন।

বৃষ্টির পশলা মিলিয়ে যায়। মাটি জুড়ে রেখে যায় সদ্যভেজা সোঁদা গন্ধ।

দুগ্গাপুজোর পশলাও তেমন আসে একরাশ গন্ধ নিয়ে, আবার চলেও যায় নিয়ম করে।

শরতের রোদের কোনও গন্ধ আছে বুঝি? কে জানে, আমি তো পাই। বাড়ির লাগোয়া পুজো প্যান্ডেলের ত্রিপলের গন্ধ, বাঁশ আর রঙিন কুঁচির কাপড়ের নিজস্ব গন্ধ, তারপর ধুপধুনো, ফুল—নতুন শাড়ি। সকালবেলার সদ্য শ্যাম্পু করা একপিঠ চুল—সে সব গন্ধ তো আছেই।

আর আছে, থুড়ি, ছিল বলাই বোধহয় ভাল—পুজোর গানের গন্ধ শাখা রেকর্ড, ক্যাসেট, সিডি—তিনটে সংগীতচক্রই অবাধে রাজত্ব করেছে আমাদের গানের ভুবনে।

একেবারে ছোটবেলার কথা মনে করি। পাড়ার পুজোয় মাইকে গান চালানোর দায়িত্ব পেলে নিজেকে বন্ধুদের দলে কতকটা উচ্চপদস্থ ভাবতাম। এখন ভাবলে গানগুলো ঝাঁক বেঁধে আসে স্মৃতি ঝেঁপে, বছরগুলো গুলিয়ে যায়—কেবল শরতের রোদের গন্ধের সঙ্গে মিশে থাকে কতগুলো চেনা গলা। সেই গলাগুলোরও কেমন যেন একটা চেনা গন্ধ আছে। এতবছর পরে হয়তো বা দিল্লি রোডের কোনও ছোট চায়ের দোকানের ট্রানজিস্টরে হঠাৎ শুনতে পাওয়া দু'এক কলি সেই শারদপশলার সোঁদা গন্ধটাকেই মনে করিয়ে দেয়। সেই এক চেনা গন্ধের প্রথম মনে পড়া গান বোধহয় 'ললিতা, ওকে আজ চলে যেতে বলো না।'

কোন এক বন্ধুর হাই-পাওয়ার-চশমা দিদি শুনেছিলাম মুখ ভেটকে ছিল—ইস। একজন পুরুষমানুষের গলায় কেমন লাগে এরম একটা গান?

ছোটবেলায় বুঝিনি তার অভিযোগের সঙ্গতি। এখন ইঙ্গিতটা বুঝি, কিন্তু কেন যেন কোনও মতেই সেটা সংগীতটাকে টপকায় না।

সত্যি, রাধার গলার আকুতি মান্না দে'র গলায় যদি কারুর বেমানান লাগে, তা হলে কীর্তনের আখড়ায় গিয়ে পড়লে কী করবে বেচারা। তারপরের বছরগুলো মুঠো-মুঠো করে নিয়ে এল আরও একরাশ—

জড়োয়ার ঝুমকো থেকে, যদি কেউ আমাকে পাগল বলে, চাঁদ দেখতে গিয়ে আমি তোমায় দেখে ফেলেছি। কিশোর-রফি, লতা-আশা, সুচিত্রা-কণিকার মতো হেমন্ত-মান্না দলবাজিও যে ছিল না, তা নয়—কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারতাম যে'বাড়ির সদ্যযুবা দাদারা মান্না দে'র গানের মধ্যেই খুঁজে পাচ্ছে তাদের আবেগের রসদ।

হেমন্তকণ্ঠ যেন প্রাজ্ঞ এক প্রমিত ঋষিকণ্ঠ (হয়তো বা নিয়মিত রবীন্দ্রগান গাইবার জন্যও হবে)—সেখান থেকে এমন কোনও যৌবনোচিত চপলতা ঝরে পড়বে না, যা তাদের পুজোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক'দিনের একপিঠ শ্যাম্পুর গন্ধ হয়ে ভেতরে গুনগুন করবে। আমার জ্ঞানত মান্না দে'র অকুণ্ঠ ভক্ত ছিল পাড়ার বাচ্চুদা। পুজোর কয়েকদিনের মধ্যেই মান্না দে'র নতুন গানগুলোর রেকর্ডটা কেমন করে যেন পাড়ার মাইকের রেকর্ড প্লেয়ার থেকে ওর গলায় চালান হয়ে যেত।

ফলে পুজোর গন্ধটা ধীরে ধীরে যখন উবে আসত হেমন্তের বাতাসে, বছরশেষের অ্যানুয়াল পরীক্ষার ধুকপুকানির সঙ্গে মিশে যেত দূরের কোনও পাড়ার জগদ্ধাত্রী পুজোর ঢাক, তখন পাড়ার রকে বাচ্চুদাই মান্না দে'র দৃশ্যমান, স্পর্শমান সিডি। মান্না দে আমার কৈশোর,

মান্না দে আমার যৌবন।

মান্না দে আমার শরতসুবাসের নায়ক।

সেই মান্না দে আজ দাদাসাহেব ফালকেধন্য।

এ বছর পুজো বড্ড তাড়াতাড়ি—এমনটি শুনছিলাম চারদিকে।

আমার শরতের নায়কের পুজোটা কেমন যেন দেরি করেই এল।

১১ অক্টবর, ২০০৯

ক্লাস ফাইভ থেকে সিক্স-এ উঠলাম। অ্যানুয়াল রিপোর্টে দেখা গেল আমার ইংরেজি/ বাংলার নম্বর বেশ খারাপ।

অতএব যুগপৎ বকুনি এবং বাবা-মা'র দুশ্চিন্তা। একদিন বাবা-মা'র শোওয়ার ঘরের পর্দার আড়াল থেকে কানাঘুষো শুনলাম, আমার জন্য একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করা হচ্ছে।

ক্লাস ফাইভ বা সিক্স সত্যিই মাস্টার রেখে পড়ানোর বয়স নয় এবং বাবা যে কী ভেবে আমাকে 'মাস্টারমশাই' দিয়ে পড়ানোর কথা 'ঠিক করেছিলেন' আজও জানি না ভাল করে—তবে বাবা সেদিন যে-সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলেন তার মধ্যে হয়তো অনেকটাই সচেতন বা অবচেতন এক দূরদর্শিতা ছিল। সে গল্প পরে বলছি।

ভদ্রলোকের নাম সুধীর রায়চৌধুরী। ভারিক্কি চোহারা, মাথাভর্তি উজ্জ্বল টাক, মোটা পাওয়ার-এর চশমা। 'মাস্টারমশাই' বলতে আমাদের মনে শৈশব থেকে যে-ছবিটা মুদ্রিত হয়ে আছে তার থেকে আলাদা কিছু নয়। দেখেই মনে হল খুব কড়া ধাতের মানুষ। আসবেন, পড়াবেন, চলে যাবেন এবং ভুল করলে প্রবল শাস্তি দেবেন। এমনকী ওঁর খাদির পাজামা-পাঞ্জাবির ভিতরে কোনও অদৃশ্য বেত লুকিয়ে রাখলেও আশ্চর্য হওয়ার নয়।

দেখা গেল, ভদ্রলোক আদৌ সেরকম নন। খুব যে একটা হাসিখুশি, ভাব করার জন্য আগ্রহী—তা নয়। তবে তেমন গেরামভারি-ও নন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথমদিন এসে পড়ার ঘরে ঢোকার আগে বললেন,

—তোমাদের বাড়ির বুককেসগুলো একটু দেখব? তাঁকে ঘুরিয়ে বুককেসগুলো দেখানো হল। তার মধ্যে—যেমন সব বাঙালি বাড়িতে থাকত—একটা রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ। সেটা নেড়ে-চেড়ে বললেন,

—এটা পড়েছ?

আমি ভয়ে-ভয়ে ঘাড় নাড়লাম—না। এবার পড়ার ঘরের টেবিলে। নানা কথা। তার সহেগ স্কুলের হোমওয়ার্ক-এর কোনও সম্পর্ক নেই। কথায়-কথায় জানা গেল আমি রামায়ণ, মহাভারত ভালবাসি। সেদিন বাড়ি যাওয়ার আগে রবীন্দ্র রচনাবলীর একটা 'প্রবন্ধ' খণ্ড বার করে দিয়ে বললেন,

—এটা পড়, ভাল লাগবে।

দেখলম প্রবন্ধটার নাম 'কাব্যে উপেক্ষিতা'। সেদিন রাতেই পড়ে ফেললাম। ঊর্মিলা, অনসূয়া, প্রিয়ম্বদাকে নিয়ে কী অসাধারণ একটা লেখা। সত্যি তো! এমন করে কেউ ভাবতে পারে।

সেই থেকে আমার যাত্রা শুরু মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে।

ক্লাস সিক্স থেকে স্কুলজীবনের শেষ অবধি ছিলেন—একদিনের জন্যও হোমওয়ার্ক করাননি। ক্লাসের পড়া পড়াননি—বলতেন,

—নিজে পড়ো, একেবারে বুঝতে না-পারলে দেখব'খন

ফলে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-এর 'ড্যাফোডিলস' পড়লে এসে যখন 'pliss of solitude'- এ আটকালাম, তখন শব্দ দু'টোর মানে, উৎপত্তি, তাৎপর্য এগুলো এমন মধুরভাবে পড়িয়ে দিলেন যে সেই সন্ধের পর আমার মনে হ'ল ক্লাসের সবাইকে ডেকে ডেকে বলি, আন্টি যা পড়াল, ওটা কিছু নয় রে। আসল ব্যাপারটা এই।

পরের দিন পড়াতে এলেন। তিনটে কবিতা হাতে লেখা—ইয়ারো আনভিজিটেড, ইয়ারো ভিজিটেড, ইয়ারো রিভিজিটেড।

একটা নদীকে নিয়ে কবিমানসের তিনটে অখ্যান।

মনে আছে, প্রথম যকন বিলেত যাই, কোনও একটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের দৌলতে, বারবার উদ্যোক্তাদের বলেছিলাম, —ইয়ারো নদীটা কি অনেক দূর? দেখা যায়?

তাই বলে সন্ধেবেলাগুলো পড়াশুনা মোটেই থেমে থাকত না। ক্লাস এইটে যতদিনে উঠেছি আমার সবকটা শেক্সপিরিয়ন ট্র্যাজেডি মুলে পড়া হয়ে গিয়েছে। সমারসেট মম আর জিম করবেট পাশাপাশি পড়ে ফেলেছি।

একবার পূজোসংখ্যায় ফেলুদার কোনও একটা রহস্যোপন্যাস পড়ে খুব উৎসাহ-ভরে মাস্টারমশাইকে বলতে গিয়েছি, বললেন,—কাল একটা বই এনে দেব। পোড়ো। পরের দিন এল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এডগার অ্যালেন পো, আর অনতিকাল পরেই কোনান ডয়েল।

মাস্টারমশাইয়ের আসার কোনও নিয়ম ছিল না। চারদিন আসার কথা, এলেন হয়তো ছ'দিন। সন্ধেবেলা আসার কথা, এলেন চারটের সময়—সব স্কুল থেকে ফিরেছি, খেলতে যাব। ব্যাস! হাতমুখ ধুয়ে, খেয়ে, পড়তে বোসো।

মাস্টারমশাই রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন বই পড়তে-পড়তে। সাধারণত ফুটপাথ ঘেঁষে।

আর আমার পাড়ার ক্রিকেট খেলা সাময়িকভাবে থেমে থাকত, যতক্ষণ না বইয়ে নিমগ্ন মানুষটা পার হয়ে যান।

তারপর স্কুল ছেড়ে কলেজ, ইউনিভার্সিটি। 'মাস্টারমশাই'-এর সঙ্গে আর দেকাশোনা রইল না।

কেমন আছেন, কোথায় আছেন—জানি না। কেবল যখন চিত্রনাট্যের কোনও অমোঘ জায়গায়, বা যে কোনও লেখার কোনও একটা বাঁকে এসে আটকে যাই—চোখ তুলে দেখতে পাই ফুটপাথ ঘেঁষে নিবিষ্ট হয়ে পড়তে-পড়তে হেঁটে চলেছেন এক পাঞ্জাবি-পাজামা পরা মানুষ।

আর কলমটা যেন কী করে আবার নিজে-নিজেই চলতে শুরু করে।

৯ নভেম্বর, ২০০৯

AMARBOI.COM

আমাদের জেনারেশন-এর সব ছেলেমেয়েরাই মতি নন্দীকে চিনতে শিখেছিল বোধহয় তাঁর শারদীয় আনন্দমেলা-র উপন্যাসগুলো দিয়ে।

প্রোফেসর শঙ্কু এবং কাকাবাবু-র যেমন একটা নির্দিষ্ট মোড়ক ছিল, তারই মধ্যে ঘোরাফেরা করত নানা অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনি, নতুন নতুন রহস্য-গল্প—মতি নন্দীর লেখাগুলোও কোনও একটা ভীষণ জীবন্ত আবেগের নানারকম চেহারা। সেই বয়সে সেই আবেগটা দুরন্তভাবে তীব্র, এবং তার আকর্ষণ প্রায় অপ্রতিরোধ্য। আবেগটার নাম তখন জানতাম, খেলা। পরে, আরেকটু বড় হয়ে বুঝেছি—সেটা আসলে ভেতরের লড়াই।

আমি যে আমি, খেলার ধার মাড়াই না কোনওদিন, খবরের কাগজের খেলার পাতা অবলীলায় উল্টে চলে যাই; আমিও আনন্দমেলা-র ওই উপন্যাসগুলোর পাতায় কখন যে আটকে যেতাম জানি না। আমার অনেক বন্ধুর কাছেই যেটা ছিল একটা চেনা জগৎ, আমার কাছে কখন যে সেটা হয়ে উঠেছে এক অচেনার আনন্দর প্রবেশদ্বার! যে-দরজা খুলে আমি অত্যন্ত সহজে বিচরণ করতে পারছি প্রতিটি লড়াকু মনের আঘাত, হতাশা, উঠে দাঁড়ানো, এগিয়ে যাওয়ার দর্শক হয়ে।

খেলা সম্পর্কে যেমন শুনি—'খেলাটাই আসল, জেতা হারা তার অনেক পরে'; মতি নন্দীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চরিত্রগুলো সেই ছোট ছোট 'জেতাহারা'-গুলোকে তুচ্ছ করে দিয়ে কখন যে মনটাকে নিয়ে যেত এক বিরাট জয়ের আঙিনায়—সেটা মনেও পড়ে না।

সেদিন কোনও একটা কাগজে, বা রেডিওতে আলোচনা পড়ছিলাম বা শুনছিলাম, বাংলা সিনেমার বহুলবিখ্যাত সংলাপাংশ কী কী! বেশির ভাগই চেনা এবং অত্যন্ত সুপরিচিত। তার মধ্যে একটা সংলাপ খুঁজে পেলাম না। আমার খুব প্রিয় সংলাপ, মনে করিয়ে দিলে অনেকেরই মনে পড়বে।

'কোনি' বলে মতি নন্দীর উপন্যাসাশ্রিত একটা ছবি হয়েছিল। সেখানে ক্ষিদ্দা-বেশী সৌমিত্রদার সেই অমোঘ আহ্বানবাণী—ফাইট কোনি, ফাইট।

দুই

তারপর বহু বছর কেটে গিয়েছে। আমি শারদীয় আনন্দমেলা-র বয়স ছাড়িয়েছি। তখন ছবি বানানো শুরু।

'উনিশে এপ্রিল' হয়ে গিয়েছে। এবার নতুন কোনও ছবি। নতুন কোনও বিষয়।

'উনিশে এপ্রিল' করে আমার ঘরকুনো সিনেমা-করিয়ে বলে বদনামও হয়েছে। ফলে বিষয়টা আউটডোর-ভিত্তিক হলে ভাল হয় ইত্যাদি প্রভৃতি ভেবে নানা গল্প নতুন করে পড়ছি।

এমন সময় প্রথম পড়লাম, মতি নন্দীর 'একটি পিকনিকের অপমৃত্যু'।

কথাবার্তা হয়ে গেল। মতি নন্দীর সঙ্গে যোগাযোগ হল। মতি নন্দী মতিদা হলেন। কিন্তু ছবির নায়ক পাওয়া গেল না। এমনই এক খর্বকায়, বামনাকৃতি, অপাংক্তেয় নায়ক যে সাবলীল দক্ষতায় নারকেল গাছ চড়তে পারে।

ছবির নায়ক পেলাম না। বাকি ছেলেমেয়েগুলো জোগাড় করা শক্ত হত না হয়তো।

একটি 'পিকনিকের অপমৃত্যু' করা হল না, আমার।

হল সুচিত্রাদির উপন্যাস নিয়ে 'দহন'।

কিন্তু মতিদার ছোটগল্পটা মাথার মধ্যে এখনও ঘুরপাক খায়।

ততদিনে মতিদার শরীর খারাপ, প্রায় গৃহবন্দি। স্ট্রাইকার, স্টপার, অপরাজিত আনন্দ-র আবহমান উদ্যম ধীরে ধীরে ক্ষীণ ক্লান্ত হয়ে আসছে। প্রায় মতিদার শেষ নায়িকা বিজলীবালা-র মতোই শয্যাগত।

তারপর এই শীতে, সারা শহর যখন বনভোজনে মেতে ওঠে, কখন যেন লড়াই করার উঁচুতে ওঠার নারকেল গাছের ডালটা ফসকে মতিদা চলে গেলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের আশৈশব বনভোজনের মাঝখান থেকে। তাঁর সেই অমোঘ উচ্চারণ Top ten chart-এ উঠল না।

নিভৃত রয়ে গেল আমাদের মনের ভেতর। আজীবন।

—ফাইট কোনি, ফাইট।

২৪ জানুয়ারি, ২০১০

বিজন ভট্টাচার্যর কোনও নাটক আমি দেখিনি। তাঁকে মঞ্চে দেখাটা তো ছেড়েই দিলাম। অথচ, চাইলে বিজন ভট্টাচার্যর নাটক আমি দেখতে পারতাম না, তা মোটেই নয়।

পরের দিকে বিজন ভট্টাচার্য অভিনয় করতেন মুক্তাঙ্গন-এ, আমার বাড়ির দিকে, তেমন দূরে নয়। কিন্তু আমি তখন কেমন করে মাথায় ঢুকিয়ে ফেলেছি, আমার সেই কলেজবেলার গোড়ার দিকে, যে ভাল থিয়েটার কেবলমাত্র অ্যাকাডেমি আর রবীন্দ্রসদন-এ হয়।

তখনও মধুসূদন মঞ্চ বা গিরিশ মঞ্চের এমন রমরমা হয়নি। অন্যদিকে হাতিবাগান তখনও বেশ জাগ্রত।

তাই থিয়েটার সম্পর্কে আগ্রহটা প্রায় সীমিত ছিল অ্যাকাডেমি আর রবীন্দ্রসদন নামক দু'টো প্রেক্ষাগৃহে।

ফলে আমার বাদল সরকারও দেখা হয়নি।

বিজন ভট্টাচার্যও দেখা হয়নি।

বিজন ভট্টাচার্যকে আমি দেখেছি সিনেমায়। কিছু চরিত্র যেমন কয়েকটি বিশেষ সংলাপ দিয়েই অমর হয়ে থাকেন। শোলে-র আমজাদ খান যখন গব্বর সিং-এর অভিনয় করেন, কেবল 'কিতনে আদমি থে' বাক্যটাই যেমন তাঁর অমোঘ পরিচয় হয়ে ওঠে, পর্দার বিজন ভট্টাচার্যকেও আমরা বেশির ভাগ চিনি সেই ফিনফিনে জীবনকে প্রশ্ন করার অমোঘ-সংলাপে: 'রাইত কত হইল?'

সুবর্ণরেখা, মেঘে ঢাকা তারা—দু'টোই আমার বড় প্রিয় ছবি।

'মেঘে ঢাকা তারা'-র নীতার বাবা বলেই বিজন ভট্টাচার্যকে আমি বাকি জীবনটা মনে রাখতে পারি। পরম তৃপ্তিতে, পরম নির্ভরতায়।

আর তাঁর বাকি জীবনটা বলার জন্য যোগ্য মানুষ অনেকেই রয়েছেন—এই সংখ্যায় যাঁদের কয়েকজনের রচনা পড়তে পারেন। আমার কাছে মেঘে ঢাকা তারা-র বিজন ভট্টাচার্য এক চেনা চরিত্র। তাঁর সদম্ভ অসহয়তা, জেদ এবং অপারগতা, জীবনের প্রতি গভীর অভিমান এবং নিজের প্রতি এক অনবরত অনুচ্চারিত ধিক্কার—এ যেন আমি অনেক দেখেছি আমার প্রিন্স আনোয়ার শাহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোড-এর চারপাশে গড়ে-ওঠা কানা কলোনিতে। আমি বাস্তুহারা বাঙাল বাড়ির ছেলে। আমাদের সোদপুরের বাড়িতে অনেক জ্যাঠা-কাকাদের প্রতি নিয়ত দেখেছি। তাঁদের জ্যাঠা-কাকা বলেই জেনেছি, তাঁদের কোনও বৈশিষ্ট্য লক্ষ করিনি কোনও দিন। 'মেঘে ঢাকা তারা' দেখতে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে সত্যিকারের আলাপ হয়েছে আমার বিজন ভট্টাচার্যর মাধ্যমে।

আজ, আমার জীবন এক সত্যিকারের বিপর্যয়ের অধ্যায়ের সামনে দাঁড়িয়ে। বাবা যখন হাসপাতালে অচৈতন্যপ্রায় গত দু' সপ্তাহ ধরে—কেমন করে যেন আবার কোনও অদৃশ্য সম্পাদক আমাকে দিয়ে সেই অসহায়, অপারগ, সদণ্ড, জেদি, আমার মমতায় পরিপূর্ণ মানুষটির কথা লিখিয়ে নিল, যে তার সন্তানের সামনে নতমুখ হয়ে নিজের অক্ষমতার অপরাধ স্বীকার করে।

নীতা এবং তার বাবার সেই অকপট কথোপকথনের তীব্র দৃশ্য। যেখান থেকে বাবা এবং নিজেকে ভোলাতে গিয়েই নীতা ঝটিতে কোলে তুলে নেয় এক পড়শি শিশু এবং সহসা মেতে ওঠে তাকে সন্দেশ দেয়নি বলে। অনেকদিন অবধি এই দৃশ্যটার মধ্যে আমি বাবাকে দেখতে পেতাম।

নিঃশব্দ, স্বাভাবিক জীবন বঞ্চিত সন্তানের প্রতি উদ্বেগের এই নিদারুণ প্রতিকৃতি আজ আর পাই না। বাবার মাথার কাছে নিঃসঙ্গ সন্তান হাসপাতালের ঘরে বসে থাকে।

সব অনুভূতির বাইরে। যেন দু'টো অসম্পৃক্ত মানুষ।

পরমাত্মীয় যেন অতীত হয়ে যাচ্ছেন।

প্রায় যেমন যাচ্ছেন বাংলার পরমাত্মীয় বিজন ভট্টাচার্য।

১৮ জুলাই, ২০১০

রবীন্দ্রনাথকে বলা হত 'গুরুদেব'।

আর 'গুরু' বলা হত যাঁকে—তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা কোনও অর্বাচীন বাতুলও করেন না কোনওদিন।

রবীন্দ্রনাথের পর অপামর সাধারণ বাঙালির কাছে যিনি দ্বিতীয় আলোকদিশারি—তিনি বোধহয় সত্যজিৎ রায়।

বিদগ্ধজনেরা এই সহজ সমাপতন শুনে আমায় মারতে আসতে পারেন। কিন্তু সত্যজিতের ব্যক্তিত্ব, তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি, তাঁর আকৃতিগত আকর্ষণ, আর শেষমেশ রবীন্দ্রনাথের নোবেলের পর তাঁর অস্কারটুকু—তাঁকে রবীন্দ্রনাথের যোগ্য সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারী করে দিয়ে গিয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধারণ বাঙালি দর্শকের মনে—যাঁদের পুজোর অর্ঘ্যর সামনে সবসময় একজন অদৃশ্য অতিনায়ক লাগে। এঁরা রবীন্দ্রনাথ পড়েননি। সত্যজিৎ রায়ও দেখেননি মন দিয়ে—মাঝে মাঝে 'গুপি বাঘা' বা 'সোনার কেল্লা' ছাড়া।

তবু বাঙালি-মানসে রবীন্দ্রনাথের পর সুকুমার-পুত্র সত্যজিৎ কোথায় যেন একটা অঘোষিত যুবরাজ। সে দু'জনের পারিবারিক ঐতিহ্যের কারণেই হোক, আর বাঙালিকে জগৎসভায় প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্যই হোক।

অথচ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের পর স্বাভাবিকভাবেই যাঁর 'গুরু' বলে খ্যাত হওয়া উচিত ছিল—তিনি সত্যজিৎ হয়েও হলেন না।

আজও বাঙালির মনে অবিসংবাদী গুরু—উত্তমকুমার। কোনও মিঠুন চক্রবর্তী, কোনও সৌরভ গাঙ্গুলি, কোনও প্রসেনজিৎ, তাঁকে সেই আমোঘ ভক্তিভিত্তি এতটুকু টলাতে পারেনি। আজও। তাঁর মৃত্যুর তিরিশ বছর পরেও।

উত্তমকুমারের এই অমরতা পিছনে কে দায়ী আমরা জানি না। আমার অনুমান, ঈশ্বরের পরেই অন্য কোনও সর্বশক্তিমান উপস্থিতি থাকেন, যাঁর ভূমিকা প্রায় পৌরাণিক মেফিস্টো বা ফাউস্ট-এর মতো—কিংবা তাঁদের থেকেও বড়, তাঁর নাম শ্রী নস্টালজিয়া।

এই ভদ্রলোক দিনের পর দিন স্মৃতির বাগানে সযতন জলসিঞ্চনে নির্মাণ করেছেন নতুন সত্তা—সত্যিকারের স্মৃতির মানুষটার সঙ্গে যাঁর প্রায় কোনও মিলই নেই।

আমরা আজ উত্তমকুমার বলতে যা বুঝি, আর সত্যিকারের উত্তমকুমার কী ছিলেন—তার মধ্যে বিস্তর তফাত আছে, নিঃসন্দেহে। কিন্তু উত্তমকুমারের এই স্বর্ণায়ু কি কেবলমাত্র তাঁর চেহারার টানে, কিংবা তাঁর অভিনয়ের আকর্ষণে—না কি বাড়তি কিছু?

যে কোনও ম্যাটিনি আইডল-ই এইবাড়তিটুকু নিয়ে বেঁচে থাকেন। এবং একসময় ধীরে-ধীরে তাঁর নিজস্ব, একান্ত ব্যাক্তিত্বের চারপাশে এই দর্শকদাক্ষিণ্যই এক অলক্ষ্য চলচিত্র তৈরি করে। সেই ছত্রছায়ায় তারকা এত স্বচ্ছন্দ বোধ করতে থাকেন, যে, একটা সময়ের পর এই দর্শকাকুলতার রাজছত্রটাই তাঁর প্রধান অস্তিত্ব হয়ে দাঁড়ায়। সেটা ছাড়া স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা নির্জন ও বিপন্ন বোধ করেন।

মহাকাল আমাদের দিব্যি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে উত্তমকুমারের ক্ষেত্রে গত তিরিশ বছর ধরে তাঁর মহিমার প্রতিকৃতি ক্রমশ আরও উজ্জ্বল হয়েছে দর্শক-মনে।

যাঁরা উত্তমকুমারের জীবদ্দশার ভক্ত, তাঁরা আজও তাঁর কোনও উত্তরাধিকারীকে স্বীকার করেন না।

যাঁরা সে-সময়ে উত্তমকুমারকে তেমন পাংক্তেয় গণ্য করতেন না—বরং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষা-দীক্ষা, সত্যজিৎ-সান্নিধ্য, রাজনৈতিক প্রগতিশীলতাকে অনেক বেশি মনস্ক-বাঙালির আদর্শ মনে করতেন, তাঁরাও ধীরে-ধীরে টেলিভিশনের মেগা-ধারাবাহিকে বা নানান অকিঞ্চিৎকর ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ক্রমিক ক্ষয় দেখতে দেখতে কখন যেন অবশেষে উত্তমকুমারকেই নায়ক বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন শেষ অবধি।

যাঁরা উত্তমোত্তর যুগের দর্শক, তাঁরা প্রায় গল্পকথার মতো উত্তমকুমারের সম্পর্কে নানা ছবির টুকরো, নানা ঘটনার ইঙ্গিত, এবং প্রধানত বাড়ির প্রধানদের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাসে, কতকটা প্রভাবিত হয়েই 'উত্তমকুমার' নামক ফোনোমেনন-টিকে ঐতিহাসিক ভাবলেও—বর্জন করেননি।

আমি এই প্রজন্মের সেই মানুষগুলোর কথা বলছি, যাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথ, সত্যজিৎ দু'জনেই দু'টি যুগের পৌরাণিক নায়ক। তাঁদের কাছে কতকটা হলেও বাস্তব হচ্ছে ফেলুদা।

অঞ্জন দত্তর 'ব্যোমকেশ বক্সী' চলছে রমরম করে। 'চিড়িয়াখানা' যখন মুক্তি পেয়েছিল, আমি এতটাই ছোট যে, তার দর্শক-প্রভাব সম্পর্কে সম্যক কিছু জানি না।

ব্যোমকেশ-এর ভূমিকায় বেশির ভাগ দর্শকেরই আবির চট্টোপাধ্যায়কে দুর্দান্ত লাগছে। কিন্তু সেটা স্বতন্ত্র সত্য। এ ক্ষেত্রে যেটা অবধারিত ছিল—সেটা উত্তমকুমারের সঙ্গে তুলনা। সব্যসাচী চক্রবর্তী তাঁর গোটা ফেলুদা-জীবনটাই এই তুলনার শিকারে কাটালেন।

এর থেকে কি বুঝব আমরা?

ব্যোমকেশ উত্তমকুমারের থেকে বড় ব্র্যান্ড আজও বাঙালির মনে?

না, উত্তমকুমারের আসল উপস্থিতি প্রতিটি পঞ্চাশোর্ধ্ব দিদিমার কুমারী-হৃদয়ের মন্দিরে। যেখানে আর কোনও কিছুই আসে যায় না।

যেখানে প্রেম মানেই পুরুষোত্তম, যাঁর সাবেক-নাম আসলে উত্তমকুমার?

৫ সেপ্টেম্বর, ২০১০

এক

সুচিত্রাদির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় কবে, তা মনে করে বলতে পারা কঠিন। আমার প্রজন্ম বা তার কাছাকাছি যে কোনও বয়সের বাঙালি বোধহয় একই কথা বলবেন।

তখন রেডিও-র যুগ। বা রেকর্ড প্লেয়ারের। রেডিও-র ভিতর থেকে যে-দৃপ্ত গানগুলো ভেসে আসে সেটাই যে লং-প্লেয়িং রেকর্ডের মলাটে একজন ছোটচুল চশমা পরা সুন্দরীর কণ্ঠনিঃসৃত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটা মেলাতে মেলাতেই আরেকজন অদৃশ্য দাড়িওয়ালা মানুষ আমাদের দু'জনের এক নিবিড় মিতালি পাতিয়ে দিয়েছেন।

আমাদের ছোটবেলায় শাড়ি পরিহিতা মহিলারা চুল ছোট করে কাটলে ওঁদের উগ্র-আধুনিকা বলা হত। কেবল ইন্দিরা গান্ধী, আর সুচিত্রা মিত্রর বেলায় এই বর্ণনা দু'টো অবান্তর ভাবে নস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল। জানি না রবীন্দ্র-নেহরুর দিগন্তব্যাপী প্রচ্ছায়া এই হ্রস্বকেশ রমণীদের কখন কীভাবে উগ্র আধুনিকার সংকীর্ণ সংজ্ঞা থেকে মুক্তি দিয়েছিল এক দৃষ্টান্তস্বরূপিণী প্রগতিশীলতায়।

কলকাতায় তখন দুই সুচিত্রার রাজত্ব। বাঙালি মনের দুই অধিশ্বরী। রমা সেন পর্দা-পরিচয়ে সুচিত্রা হয়ে, সুন্দরী হয়ে, বাঙালি মনের গ্ল্যামারের শীর্ষবিন্দুতে দাঁড়িয়েও তাঁর অন্য এক 'নেমসেক'-এর আবেদনকে স্বকীয়তা-বিচ্যুত করতে পারলেন না কোনওদিন। সুচিত্রা মিত্র তাঁর কণ্ঠ, তাঁর গান, তাঁর পরিশীলিত রূপের বিভায়, তাঁর ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনায় এক সমান্তরাল গ্ল্যামার নিয়ে বিরাজ করে এলেন দোর্দণ্ডপ্রতাপে। বাঙালির কাছে কে বড় আইকন—রিনা ব্রাউন না কৃষ্ণকলি, ভেবে বলা কঠিন।

দুই

সুচিত্রা মিত্রকে আমি রেকর্ড কভার আর বেতার জগৎ-এর ছবির বাইরে প্রথম দেখি কোনও একটা সাউন্ড স্টুডিওতে। বোধহয় কোনও রেকর্ডিং-এ এসেছিলেন। আমি তখন বিজ্ঞাপনে কাজ করি। আমিও গিয়েছি কোনও বিজ্ঞাপনের jingle recording? এর জন্য স্টুডিও বুক করতে।

স্টুডিও-র ভিতরে রেকর্ডিং চলছিল। ফলে সুচিত্রাদি বাইরে বসে। রিসেপশনের সামনে, একটা বই পড়ছেন। সাদা তাঁতের শাড়ি, গায়ে একটা হালকা তসর চাদর। মনে আছে, কতক্ষণ না জানি একদৃষ্টে হাঁ করে তাকিয়ে ছিলাম সেই শুভ্রবসনা সুর-সরস্বতীর দিকে।

আমরা লেখার সঙ্গে ছবিগুলো বোধহয় আপনাদের অচেনা নয়। সুচিত্রাদি আমার তিন নম্বর ছবিতে অভিনয় করেছিলেন—'দহন'। পাঠকরা হয়তো অনেকেই 'দহন'-এর গল্প শুনতে চাইবেন।

কিন্তু আমার কাছে, বা সবার কাছেই নিশ্চয়, সুচিত্রাদি যেহেতু আমার একটা ছবির অভিনেত্রীর থেকে অনেক অনেক বেশি, আজ আর সে-গল্প লিখে কলকাতার 'কৃষ্ণকলি'-কে খণ্ডিত করতে চাই না।

এখন সকাল ছ'টা। আমি লিখছি আর আমার পাশে ট্রানজিস্টরে 'সকালের রবি' অনুষ্ঠানে সুচিত্রাদি গাইছেন—'নূতন প্রাণ দাও, প্রাণসখা, আজি সুপ্রভাতে।

২৩ জানুয়ারি, ২০১১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেড়শো বছর আগে যে মানুষটা জন্মেছিলেন এবং সত্তর বছর আগে আমরা যাঁর দিব্যকান্তি মর্ত্যদেহকে বহন করে নিয়ে গিয়েছি শেষ আগুনের সামনে, আজ তাঁকে আনুষ্ঠানিক ভাবে মনে করার সময় এল বুঝি? কেন এই এত বছর ধরে আমাদের লালনে, মননে, ভাবনায়, চিন্তায় কি তাঁকে ছাড়া একটি পা-ও আমরা চলতে পেরেছি? অন্যদের কথা বলতে পারব না। কিন্তু আমার আমি হয়ে ওঠার পিছনে যে ঘনিষ্ঠ পারিবারিক আত্মীয়টি আমাকে বারবার ঠেলে দিয়েছেন চরম কঠিন পরীক্ষার সামনে। এবং সযত্নে রক্ষা করেছেন যে কোনও প্লাবনের অবসাদ আর অন্ধকার থেকে, তাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ।

এক একটি বিশেষ মুহূর্তে তাঁর একই কথা নানাভাবে অর্থবহ হয়েছে। এমন দুঃসহ ভাবে ধ্রুব বলে মনে হয়েছে, যে কখন যেন আমি বুঝে গিয়েছি—তিনি ছাড়া সত্যিই পথ নেই।

আমার নিভৃত রবীন্দ্র সান্নিধ্য চিরকালের। সেই বাল্যের দিন থেকে যখন আমার মা, কেবল গান গাইতে পারতেন না বলে আমাকে ঘুম পাড়াতেন সঞ্চয়িতা পড়ে। শৈশবে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আমার ঘুম পাড়ানি গানের কবি। আর একটু বড় হতেই তিনিই আমার 'ঘুম ভাঙানিয়া'। এভাবেই চলেছে আমার তাঁর সঙ্গে নিয়ত বোঝাপড়া তার মধ্যে রাগ, অভিমান, দুঃখ, কঠিন আত্মধিক্কারের সঙ্গে মিশে ছিল এক অনির্বচনীয় আনন্দ।

আলাদা করে তাই এ বছরটা ব্যক্তিগত ভাবে আমার কাছে বিশেষ নয়।

যদিও বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এই বিশেষ বছরটির তাৎপর্য কিছুটা বুঝি।

দেড়শো বছর শুনলে অনেকটা প্রাচীন মনে হয়। আমার রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে চিরকাল আমার সমবয়সি, আমার প্রতিটি জন্মদিনে তিনি একটি নতুন বছর পান।

নানারকম আইডিয়া চট করে আমার মাথায় আসে সাধারণত। কিন্তু আমি, আজ এই সার্ধশতবর্ষ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে তেমন কিছু ভেবে উঠতে পারব কিনা জানি না।

যদি, উদ্দেশ্যটা হয় আমি-পরবর্তী বহু নবীনের সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দেওয়া। তা হলেও বলি সে কাজটা নিজের মতো করে শুরু হয়ে গিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের গান স্বরবিতানের শাসন ছেড়ে মুক্তি পেয়েছে যৌবনের আবেগে, নবীন এবং নবীনতর স্বতঃস্ফূর্ততায়। যে কোনও নিয়ম ভাঙার ভাল মন্দ দু'টো দিকই আছে। ভালটাকে পাব বলে যদি সত্যিই আশা রাখি, তবে কিছু কিছু মন্দকেও মেনে নিতে হয়—তাকে নিছক উৎপাত বলে বাতিল করে দেওয়া যায় না। যাঁরা আমার বয়সি বা অগ্রজ তাঁদের রবীন্দ্রভাবনা নিশ্চয়ই এতদিনে একটা নির্দিষ্ট আকার নিয়েছে। আমি প্রধানত ভাবছি নতুনদের কথা। যাঁরা বেশিরভাগটাই ইংরেজি মাধ্যম স্কুলশিক্ষা, কম্পিউটার এবং নেট সার্ফিং-এর জগতের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীকে ছুঁতে চাইছেন, কিন্তু বাড়ির এই মানুষটির সঙ্গে তাঁদের তেমন করে পরিচয় হয়নি।

বুঝতে পারি। আমরা কোনও দেশে বাস করছি না। আমাদের বাস কালে—আমরা আধুনিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেটাই যেন আমাদের পরিচয়। তাই যদি হয়, তা হলে আমাদের থেকেও অনেক অনেক আধুনিক মানুষটাকে দৃশ্যত কতগুলো সাদা কালো বা সিপিয়া ছবির জাদুঘর থেকে টেনে বের করে এনে কেন না তাঁকে নিজের ঘরে নিয়ে আসি। নানা বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, যে তোর জন্য কী আনব' জিগ্যেস করলেই অবধারিত ভাবে আমার অনুজ বন্ধুরা বলেছে 'ভাল পোস্টার নিয়ে এসো।'

পোস্টার শিল্প আজকের শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিগুলো যদি নানারকম সুদৃশ্য পোস্টারে পরিণত হয়, তবে তাঁর সঙ্গে নবীনদের ভাব হবে অনেক সহজে। একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলি, যে আমার বিজ্ঞাপনী বুদ্ধি বলে, সেগুলো NID বা কোনও পেশাদারি মানুষকে দিয়ে করালে ভাল হয়। জানি না। সরকারি কমিটিকে নাম করে কাউকে, দক্ষ বলা যায় কিনা, তবে এই মুহূর্তে আমার শহরে অনুরাগ হীরা এবং রাম রায়ের কথা মনে পড়ছে।

রবীন্দ্রনাথের গান দক্ষ হাতে পড়ে চমৎকার music video হতে পারে। তখন হয়তো আজকের নবীনদের কাছে রবীন্দ্রসংগীত মাত্রেই প্যানপ্যানানি মনে হবে না।

বাইশে শ্রাবণের দিন এক প্রয়াণ স্মৃতি মিছিলের কথা আমরা আগেও আলোচনা করেছি। সত্যিই যদি সেটা আত্মায় ও আয়তনে সুবৃহৎ ও সুসংহত হয়, কলকাতার অনেক মানুষ তাতে আপনিই যোগ দেবেন। শ্রাবণ মাস বৃষ্টির মাস। অতএব বাইশ তারিখের কথা ভেবে মেঘলাকে নোটিশ পাঠানো যায় না।

আমার তো ভাবতে বড় ভাল লাগছে, ঝোর বৃষ্টিতে সারা কলকাতা হাঁটছে। আর স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গাইছে, শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে।

বাঙালির অনেক বছরের অনেক তর্পণ বাকি রয়ে গিয়েছে এই পিতৃপুরুষটির কাছে। দেড়শো বছরের বাইশে শ্রাবণে তার সবটুকু পূরণ করে দেওয়া যাবে কিনা জানি না। কিছুটা অন্তত তো যাবে। তাই দিয়েই নয় যাত্রা শুরু হোক।

(এ প্রস্তাব সরকারি কমিটির জন্য রচিত হলেও, রবীন্দ্রনাথ যেহেতু আমার মতো আমাদের সকলের, অতএব আমি মনে করি আপনাদের নানা ধরনের ভাবনা চিন্তা এই প্রস্তাব প্রবাহকে আরও বলবতী করবে। ঠিক যেমন নানা অনামা কবির সংযোজনে মহাভারত তার মহাকাব্যিক আকার পেয়েছে।

সম্প্রতি রাজ্য সরকার নির্মিত রবীন্দ্র সার্ধশতবর্ষ যাপনের জন্য একটা কমিটি নির্মিত হয়েছে নানা বিশিষ্ট মানুষের মধ্যে আমিও একজন সদস্য। আমাদের সভাপতি শাঁওলী মিত্র, আমাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে প্রস্তাব আমন্ত্রণ করেছিলেন। আমার প্রস্তাবটি আমি লিখিত আকারে জমা দিয়েছিলাম।

সেটাই এখানে ছাপিয়ে দিলাম আপনাদের সকলের জন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলে, আপনাদের মতে সার্ধশতবর্ষকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার যা যা ভাবনা, আপনার 'রোববার' দপ্তরে পাঠিয়ে দিতে পারেন। আমরা সেটা সরকারি কমিটির কাছে পৌঁছে দেব।)

১০ জুলাই, ২০১১

রাজেশ খান্না দৃশ্যের পর দৃশ্যে প্রেম নিবেদন করেছেন কাকে? তাঁর নায়িকাকে? না। ক্যামেরাকে। পর্দার ওপারের সমস্ত দর্শককে। তাই তিনি প্রথম সুপারস্টার। তাই তিনি একা বদলে দিলেন নায়কপনা-র সংজ্ঞা। তাই তাঁর টানে ভারতীয় নারী অন্তঃপুর ছেড়ে এসে দাঁড়াল সরাসরি নিবেদনের সরণিতে।

রাজেশ খান্নার প্রেম ছিল ক্যামেরার সঙ্গে। আর ছিল কিশোরকুমারের কণ্ঠনিঃসৃত গানের এক উত্তুঙ্গ প্রণয়াভিনয়।

এবং যেহেতু রাজেশ খান্নার যাবতীয় প্রেম নিবেদনের সমস্ত সূক্ষ্মতার পুঙ্খানুপুঙ্খ কেবল ক্যামেরার উদ্দেশ্যেই রচিত, তাঁর নায়িকা শর্মিলা ঠাকুর বা মুমতাজের জন্য নয়—তাই তাঁর প্রণয়-সংকেতের পুরোটাই বারংবার সরাসরি আলিঙ্গন করেছে ক্যামেরার লেন্স-কে।

তাঁর নায়িকারা এই প্রেমের খেলায় কেবল তাঁর অনুপস্থিত সহশিল্পী মাত্র। রাজেশ খান্নার প্রণয়ের দাবিতে তাঁরা ক্যামেরার পাশে নিতান্তই দুয়োরানি।

এমনকী হৃষীকেশ মুখার্জির 'নমকহারাম' ছবিটিতে রাজেশ খান্না যখন 'দিয়ে জ্বলতে হ্যায়' গানটি গান, কেবল রাজেশ খান্নার শটগুলো পাশাপাশি সাজালে, সেটিও একটি তীব্র প্রণয়গীতি হয়ে ওঠে যেন। আমরা ভুলে যাই পরিচালকের আসল উদ্দেশ্য কিন্তু ছবিতে রাজেশের সহশিল্পী—অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে তাঁর এক সখ্যের ভাব এবং তদ্দ্বারা এক মধুর দৃশ্য রচনা করা।

আমরা রাজেশ খান্নার মুখ থেকে একটি প্রেমের গান শুনি, তাঁর সেই প্রণয়লীলাকে যেন ক্যামেরাবন্দি করে রাখছেন অমিতাভ বচ্চন। এখানেও ক্যামেরার সঙ্গে রাজেশ খান্নার প্রণয়-সম্বন্ধের পাশে তাঁর নায়িকাদের মতোই সমান অকিঞ্চিৎকর হয়ে যান তাঁর সহনায়ক।

হয়তো ক্যামেরাকে প্রধান প্রণয়িনী করে তোলাই রাজেশ খান্নার স্টারডম-এর এক নতুন মাত্রা। অগুন্তি ফ্যান ক্যামেরা নিবদ্ধ তাঁর প্রণয়ভঙ্গি সদর্পে সরাসরি গ্রহণ করেছেন তাঁদের হৃদয়ে। কোনও নায়িকার মাধ্যমে চুঁইয়ে আসা তলানিটুকু আস্বাদ করেই তৃপ্ত থাকতে হয়নি তাঁদের।

প্রেমের দৃশ্যে প্রণয়ীর দিকে না-তাকিয়ে ক্যামেরার সঙ্গে প্রেমালাপ হয়তো ভাল অভিনয়ের পর্যায়ভুক্ত নয়, কিন্তু রাজেশ খান্নার সমস্ত ছবি দেখলেও আমরা জানি যে, তিনি সুদক্ষ অভিনেতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যতটা ছিলেন, তার থেকে অনেক বেশি সফল ছিল তাঁর চূড়ান্ত মায়াময় প্রণয়ীর image।

এবং তাঁর এই ত্রুটিদুষ্ট অভিনয়ের কারণেই যেন, সহশিল্পীর সঙ্গে প্রণয়-রসায়নের সমস্তটুকু ক্যামেরাকে নিবেদন করে দিয়ে আসলে রাজেশ খান্না এক সুনিবিড় অন্তরঙ্গতা স্থাপন করছেন তাঁর সমস্ত দর্শকের সঙ্গে সুগোপন ব্যক্তিগত নিভৃতিতে। এবং আমরাও যেন অতি অনায়াসে জায়গা বদল করে নিচ্ছি ক্যামেরার এপাশের সেই অদৃশ্য প্রণয়ীদের সঙ্গে। সমস্ত শরীরে এবং মনে মেখে নিচ্ছি রাজেশের প্রণয়বর্ষণ।

এই প্রথম কোনও নায়ক যেন ক্যামেরার মাধ্যমে প্রেম নিবেদন করলেন তাঁর প্রতিটি দর্শককে—এবং সেই সঙ্গে আমূল বদলে গেল রুপোলি পর্দার নায়কপনা-র ইতিহাস।

রাজেশ খান্না-ই বোধহয় প্রথম ভারতীয় নায়ক, যিনি, পাশ্চাত্যের দর্শকানুরাগের প্রচণ্ডতাকে অত তীব্রভাবে জীবন্ত করেছেন আমাদের দেশে। এবং 'সুপারস্টার'-এর নতুন সংজ্ঞা সেই সঙ্গে রচিত হয়েছে তাঁকে ঘিরে।

রাজেশ খান্নাই হলেন সেই প্রথম কাঙ্ক্ষিত নায়ক, যাঁর জন্য কোনও ভক্তিরস প্লাবিত হয়নি, বরং তৈরি হয়েছে শৃঙ্গাররসের এক অবিরল মুক্তধারা।

এতদিন ধরে স্বপ্নের নায়ককে ঘিরে মহিলা-দর্শককুলে তৈরি হয়ে থাকত এক গোপন মুগ্ধতা। তার বিনিময় হত নিজেদের মধ্যেই গল্প-আলোচনায়, দুপুরবেলার বিশ্রামের সঙ্গে সিনেমা-পত্রিকার অবিচ্ছেদ্য সখিত্বে, কিংবা বড়জোর সাহস করে কাঁপা কাঁপা হৃদয়ে লেখা 'ফ্যান লেটার'-এ।

রাজেশ খান্নাই প্রথম বদলে দিলেন নায়ক এবং প্রণয়াচ্ছন্ন দর্শকের নিজস্ব টানাপোড়েনের রসায়ন। এবং সেই সঙ্গে সারা ভারতবর্ষে ঘটে গেল এক অদ্ভুত নারীমুক্তি। যেখানে নারী তার অন্তরের তাগিদে এক নিদারুণ প্রেমের প্ররোচনায় অন্তঃপুর ছেড়ে সোজা এসে দাঁড়াল রাস্তায়। কোনও অধিকারের দাবিতে নয়, কোনও বঞ্চিতের প্রতিবাদ নিয়ে নয়—কেবল তার নিজের গোপন যৌনাকাঙ্ক্ষাকে নির্দ্বিধায় স্পষ্টভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে ব্যক্ত করার এক দৃপ্ত বাসনায়।

এল্‌ভিস প্রিস্‌লি-র মতো রাজেশ খান্নার গাড়ি প্রতিটি দৈনিক সফরেই রঙিন হয়ে উঠত এক বিপুল সম্মিলিত রক্তিম লিপস্টিক চুম্বনে।

ফলে গাড়ির কাচ তোলা নিরাপত্তার মধ্যে যে-মানুষটি, তিনি সুদক্ষ অভিনেতা না-হয়েও, তথাকথিত সুদর্শন না-হয়েও, আস্তে আস্তে হয়ে গেলেন সেই সময়ের ভারতীয় রমণীর স্বপ্নের আরাধ্য, তাদের কল্পনার শয্যাসঙ্গী।

রাজেশ খান্না অজান্তেই নিজেকে ঘিরে রচনা করেছিলেন এই মোহিনী মায়া। তাই ছবির-পর-ছবি জুড়ে একজন অভিনেতাকে বিসর্জন দিতে লাগল এক মায়াপুরুষের প্রণয়সংকেত। যতদিন না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পূর্ণ অন্য কোনও এক আত্মপরিচয় নিয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন এক কৃশকায় দীর্ঘদেহ যুবক।

রাজেশ খান্নার অনুজ সুপারস্টার। অমিতাভ বচ্চন।

৫ আগস্ট, ২০১২

শিবরাম চক্রবর্তীর এই গল্পটি বহুলপ্রচারিত অনেকে অনেকরকম করে এই শিবরাম-পুরাণটি জানেন।

আমি যেভাবে সম্প্রতি শুনলাম, সেটাই লেখার চেষ্টা করছি।

শিবরামকে একবার নাকি জিগ্যেস করা হয়েছিল—আপনি লেখেন কখন?

শিবরাম প্রভূত অনাগ্রহের সঙ্গে বললেন,

—সকালে ঘুম থেকে উঠি। তা, ঘুম তো একটা বড় পরিশ্রমসাধ্য কাজ। তাই প্রচণ্ড ক্লান্ত লাগে, তাই আবার খানিকটা ঘুমোই।

—তারপর শেষমেশ ওঠেন কখন?

—ওই বেলা এগারোটা বেজে যায়।

—উঠে?

—উঠে বাথরুম-টাথরুম সারি। চা খাই, কাগজটা উল্টেপাল্টে দেখি, স্নান করি। এই করতে-করতে দুপুরের খাওয়ার সময় হয়ে যায়। খেয়ে নিই। আর দুপুরে খাওয়ার পর তো ঘুমোতেই হয়। ঘুমোই।

—তারপর?

—উঠতে-উঠতে বিকেল গড়িয়ে যায়। আবার একটু চা খাই। তারপর একটু বেরই। আর বেরলে তো রাবড়ির দোকানে যেতেই হবে। কারণ রাবড়িই তো পৃথিবীর পরমাশ্চর্য, দিনে একবার রাবড়ি না-খেলে কি চলে? রাবড়ি-টাবড়ি খেয়ে আবার ফিরে আসি। একটু বইটই দেখি। ততক্ষণে রাতের খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। খাই। আর খাওয়া শেষ করে ঘুমিয়ে পড়ি।

—তা হলে লেখেন কখন?

—কেন, পরের দিন!

১৬ ডিসেম্বর, ২০১২

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"জানি, বললে লোকে বিশ্বাস করবে না, কিন্তু সত্যিই আমার দু'চোখ দু'রকম। ডান চোখটা সর্বদা মিটিমিটি হাসে, শোকের বাড়িতেও নির্লজ্জ, সে শুকনো থাকে আর বাঁ চোখটা একদম হাসে না। তার গড়নটাই কেমন দুঃখী-দুঃখী। যেন ট্র্যাজেডির মুখোশ থেকে চুরি করেছি। আমি হেসে কুটিপাটি হলেও বাঁ চোখ আপনমনে দুঃখী হয়ে থাকে।...একবার বেলা আমাকে বলেছিল, 'তোর জীবনে মাঝামাঝি কিছু নেই। সবই তুমুল, সবই তীব্র। তীব্র সুখ, তুমুল যন্ত্রণা।' কে জানে, হয়তো বা তাই।"

এ কথা বলেন সেই আশ্চর্যময়ী। যাঁর নবনীতা নামকরণ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের। কবির দেওয়া নামও পছন্দ হয় না বালিকার। দোকানের সাইনবোর্ডে 'বীণাপাণি-বিপণি'-র শব্দানুপ্রাস এমন মুগ্ধকরে বালিকাকে যে, 'বীণাপাণি-বিপণি' শব্দটাই নিজের নাম হিসেবে আকাঙ্ক্ষা করেন নবনীতাদি। আমরা কি তখনও বুঝিনি যে এই বাংলায় জন্মেছেন এক আশ্চর্য জাতিকা?

নবনীতা দেবসেন-এর জন্ম এক কবির ঔরসে আর এক কবির গর্ভে। 'ভাগ্যবিধাতা' শব্দটি যদি জাতীয় সংগীত থেকে উঠে এসে সত্যি কোনও দয়ালু দেবতা হতেন, তবে তাঁর বিধানে নবনীতার কবিজীবনই হত একমাত্র ভবিতব্য।

নবনীতা সারাজীবন এই ভাগ্যবিধাতার সঙ্গে কানামাছি খেলেছেন। চোখ বাঁধার রুমালটা কতটা অস্বচ্ছ ছিল, জানি না, কারণ ডান চোখ আর বাঁ চোখ সেই চোখবাঁধা অবস্থাতেও নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে ভোলেনি।

নবনীতাদির তুমুল তীব্রতায় এতটুকুও ভেজাল মেশেনি তাঁর স্বভাবজ স্নিগ্ধ কৌতুকবোধে।

'বিপ্লব' কথাটিকে এক বিধ্বংসী বিদ্রোহ ঘোষণার violence-এর তাক থেকে আচারের বৈয়ামের মতো করে পেড়ে নিয়েছেন নবনীতাদি।

তাই তাঁর জীবনের নানা আশ্চর্য 'বিপ্লব' গভীরতম হলেও, তাদের নিয়ে এই গোটা আশ্চর্য জীবন ধরে কত অনায়াসে কত ভালবেসে এক হাতে শাড়ি গুছিয়ে কিতকিত খেলে গিয়েছেন অবলীলায়।

আজ সেই আশ্চর্যকুমারীর জন্মদিন। আজ থেকে সেই ডান চোখ আর বাঁ চোখ আবার নতুন করে পৃথিবী দেখবে অফুরান বিস্ময়ে। আর সেই জীবন্ত রূপকথার নির্মল পূতধারায় গা জুড়িয়ে নেব আমরা।

শুভ জন্মদিন নবনীতাদি। তুমুল তীব্রভাবে বেঁচে থাকো তুমি—আমাদের অনন্তযৌবনা, তোমার চশমার পাওয়ার আর লাঠিটুকু নিয়েই।

১৩ জানুয়ারি, ২০১৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্র সার্ধশতবর্ষ শেষ হতে-না-হতেই স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশতবর্ষ।

এক বছরের ছোট-বড় এই দুই বাঙালি মনীষীর তেমন সদ্ভাব ছিল না বলেই শোনা যায়।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি থেকে স্বামীজি'র জন্মস্থান সিমলে-র দত্তবাড়ি প্রায় ঢিলছোড়া দূরত্ব। অতএব বাল্যকাল থেকেই তাঁরা প্রতিবেশী। ঠাকুরবাড়িতে যেমন দ্বিজেন্দ্র, সত্যেন্দ্র, রবীন্দ্র—দত্তবাড়িতেও তেমন নরেন্দ্র, মহেন্দ্র, ভূপেন্দ্র।

জানি না, এই প্রতিযোগিতার কারণেই নরেন্দ্রনাথ দত্ত চট করে নরেন হয়ে উঠলেন কি না!

নরেন্দ্রনাথ দত্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন বলে শোনা যায়। রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের মুখোমুখি সাক্ষাৎ একবারই মাত্র ঘটেছিল, ভগিনী নিবেদিতার কল্যাণে—এমনটাও পড়েছি কোথাও। অতএব রবীন্দ্রনাথ আর নরেন্দ্রনাথ সমসাময়িক হয়েও মিত্র নন, শত্রু নন—কেবল প্রতিদ্বন্দ্বী।

এই বছর ১২ জানুয়ারি সন্ধেবেলা গড়িয়াহাট ফ্লাইওভার বেয়ে গোলপার্কের দিকে এগোচ্ছি, দেখলাম-গোলপার্কের রেলিং ঘিরে টুনি বাল্‌বের আলোকসজ্জায় বিবেকানন্দর জীবনালেখ্য।

ভিতরে বোধহয় স্বামীজি'র জন্মদিবস উপলক্ষে কোনও অনুষ্ঠান চলছিল। গম্ভীর গলায় একটি বক্তৃতা শেষ হল এবং ঘোষণা হল সংগীত পরিবেশনের।

চলন্ত গাড়িতে আমার মনও উৎকর্ণ হল কী গান হবে ভেবে? হঠাৎ ট্রাফিক সিগন্যাল থেকে ভেসে এল, 'ওগো, দখিন হাওয়ার...'।

জীবদ্দশায় দুই প্রাতঃস্মরণীয় বাঙালি না-হয় বন্ধু হতে পারলেন না, সার্ধশতবর্ষের কলকাতাও যে সেই বৈরিতার এক জলজ্যান্ত প্রতিমা—যেটা দেখে একটু মন খারাপ হল, আবার মজাও লাগল।

ইতিহাসের কী অকল্পনীয় স্মরণশক্তি!

৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩

তখন আমার বয়স কত হবে? বড়জোর আট বা নয়। 'মুক্তিযুদ্ধ' নামটা তখন সবে কানে আসছে। মা পুরনো শাড়ি, বাবার শার্ট, আমাদের বাতিল পোশাক, আবার কিছু হরলালকা থেকে কিনে আনা লুঙ্গি, সাবান, দেশলাই, চাল আলাদা করে রাখছে—সেসব নাকি মুক্তিযুদ্ধের জন্য!

সন্ধে হতে-না-হতেই প্রতিটি জানলার কাচে কালো কাগজ সাঁটা। নিতান্ত প্রয়োজনের বেশি ঘরে আলো জ্বালানোর নিয়ম নেই। নতুন নাম শুনছি 'ব্ল্যাক আউট'।

বাবা আর ঠাকুমা নিয়মিত রেডিও-র সামনে। ছেড়ে আসা বাস্তুভিটের স্মৃতিতে নিমজ্জিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জননী, আর পুত্র, 'পূর্ব পাকিস্তান' নামটির সঙ্গে সমস্ত সঞ্চিত অভিমানকে নতুন নামের পোশাক পরাচ্ছেন—বাংলাদেশ।

তা হলে 'ব্ল্যাক আউট', 'মুক্তিযুদ্ধ', 'বাংলাদেশ' কি সমার্থক? পরে জেনেছি, প্রথম দু'টি পথ, আর তৃতীয়টি গন্তব্য।

একদিন বাংলাদেশ স্বাধীন হল। 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' অমন সহজ-সরল বাংলায় আবার 'জাতীয় সংগীত' হয় নাকি! আমাদের 'জনগণ' শুনলে তো মনে হয় সংস্কৃত স্তোত্র।

মাঝে-মাঝে রেডিও-ঘোষকদের মোলায়েম অনুষ্ঠান ঘোষণার পর, প্রায় ঘড়ঘড়ে গলায় বক্তৃতা শুনি। এ চালা তো আমার চেনা, এ বলার ভঙ্গি আমার কত জ্যাঠা, পিসেদের গলায় শুনেছি।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা দেন ইংরেজিতে। তিনি নেহরু-র মেয়ে, কিন্তু গান্ধী কেন ওঁর পদবি—তা জানি না ভাল করে। ধবধবে ফরসা মেমসাহেবের মতো গায়ের রং, বালক মন কল্পনা করে নেয় যে, সাহেবরা দেশ ছেড়ে যাওয়ার আগে একজন ছোটচুল সুন্দরী গৌরবর্ণাকে রেখে গিয়েছিল আমাদের দেশ সামলাতে।

আর বাংলাদেশের যে-মানুষটা ঘড়ঘড়ে বাঙালে বাংলায় কথা বলে, ধুতি-পাঞ্জাবি, জওহর কোট, মোটা ফ্রেমের চশমায় যাকে প্রায় কোনও আত্মীয় মনে হয়—তাঁর নাম জানতে পারি—'বঙ্গবন্ধু' শেখ মুজিবর রহমান। 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটা নতুন ঠেকে। অভিধানে অর্থ খুঁজে পাই না।

'দেশবন্ধু' কথাটা আগে শুনেছি বটে। কিন্তু সে তো কেবল একটা কলেজ আর একটা পার্ক।

তবু 'বঙ্গবন্ধু-'কে আলাদা লাগে। তিনি বাংলায় বক্তৃতা দেন—রাষ্ট্রপ্রধানরাও বাংলা বলেন বুঝি?

তখনও complex sentence-এ ইংরেজি বলতে পারি না। বুঝি, রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে কথোপকথন কখনওই বুঝি হয়ে উঠবে না আমার!

'উত্তম-সুচিত্রা'র ছবিতে দিনকতক আর কারও মন নেই। সে জায়গাটা নিয়ে নিয়েছেন মুজিব-ইন্দিরা। যেন তাঁরাই নায়ক-নায়িকা। ইন্দিরা গান্ধীকে দেখলে মনে হয় রাশভারি, দাম্ভিক। তাঁকে টপকে কি আর 'বঙ্গবন্ধু'-র সঙ্গে কথা বলা হবে? হয়তো প্রথম বাক্যেই থামিয়ে দেবেন।

তারপর একদিন সিনেমার নায়কের থেকেও অনেক বেশি নাটকীয়ভাবে বাড়ির দেওয়ালে রক্তের পিচকারির দাগ রেখে চলে যান 'বঙ্গবন্ধু' শেখ মুজিবর রহমান।

আর, আমার আর কোনও প্রথম রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে বাংলা বলা হয় না এ জীবনের মতো।

১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

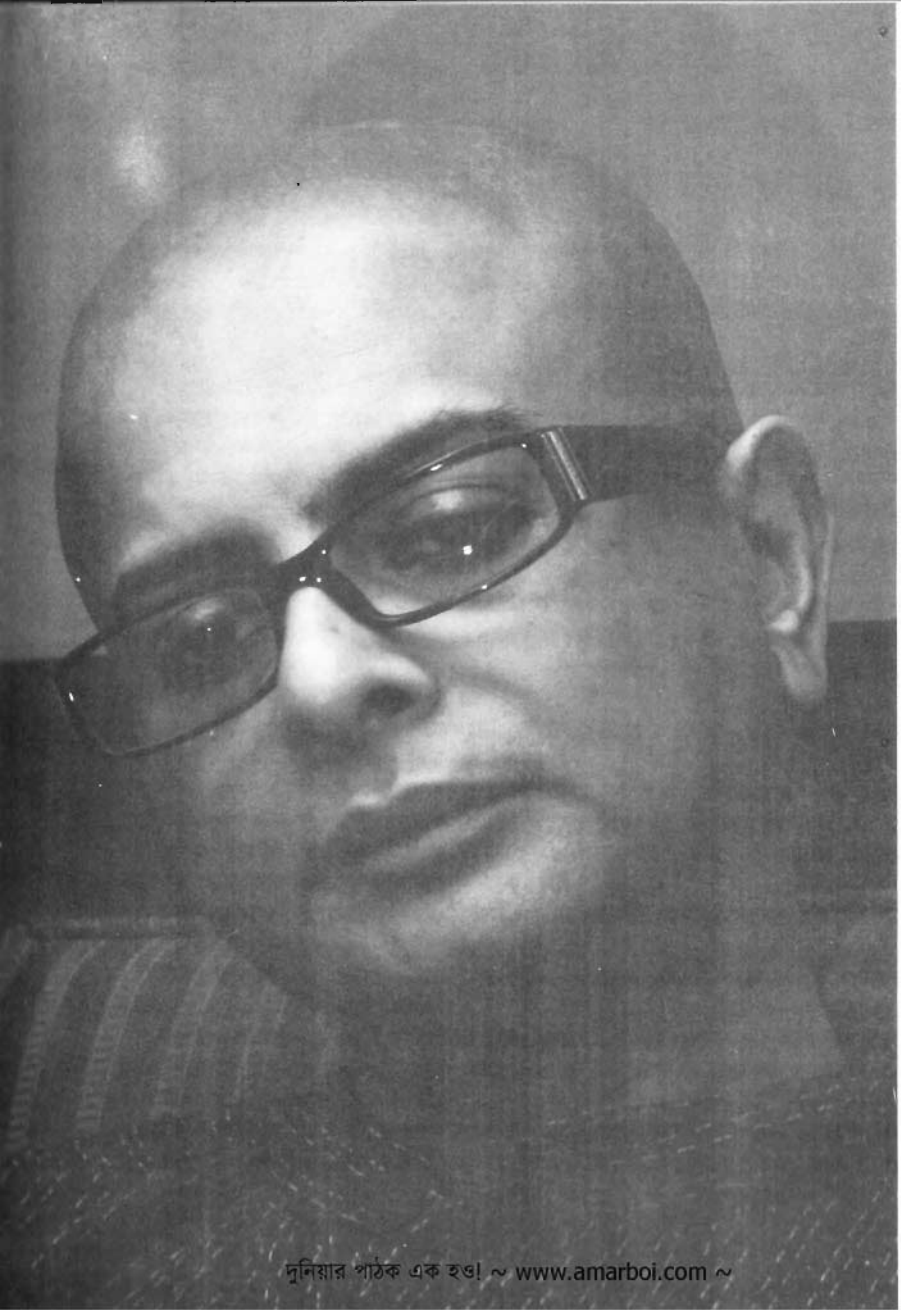

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝকঝকে মুক্তোর মতো দাঁতের ঝিরঝিরে স্নিগ্ধ যে দুখানি হাসি বাংলা ছবিকে অমর লাবণ্য দিয়ে এসেছে এতদিন, টেলিভিশনের কোনও টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের নিয়মিত চর্বিতচর্বণও যাদের অমলিন করতে পারেনি বাঙালি দর্শকের স্মৃতিপটে—তার একখানি যদি হয় বেণুদির (সুপ্রিয়া দেবী), অন্যটি তবে নিঃসন্দেহে শুভেন্দুদার।

দীর্ঘদেহী, শ্যামলা রং, অবিন্যস্ত চুল, সুকুমার মুখমণ্ডল আর ওই মায়াবী রৌদ্রস্নাত হাসি—শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় বললেই বাঙালির মনে এই সবকটি গুণের সম্মিলিত একটি ছবি বড় সযত্নে, পরম মমতায় মনে ভেসে ওঠে।

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় উত্তমকুমার নন। সৌমিত্রও নন। একজনের অমোঘ রোম্যান্টিক চুম্বক, অন্যজনের প্রখর লাবণ্য—দুটোই বোধহয় তোলা ছিল বাঙলা ছবির দুই মেরুর দুই নায়কের জন্য।

এই দুই মহানায়ক আমাদের মহাকাব্যের মহাপুরুষ রামের বৈভব দিয়েছেন, লক্ষণের শান্ত গরিমা আমরা খুঁজে পেয়েছি শুভেন্দুদার মধ্যে।

মহানায়কদের গগনচুম্বী চালচিত্রের মধ্যে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে থেকেও যে স্বকীয়তার সন্ধান দেওয়া যায়—শুভেন্দুদা তার এক সুনির্শ্চিত উদাহরণ।

দর্শক যেখানে নিজেই নিজের নায়ক হতে চান, চান তাঁর দৈনন্দিনতার প্রায় অদৃশ্য অনুপস্থিতিকে গৌরবময় করে রাখতে, তাঁর সেই স্বপ্নপূরণের সেতুই ছিলেন শুভেন্দুদা।

শিক্ষিত বাঙালি, শুভেন্দুদার মধ্যে দিয়ে নিজেদের দেখেছেন, তাঁর মাপকাঠিতে দাঁড়িয়ে জীবনকে অবলোকন করেছেন তার নানা বিচিত্র বৈভবে।

শুভেন্দুদা অভিনীত তিনটি ছবির কথা মনে পড়ছে। চৌরঙ্গী, বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা, অমৃতকুম্ভের সন্ধানে।

তিনটি ছবিতেই তিনি প্রথমপুরুষ ভাষ্যকার—যেন এক আত্মজৈবনিক পর্যবেক্ষক, নীরব দর্শক নায়ক।

ঘটনাক্রম তাঁর সামনে পর্দায় অভিনীত নাটকের মতো দ্রুতগতি এবং ক্রমপরিবর্তনশীল। সেই অভিজ্ঞতার সিংহদুয়ারে কখনও তিনি নতজানু, কখনও বা প্রেক্ষাপট তার অমোঘ অবধারিত আকর্ষণে তাঁকে মূল মঞ্চে টেনে নিয়েছে।

ঠিক যেভাবে চলন্ত মিনিবাসের জানলার বাইরের ক্রমধাবমান দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে কোনও এক অনির্দিষ্ট পথসঙ্গমে আমরা কোনও অজানিত কারণে যেন চুম্বকধাবিত হয়ে সেই বহির্জগতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে প্রবেশ করি, শুভেন্দুদাও তেমনই এক দর্শক সত্তা—যাঁর হাত ধরে বাঙালি তার জীবনের চিরন্তন চিরনূতনে পা রেখেছে বারবার।

কখনও পর্যটক, কখনও ভ্রমণলিপ্সু তীর্থযাত্রী, কখনও বা অজানা পাঁচতারা হোটেলজীবনের অদেখা জীবনের সাক্ষী এক মায়াচ্ছন্ন মধ্যবিত্ত যুবক—এই সবকিছুরই এক স্নিগ্ধ রুচিবান পুরুষপ্রতিমা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়।

উত্তম এবং সৌমিত্র যেখানে বাঙালি দর্শকজীবনে উৎপন্ন করেছিলেন রোম্যান্টিকতার মায়াজাল, বা পরিশীলিত মেধার সৌষ্ঠব—শুভেন্দু সেখানে বেঁচে থাকবেন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালি মননের অন্তরের আকর হয়ে।

নিজেকে দেখবার এই আয়না বাঙালি বহুদিন পর আবার হয়তো বা খুঁজে পেয়েছেন সব্যসাচী চক্রবর্তীর মধ্যে।

আমার সঙ্গে শুভেন্দুদার ব্যক্তিগত আলাপ তেমন প্রগাঢ় দীর্ঘস্থায়ী ছিল না কোনওদিন। ছিল এক সহজ উষ্ণ, আন্তরিক যোগাযোগ। ঋতু(ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত) এবং আমার নাম বিভ্রাটের নানা কাহিনি আছে। শুভেন্দুদা অভিভাবকোচিত স্নেহে তার একটা সহজ সমাধান করেছিলেন। ঋতুকে ডাকতেন 'আকার ওয়ালা' বলে আর আমাকে ডাকতেন 'আকার ছাড়া' বলে। ধীরে ধীরে ওঁর কাছে এদুটোই আমাদের নাম হয়ে গিয়েছিল।

আমার সঙ্গে শুভেন্দুদার একটাই কাজ—দহন। শুভেন্দুদা ছিলেন রমিতা অর্থাৎ ঋতুপর্ণার বাবা। আদালত চত্বরে ছোট্ট একটা দৃশ্য, হেঁটে যাওয়া ঝিনুক অর্থাৎ ইন্দ্রাণীর ট্যাক্সির জানলার সামনে শুভেন্দুদা একটি গ্লানিভারাক্রান্ত স্বীকারোক্তি করেন। দৃশ্যটি আজও আমার নিজের ছবির সামান্য কয়েকটি প্রিয় দৃশ্যের মধ্যে একটি। এবং তার অনেকটাই নিঃসন্দেহে শুভেন্দুদার নিষ্কলুষ আন্তরিক অন্তর্বচনের জন্য।

শুভেন্দুদার একটা সুন্দর সুগম্য সামাজিক প্রতিকৃতি ছিল। প্রায় যে কোনও অনুষ্ঠানেই এই সদালাপী মানুষটির সঙ্গে দেখা হয়ে যেত।

সাম্প্রতিক অসুস্থতার কারণে পরপর বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে শুভেন্দুদাকে দেখিনি। অপুকে (শাশ্বত) জিজ্ঞেস করতাম—বাবা কেমন আছেন রে? অপু যথারীতি অভিযোগ করত—আর বোলো না, নিজে ডাক্তার হলে যা হয়!...

এই প্রশ্নটিকে চিরনির্বাপিত করে চলে গেলেন শুভেন্দুদা।

কারণ আমরা জানি, যেখানে উনি আছেন সেখানে কেবল ভালই থাকা যায়।

ভাল থেকো শুভেন্দুদা। সবসময়ে ভালো থেকো তুমি।

১৫ জুলাই, ২০০৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্য লাস্ট লিয়র ছবিটা এখন শেষের দিকে। ডাবিং, মিউজিক ইত্যাদি শব্দায়নের স্তর পার হয়ে ধীরে ধীরে নির্মাণ সমাপ্তির দিকে এগোচ্ছে।

ফলে অধিকাংশ সময়টাই কাটছে মুম্বইতে—কলকাতার শ্রাবণ, বর্ষার জুঁইফুল, খিচুড়ি, ইলিশমাছ ভাজা বিরহিত হয়ে।

মধ্যে মুম্বই-কলকাতা করার ফাঁকে ফাঁকে রোববার-এর দপ্তরে এলাম একদিন। হাতে কিছুটা সময় নিয়ে। কাজও জমেছিল অনেক। মন দিয়েই কাজ করছিলাম।

হঠাৎ বন্ধু অভীক মুখোপাধ্যায়ের (আমার ছবির আলোকচিত্রীও বটে) একটা এসএমএস এল।

Bergman is no more...

চারটে মাত্র শব্দ। মোবাইল ফোনের অপরিসর পর্দায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র কয়েকটি অক্ষর। কিন্তু এত গভীর এত রুদ্ধশ্বাস যে তার আক্রমণ...আগে কখনও ভাবিনি।

কাজের ছন্দ কেটে গেল অবধারিতভাবেই। সামনে বসেছিল অনিন্দ্য। বললাম, নিজেকে না ওকে, জানি না—বার্গম্যান মারা গেছেন।

অনিন্দ্যর মুখটা পাংশু দেখাল। সেটা যে বার্গম্যান-এর জন্য নয় তখনও বুঝিনি। ওর কথাটা শুনে বুঝলাম

—ইস! চন্দ্রিলটাকে একটা ফোন করি।

আমিই ফোন করলাম চন্দ্রিলকে। আনন্দবাজারের দপ্তরে কিছুক্ষণ ফোন বেজে গেল। তারপর চন্দ্রিলের গলা পেলাম।

—চন্দ্রিল, ঋতুদা বলছি। বার্গম্যান মারা গেছেন।

—কখন?

—জানি না, একটু আগে খবর পেলাম।

কিছুক্ষণের নীরবতা। তারপর চন্দ্রিল অস্ফুটে বলল

—ইস্। গতবছর সুইডেন গেলাম। একবার যদি দেখা করে আসতাম।...

আমার মনে পড়ল আমি প্রথম যেবার জাপান যাই, তার এক সপ্তাহ আগে কুরাসোওয়া চলে গেছিলেন।

আমার জাপান যাওয়ার অর্ধেক আনন্দ চলে গেছিল সঙ্গে সঙ্গেই।

বিকেলবেলা জার্মান রেডিও থেকে ফোন করল, বার্গম্যানের তিরোধানে প্রতিক্রিয়া নিতে। যেটা মনে হচ্ছিল, সেটাই বললাম—ঈশ্বরের তো মৃত্যু হয় না। যিনি ঈশ্বরের মতোই বিরাজ করেন আমাদের ইন্দ্রিয়ে, আমাদের চেতনায় বা মননের প্রতিটি উত্তরণের ধাপে, তিনি মারা গেছেন, এ-কথা বলব কী করে?

মাঝে মাঝে মনে হয়, সত্যজিৎ রায় যেদিন চলে গেলেন চিরতরে কলকাতা ছেড়ে, সেদিন যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি অন্য শহরে থাকতাম, হয়তো অনেক বেশি শ্রেয় হত আমার জন্য।

একটি মহান মৃত্যুতে আষ্টেপৃষ্ঠে যখন একটা শহর জড়িয়ে পড়ে, তখন সেই মৃত্যুটা একটা ভয়াবহ শরীরী চেহারা নেয়।

যাঁর ছবি দেখে, ছবি করিয়ে হব ঠিক করেছি, খবরের কাগজের বিশদ খুঁটিনাটি বর্ণনা, টেলিভিশনের নিরন্তর ধারাবিবরণী কেমন করে যেন আমার সত্যজিৎ রায়কে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিল।

আমি নন্দনের শ্রদ্ধামিছিলেও যাইনি। শেষ যাত্রায়ও যাইনি। আমার মতো করে ছ'ফুট লম্বা মানুষটাকে আমার অন্তরের নিভৃততম সিন্দুকে চিরজীবন্ত করে রেখে দিতে চেয়েছিলাম সারাজীবন।

চারপাশের ভৌগোলিক সত্যগুলো কেমন করে যেন আমার সেই নিভৃত যোগাযোগটাকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছিল বারবার।

আমরা সকলেই নিজেদের মাপে অল্পবিস্তর চিন্তাভাবনা করতে হয়তো পারি, কিন্তু কেউই এত বড় দার্শনিক নই—যে মৃত্যুর মতো অমোঘ এক অন্তিমকে প্রত্যক্ষ করে রাখবার একটা দীর্ঘস্থায়ী বন্দোবস্তকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, কোনও একটা মৃত্যুসংবাদকে কেবলমাত্র জীবনপঞ্জীর একটা অনুজ্জ্বল স্মারকফলক হিসেবে শ্রদ্ধা করার ফাঁকে আসলে মনে মনে ঠিক করে ফেলব যে—আমার দেবতা চিরজীবিত।

বার্গম্যান সুইডেনে থাকতেন। সে দেশ আমি সিনেমায় ছাড়া দেখিনি। তিনি মারাও গেলেন সেই এক অদেখা দূরত্বের দেশে যেখানে সত্যিই তিনি জীবিত না প্রয়াত—সেটা কোনও জীবনীকারের তথ্যের বাইরে আর কোনও কাজে লাগে না।

পরেরদিন দুপুরবেলা মোবাইলে আবার অভীক। এবার আর এসএমএস নয়। সরাসরি ফোন—আন্তনিওনি আর নেই।

প্রথমেই বললাম—ইয়ার্কি মারিস না অভীক। বলল—আমিও শুনে এই কথাটাই বলেছিলাম। ইয়ার্কি নয় রে। হলে বোধহয় ভাল হত।

আগের দিনও সীমিত কয়েকজনের মধ্যেই এসএমএস চালাচালি হয়েছিল। আজও তাই হল। হালে মুম্বইতে কাজ করছিলাম বলে সেখানে কয়েকজনকে এসএমএস-এ জানালাম।

—Two greats in two days. Antinioni is no more.

নানাধরনের উত্তর এল। সবকটাই কিন্তু বলিউড-এর নানা মানুষের।

—Who's he? And who's the other one?

—Antinioni. You mean Banderas, the actor?

বুঝতে পারলাম পৃথিবী খুলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারটাও ভাঙছে। পিতার মৃত্যু সংবাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেওয়ার মতো সহোদর আর বেশি নেই চারপাশে।

কিংবা হয়তো ঈশ্বরেরা রূপ বদলাচ্ছেন—সম্ভবামি যুগে যুগে।

সন্ধেবেলা পরমের (ব্রত) কাছ থেকে একটা মেসেজ এল...

পৃথিবীর নিশ্চয়ই আজ আবার একটা বার্গম্যান, একটা আন্তনিওনি দরকার। ওঁরা যে চলে গেলেন, নিশ্চয়ই শিগগিরই আবার কোথাও জন্মাবেন বলে।

১২ আগস্ট, ২০০৭

দুটো মাত্র আবদার করার অবকাশ পেয়েছিলাম আমরা।

প্রথমবার তখন রোববার সবে হয়েছে। কনেচন্দন সংখ্যাটার প্রস্তুতি চলছে আমাদের।

অঙ্গরাগ হিসেবে চন্দনের ঐতিহ্যানুষঙ্গ নিয়ে কে লিখতে পারেন এ নিয়ে যখন অনিন্দ্য আর আমি মাথার চুল ছেঁড়াছেঁড়ি করছি, (তখনও আমার মাথায় চুল ছিল) হঠাৎ-ই মনে পড়ল কাঁকুলিয়া রোডের এই মৃদুভাষী সদালাপী মানুষটির কথা।

AMARBOI.COM

জ্যোতিভূষণ চাকী। আমি ডাকতাম জ্যোতিদা বলে।

অনুরোধ করা মাত্রই লেখা তৈরি হয়ে গেল। প্রভূত সংস্কৃত শ্লোকোদ্ধৃতি ছিল বলে সঙ্গে এল কয়েকটি বই, হাতের লেখা বুঝতে না পারলে যাতে অন্তত ছাপার অক্ষর থেকে মিলিয়ে নেওয়া যায়।

সংখ্যা বেরিয়ে গেল। বইগুলো দপ্তরে আমার ঘরের তাকেই পড়ে রইল।

পত্রিকার অফিস তো। দরকারে এক্ষুনি চাই। ফেরত দেওয়ার সময় অত দায়িত্ববান না হলেও চলে।

অতএব কোনও এক সময়ে বিস্মরণের ধুলো ঝেড়ে, কারুর একটা মনে পড়াতে আবার বড় অনাড়ম্বরে বইগুলো ফেরত গেল কাঁকুলিয়ার বাড়িতে।

তখনই বলেছিলাম

—জ্যোতিদা, বুড়োবয়স নিয়ে একটা লেখা লেখো না। তোমরা সবাই যদি লেখো, তাহলে সেই লেখা দিয়ে একটা নিয়মিত বিভাগ শুরু হতে পারে। তারপর পাঠকরাও লিখতে পারেন। বয়স্ক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষদের তো কথা বলার আছে কত, শোনার মানুষ কোথায় বল : রোববার শুনবে।

বলা বাহুল্য কেবল রোববার নয় আরও অনেক বরেণ্য বর্ষীয়ান অগ্রজদের বলেছিলাম।

উত্তরটা এসেছিল জ্যোতিদা'র কাছ থেকেই প্রথম। যদিও এটা সেভাবে তাঁর অ্যাকাডেমিক বিষয় নয় তবু, একবারের অনুরোধে কোন তাগিদে কখন যেন জ্যোতিদা লেখাটা শেষ করে ফেলেছেন।

কয়েকদিন মাত্র আগের কথা। পুরনো কাগজপত্র ঘাঁটতে গিয়ে জ্যোতিদা'র পোস্টকার্ডটা পেলাম।

লেখাটা হয়ে গিয়েছে, যদি সংগ্রহ করে নেওয়া যায়।

ভাবলাম, একটা ফোন করি। নয়, একদিন যাই। তার দিন দুয়েকের মাথায়ই কাগজে পড়লাম—জ্যোতিভূষণ চাকী প্রয়াত।

বার্ধক্যের সঙ্কেতটুকু এল। জ্যোতিদা'র বার্ধক্য আমার আর দেখা হল না।

মন্দাক্রান্তা ছন্দ কি করে অনুষ্টুপ-এর থেকে আলাদা, এই প্রশ্ন মনে এলে যে জ্যোতিদা'র কথাই মনে পড়ত অবধারিতভাবে কাঁকুলিয়া রোডের সেই সদালাপী, মিষ্টভাষী মানুষটা তারই কোনও একটা ছন্দ মূর্ছনাকে বেছে নিয়ে বুঝি তাকেই বাহন করে পাড়ি দিলেন কোন আলোকিত অমরায় যেখানে চিরতরুণরাই কেবল থাকেন চিরঞ্জীবী হয়ে।

যেখান থেকে বার্ধক্যের লেখা আর পাঠানো যায় না।

৬ এপ্রিল, ২০০৮

কলকাতা শহরের একটা আনুষ্ঠানিক জন্মতিথি আছে বটে, কিন্তু আমার কাছে আমার শহরের জন্মদিন বৈশাখ মাস।

সে মাসে নতুন বছর আসে।

সে মাসে প্রতিবছর নতুন করে জন্ম নেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সত্যজিৎ।

সে মাসটা কেমন করে যেন দাবদাহ, লোডশেডিং, পশ্চিমের ঝাঁ ঝাঁ করা রোদ নিয়ে আমার শহরকে আবার নতুন করে চিনিয়ে দেয় প্রতিবছর।

তাই এই সময়টা আমার মনে, আমার ইচ্ছেয় আমার শহরের জন্মদিন।

ইদানীং দেখতে পাচ্ছি আমার শহর কেমন যেন পাল্টে গিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার স্মৃতির শহর স্বপ্নের শহর, সমবেদনার শহর কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে অন্যরকম।

আমার শহরের বুকে একজন সত্তরবর্ষীয় বৃদ্ধ বাসের পিছনে ধাওয়া করতে গিয়ে প্রাণ হারান। আর গোটা রাস্তা জুড়ে সবাই নিষ্ক্রিয়, নিশ্চুপ, কৌতুকমগ্ন?

আমার শহর তো এমন ছিল না।

আমার শহরে ঝাঁ চকচকে রাস্তা ছিল না, অনেক ফ্লাইওভার, অতি-বড় শপিং মল ছিল না বটে—

কিন্তু নিন্দুকেও জানত আমার শহরের একটা প্রাণ আছে।

আজ কোন এক নতুন ধার করা জীবনের উত্তাপে সেই প্রাণের উষ্ণতাটুকু কোথায় হারিয়ে গেল?

আমরা যে প্রায় গায়ে পড়া ধরনের পরোপকারী—এই গ্রাম্য বদনাম নিয়েই তো বেশ বুক ফুলিয়ে বেঁচে ছিলাম এতদিন।

আজ অহংকার করার মতো মানুষগুলো ছবি হয়ে দেওয়ালে ঝুলছেন, আর এই বদনামটুকুও তো সম্বল রইল না আমাদের। তাহলে কী নিয়ে, কী আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকবে আমার শহর?

গায়িকা শিপ্রা বসু চলে গেলেন। একচিলতে খবর বেরুল কোনও হারিয়ে যাওয়া সংবাদপত্র কলমে।

কিন্তু রিয়া সেন আমার ছবিতে শুটিং করে গেল—তাকে নিয়ে তো কম মাতামাতি দেখলাম না।

উৎকর্ষ এবং জনপ্রিয়তা—দুটোকেই পাশাপাশি নিজের জায়গায় রেখে চিনতে পারত আমার শহর। জানত কোনটা উচ্ছ্বসিত কলরব, আর কোনটা বিমূর্ত সাধুবাদ।

এবারের নব বৈশাখে কি সেই দৃষ্টিশক্তি চিরতরে আচ্ছন্ন হল?

অনেক বছর আগে দূরদর্শনে দোলের একটা অনুষ্ঠানে শিপ্রাদির গান শুনেছিলাম। বড় মায়াময় সে গান

আজ কি আনন্দ

ঝুলত ঝুলনে শ্যামর চন্দ।

সেই শিপ্রাদি আজ নেই। সত্যিই যেন কারওর মধ্যেই নেই।

কোনও শোকপ্রকাশ কোনও স্মৃতিচারণা কোনও কিছুর মধ্যে দিয়েই শিপ্রাদিকে খুঁজে পাওয়ার আর কোনও উপায় নেই।

কেন?

শহরে আই পি এল হচ্ছে বলে? শাহরুখ খান আসছে বলে?

আমার যে শহর, যে সুদূর প্রত্যন্তের প্রবাসেও আমার ভেতরে বাস করে সদাজাগ্রত, তাকে তো এ হ্যাংলামি মানায় না।

মৃত্যু অনেক মানুষকে মহান করে দিয়েছে আমার শহরে।

আমার শহর আমাকে শিখিয়েছে মৃত্যুহীন প্রাণ কাকে বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ কি আমার শহর আর কোনওদিন শুনতে পাবে না প্রাণের সঙ্গীত?
প্রবল রৌদ্রে, কলকাতার অলিতে গলিতে শিপ্রাদির কিন্নরীকণ্ঠ গেয়ে গেয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে আজ কি আনন্দ!...
আর আমরা কেউ সেটা বুঝতেও পারব না?
সেই আনন্দের স্বাদ পাবে না আমার এই আনন্দনগরী?
যাঃ! আমি নিশ্চয়ই দুঃস্বপ্ন দেখছি।

১১ মে, ২০০৮

ইদানীং আমার কলকাতার বাইরে যেতে, বিশেষ করে মুম্বই যেতে, কেমন যেন ভয় করে। ফিরে এসে সব ঠিকঠাক দেখব তো!

গত সপ্তাহের মাঝামাঝি আমার প্যারিস যাওয়ার কথা ছিল দিন কয়েকের জন্য। ওখানে একটা ফরাসি চলচ্চিত্রোৎসবে 'দ্য লাস্ট লিয়র' দেখানো হচ্ছিল। বাবার শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছিল না, তাই শেষ মুহূর্তে যাওয়া বাতিল করে দিলাম।

হঠাৎ তারই মধ্যে খবর এল মুম্বইয়ের একটা ফিল্ম পত্রিকার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে 'দ্য লাস্ট লিয়র'কে ইংরেজি ভাষায় শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ছবির পুরস্কার দিচ্ছে।

ভুজুং ভাজুং দিয়ে প্যারিসটা কাটিয়ে দিয়েছিলাম। প্রযোজকরা এবার একটু নাছোড়বান্দা হলেন।

মুম্বই গিয়ে পৌঁছোলাম বুধবার সকালে।

একটু পরেই কলকাতা থেকে বন্ধুবান্ধবদের এসএমএস পৌঁছলো—নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায় নেই।

মোবাইল স্ক্রিনে রোমান হরফে নব্যেন্দুদার নামটার মধ্যেই তার অনেক স্নেহ, অনেক উদগ্রীব কুশল সমাচার যেন মিশরীয় চিত্র হস্তলিপির মতো ফুটে উঠল।

আর এই সময়গুলো ভিন শহরে এত বেশি একা লাগে! নিজে বুঝতে পারলাম একরকম ভাবে অভিভাবকহীন হলাম, সেটা আর কাউকে বোঝাবই বা কী করে।

সন্ধ্যার অনুষ্ঠান শেষ হতে বেশ রাতই হল।

পরেরদিন সকালবেলা ফোন খুলতেই বুম্বার এসএমএস

—তপনদা আর নেই।

আমি যেন হতভম্ব। প্রথমটায় বিশ্বাস করিনি। বুম্বা না হয়ে অন্য কেউ পাঠালে ভাবতাম কেউ ঠাট্টা করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক যেমন পরপর দু'দিন বার্গম্যান আর আন্তনিওনির প্রয়াণ সংবাদে মনে হয়েছিল।

বুম্বার ফোন এল

—পারলে ইউসুফ সাবকে (দিলীপ কুমার) একটা ফোন করিস।

চেনাজানা যাদের যাদের পারলাম খবর দিলাম। জয়াদি, শাবানাদি, নন্দিতা—সবাই কোনও না কোনও সময় তপনদার সহকর্মী। ওয়াহিদা রেহমান, সায়রা বানু, দিলীপকুমার, বৈজয়ন্তীমালাকে খবর দিতে পারলাম না।

সময় কেমন করে যেন এই কিন্নর কিন্নরীদের বড় দূরবর্তী করে দিয়েছে।

ফেরার পথে প্লেনের ঘোষণায় ঘুম ভাঙল। কলকাতা এসে গিয়েছে—একটু পরে ল্যান্ডিং।

জানলার বাইরে শহরের আলো ঝিলমিল করছে। কিছুটা দেখা যাচ্ছে, কিছুটা বা অস্পষ্ট।

অচিরেই ঘোষণা এল আবার

—ভিজিবিলিটি একটু খারাপ। ফলে আকাশপথে চক্কর মারতে হবে হয়তো বা কিছুক্ষণ।

সহযাত্রীদের মধ্যে থেকে একটা সম্মিলিত অধৈর্য ক্ষোভের আওয়াজ ভেসে এল।

আর আমি যেন সর্বজ্ঞর মতো বুঝতে পারলাম যে এ যেন হওয়ারই ছিল।

নীচে ছড়িয়ে থাকা আমার আলো ঝিলমিলে শহর আসলে যে নিষ্প্রদীপ।

এক ঝটকায় শহরের দু-দু'টো আলোকবর্তিকা নিভে গিয়েছে।

অন্ধকার হয়ে গিয়েছে কলকাতা। তাই পথ চিনে ফিরতে আমাদের আরও অনেক দেরি হবে।

২৫ জানুয়ারি, ২০০৯

সত্যিই নিরুদ্দেশ কাকে বলে? কখন হঠাৎ করে নিখোঁজ হয়ে যায় কেউ? ...স্পষ্ট করে বুঝতেও পারি না সেটা অনেকসময়।

কাউকে বিদায় দেওয়ার জন্য মনকে প্রস্তুত করি, দরজায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়ি আর মনে ভাবি—এই শেষবার...

তারপরেও, যে মানুষটা হেঁটে চলে যায় পিছন ফিরে, আর সেই চলে যাওয়া লুকিয়ে অনুসরণ করে খড়খড়ি ফাঁকে রাখা আমাদের চোখ, তখনও কি সম্পূর্ণ বিদায় দেওয়া হয় সেই মানুষটাকে?

আর যদি বলা নেই, কওয়া নেই—হঠাৎ করে, সত্যিই একদিন আর ফিরে না আসে ঘর থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেরনো একটা মানুষ; তার বদলে বাড়ি আসে ফুলে চন্দনে সাজানো সাদাকাপড়ের পোশাকের সাজ—তখন কি মনে হয় না, কোথায় নিরুদ্দেশ হল মানুষটা? কী করে কোনও খবর না দিয়ে হারিয়ে যেতে পারল এমন চিরতরে?

আমাদের অভিনেতা বন্ধু কুণাল মিত্র, আমরা অনেকেই বাসব বলে ডাকতাম, এমন হুট করেই নিরুদ্দেশ হয়েছে সম্প্রতি।

অনেককে এমন করে ধন্দে ফেলে, চুপিচুপি পা টিপে কখন বেরিয়ে গিয়েছে আমাদের স্টুডিও চত্বর ছেড়ে! হয়তো বা টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো থেকে ট্রেন ধরেছে কোনও দিকশূন্যপুরের—আমরা কেউ জানি না।

ও যে আর ফিরবে না, আমরা জানি। হয়তো ও-ও জানত, কাউকে বলেনি।

নিরুদ্দেশের প্রতি যে বিজ্ঞপ্তি সাধারণত ছাপা হতে দেখি, তাতে লেখা থাকে—তাড়াতাড়ি ফিরে এসো, মা খুব অসুস্থ।

আমরা বিজ্ঞপ্তি ছাপিনি। কিন্তু আমরা, আমরা যারা সিনেমা-টেলিভিশনে কাজ করি, আমরা যারা কুণাল মিত্রকে বাসব বলে ডাকি, আমাদের যাদের গলায় কাছে ব্যথা করা একটা রাগ হচ্ছে, স্মরণসভায় ওর হাসিমুখ ছবিটার দিকে তাকালেই—আমরা একটা কথাই বলতে চাই সেই নিরুদ্দেশ মানুষটাকে,

—তুই বড় স্বার্থপর রে বাসব! নিজে কেমন বেড়াতে চলে গেলি। আমরা যে সারাজীবন তোকে গালাগাল দেব আর স্টুডিও চত্বরে সবাই মিলে কোনও কিছু প্ল্যান করলেই তোর নামটা লিখব, জেনে যে সেটা কেটে দিতে হবে—সেটা কই ভাবলি না তো একবার!

৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯

বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ড পুড়ে যাওয়ার খবরটা শুনে ঠিক এইরকমটাই মনে হয়েছিল।

এমন নয়, যে রোজ সেখানে যাচ্ছি, নিয়মিত ঘাঁটাঘাঁটি করছি কলকাতা শহরের অগণিত দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্রলিপি। তবু কেবল এই বাড়িটা আছে জেনেই, তার বিশাল জাদুঘর সম্ভার নিয়ে কলকাতা শহরের বিবর্তন সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জেনেই বড় নিশ্চিন্ত লাগত।

ছোটবেলায়, তখন সবে সবে সিনেমায় আগ্রহ হয়েছে, খবর আসত যে সত্যজিৎ পিরিয়ড ছবি করার সময় নিয়মিত হানা দিতেন বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ড-এ। সেখান থেকেই নাকি উঠে এসেছিল 'চারুলতা'র অমলের চুলের সিঁথি, বা ভূপতির বসবার ঘরের দেওয়াল কাগজ নকশা।

আর, মনে মনে স্বপ্ন দেখতাম—সত্যিই যদি কখনও সেই সময়ের কলকাতা নিয়ে ছবি করি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা অমূল্য কোষাগার আমার হেফাজতে রইল।

রইল না যে শেষ অবধি, সেটা বুঝেছিলাম অগ্নিকাণ্ডের খবরটার পর। কলকাতার ইতিহাসপুরুষ যেন এক নিমেষে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পাড়ি দিলেন কোন সুদূর অলীকে।

রামকুমারদা চলে গিয়েছেন—এই খবরটা আবার বহুদিন পর সেই অভিঘাতটা নিয়ে এল।

জানি, যাওয়ার বয়স হয়েছিল। জানি আজ না হলে কাল হয়তো যেতেন—তবু দাদু ঠাকুমার সত্যিই কি কোনও চলে যাওয়া আছে?

বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ড যদি হয় দৃশ্য কলকাতা, রামকুমারদা তবে নিশ্চয়ই শ্রবণের কলকাতা।

যে কলকাতায় ঘোড়ার খুরের আওয়াজের সঙ্গে মিশে আছে ভোরের প্রথম ট্রাম, যেখানে জিলিপি ভাজার ছ্যাঁ-কলকলের সঙ্গে জুড়ে আছে ঘুঙুরের বোল।

তনুদা (তরুণ মজুমদার) বেশ কয়েক বছর আগে নিধুবাবুর জীবন নিয়ে একটা ছবি করেছিলেন। তাতে নিধুবাবুর গানগুলো আমরা শুনেছি রামকুমারদার গলায়।

আজ কেমন করে যেন তনুদা'র ছবির সেই নামটা জুড়ে গেল এক সদ্যপ্রয়াত কিংবদন্তির সঙ্গে।

'অমরগিতি'র পাখায় ভর দিয়ে রামকুমারদা পৌঁছে গেলেন অমরাবতীর দিকে।

যেখানে দেবসভার গন্ধর্বরা আজ থেকে একটা নতুন গান শুনবেন।

পুরাতনী বাংলা গান।

২৯ মার্চ, ২০০৯

AMARBOI.COM

অনেকদিন লাগল ব্যাপারটা থিতু হতে মনের মধ্যে। মানুষটা সত্যিই আর নেই।

এতদিন টেলিভিশনের নানা চ্যানেল-এর মুহুর্মুহু আরোগ্য বুলেটিন, সংকটের পরিমাপ নিয়ে ঘন ঘন শঙ্কা স্বস্তির দোলাচল! একবার মনে হচ্ছে আরোগ্যপ্রার্থনাও কি এখন এই রোগাতুর ছিয়ানব্বই বর্ষীয়র জন্য বেদনার? কোনও পিছু-ডাকাই কি এবার কেবল যন্ত্রণার পিছুটান?

ঠিক বাড়ির কেউ অসুস্থ হলে যেমন উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা নিয়ে কালযাপন করি আমরা, জানুয়ারি মাসের প্রথম সতেরোটা দিন তেমনই কেটেছে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গবাসীর—পার্টি, ধর্ম নির্বিশেষে।

আমরা, যারা বড় হয়েছি লোডশেডিংকে 'জ্যোতিবাবু' বলে ঠাট্টা করে, নানা সময় ওঁর কেবল সর্বনামভিত্তিক বক্তৃতা নিয়ে কৌতুকবোধও করেছি সময় সময়—আমরা সবাই যেন কোথাও অজানিতভাবেও জানতাম যে আমাদের একজন সার্বজনীন অভিভাবক আছেন, তাঁর নাম জ্যোতি বসু।

সেদিন বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে একটা বড় হোর্ডিং চোখে পড়ল Long live Jyati Basu।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতদিনের এত সংবাদপত্রে কলাম সেন্টিমিটারের কাড়াকাড়ি, টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর ধাক্কাধাক্কির মধ্যে যে সারসত্যটা কোথাও যেন প্রবেশ করছিল না মনের ভেতর, বা মনই বুঝি বাধা দিচ্ছিল কোনও চূড়ান্ত অশুভর ইঙ্গিত, সকালবেলার নির্মল রোদে কলকাতা শহরের গাড়িঘোড়ার ভিড়ের মধ্যে ওই একটা হোর্ডিং যেন কেমনভাবে বলে দিল—সত্যিই আমরা অভিভাবকহীন। এখন যেন রাজ্য জুড়ে গুরুদশার সময়।

কোনও একটা চ্যানেল নাকি এই মৃত্যুকে—sudden demise হিসেবে বলেছে। সেটা নিয়ে ঠাট্টা করছিল আমার এক বন্ধু। ছিয়ানব্বই-ঊর্ধ্ব এক মানুষের সতেরো দিনের মরণসংগ্রাম কী করে 'sudden' বা অকস্মাৎ হতে পারে তাই নিয়ে। আমার মনে হল ব্যাকরণগতভাবে হয়তো এর মধ্যে একটি খুঁজলেও খোঁজা যায়। কিন্তু যে কোনও ঘনিষ্ঠ অভিভাবকের মৃত্যু যে কোনও বয়সে গিয়েই অকালমৃত্যু! সে আয়ুঃসীমা কি বয়স দিয়ে হয়, না আবেগ দিয়ে হয়, আমি জানি না।

শতবার্ষিকী পার করার পরও আমরা কি সত্যিই আজও মনে মনে বিশ্বাস করতে ভালবাসি না, যে নেতাজি আজও বেঁচে আছেন?

ধর্মীয় বিশ্বাস বা মার্কসীয় নীতির বাইরেও আত্মা বলে যদি কিছু থাকে, শ্রীজ্যোতি বসুর সেই আত্মার চিরন্তন শান্তিকামনায়।

৩১ জানুয়ারি, ২০১০

AMARBOI.COM

রাঙা নামটার সঙ্গে আমরা অনেক কিছুকে লেপ্টে নিই।

গৌরবর্ণ, রক্তিম, বা মাঝে মাঝে নবীনও।

এ তো গেল অভিধানের কথা।

আমাদের বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির যে একটা নিজস্ব অভিধান আছে, যেখানে 'ফুটেজ খাওয়া' মানে 'অহেতুক সময় নেওয়া', বা 'কাট টু' মানে 'এরপর'—সেখানে 'রাঙা' বলতে আমরা একজনকেই বুঝতাম—অভিনেতা-পরিচালক দিলীপ রায়।

দিলীপ রায়ের ডাকনাম 'রাঙা'। গোটা ইন্ডাস্ট্রি তাঁকে হয় 'রাঙা' বা 'রাঙাদা' বলে ডাকত। আমার ব্যক্তিগত ভাবে কেমন যেন 'রাঙা' নামটা এত পছন্দ ছিল, যে, আসিনেমাজীবন রাঙাকে রাঙা বলেই ডেকেছি।

মধ্যে অনেকদিন ধরে ভুগছিলেন রাঙা। ছোটবেলায় দেখা সেই দর্পী চেহারা, সেই মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বর ধীরে-ধীরে ম্লান হয়ে আসছিল।

সাম্প্রতিক কোনও একটা অনুষ্ঠানে কোথায়, মনে নেই, আমরা অনেকেই মঞ্চে। আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনের সারিতে বসে রাঙা। অনেকের সঙ্গে বহুদিন বাদে দেখা। আর সামনে বসে আছেন বলে রাঙা দেখতেও পাচ্ছেন না আমায়। আলতো করে পিঠে হাত রেখে বললাম—রাঙা, কেমন আছো?

আদ্দির পাঞ্জাবির ভিতর দিয়ে হাড় জিরজিরে পিঠ। কোথায় সেই 'ঝিন্দের বন্দী'-র, 'হাঁসুলি বাকের উপকথা'-র উজ্জ্বল নায়ক।

গত ২ সেপ্টেম্বর আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন রাঙা।

এমন এক পৃথিবীতে যেখানে কোনও জরা নেই, ক্ষয় নেই, কালিমা নেই।

যা কেবল চিরগৌরদের রক্তিম পৃথিবী। যেখানে কেবল চিরনবীনদের অধিকার।

চরৈবেতি।

১২ সেপ্টেম্বর, ২০১০

কোনও একজন সাংবাদিক সেদিন সাক্ষাৎকার নিতে এসে বলছিলেন,

—কোনও এক সময় একটা সাক্ষাৎকারে আপনি বলেছিলেন যে, কোনওদিন ক্যামেরার সামনে আসবেন না। তা হলে?

আমার ঠিক মনে পড়ল না যে কবে, কোথায় এমনটি বলেছিলাম, তবে মনে হল এটা আমার চেনা গলা—সত্যিই কোনওদিন ভাবিওনি যে ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়াবার সাহস বা ইচ্ছে আমার কোনওদিন হবে।

তারপরেও কেন সংকল্প ভাঙলাম?

জানি না। একজন মানুষ কি তার ভিতর থেকে অনেকগুলো মানুষকে খুঁড়ে বের করতে চায়? যার মাপ কেবল স্বাচ্ছন্দ্য, সাফল্য, যশ আর প্রতিষ্ঠার বাইরে? দিব্যি তো ছিলাম পরিচালক-সম্পাদক হয়ে। জগৎ সংসারের কাছে সেটাই তো ছিল আমার উজ্জ্বল পরিচয়। তবে কেন? কোন অনিবার্য ইচ্ছে থেকে ক্যামেরার দিক পরিবর্তন করলাম?

আমরা বোধহয় প্রত্যহ নিজেদের ভাঙি-গড়ি। মুছে ফেলি পুরনো শপথবাক্য, তার ওপরে অজান্তে রাখি ভঙ্গুর প্রতিজ্ঞা। তারপর সেটাকেই সম্বল করে পথ চলি।

অভিনেতা ঋতুপর্ণকে ধীরে-ধীরে কলকাতার মানুষ মেনে নিচ্ছেন। অজস্র 'এসএমএস' আর 'ফেসবুক মেসেজ' থেকে অন্তত সেটাই তো মনে হচ্ছে।

প্রিয় কয়েকজন, যাঁরা আমার অভিনয়ের কাজ দেখে সৎভাবে আমার মূল্যায়ন করতেন—তাঁদের কেউ-কেউ 'আরেকটি প্রেমের গল্প' দেখেছেন। অনেকেই দেখেননি।

এই গোত্রের একজন মানুষ আর কোনওদিন ছবিটা দেখবেন না। জানবই না অভিনেতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঋতুপর্ণকে তাঁর কিছু বলার থাকত কি না। রমাদা।

হ্যাঁ, আমি রমাপ্রসাদ বণিকের কথা বলছি। নাটককার, পরিচালক, এবং অতি সুদক্ষ অভিনেতা রমাদা চলে গেলেন কেমন যেন পাশের ঘরে যাওয়ার মতো করে। আত্মা যদি সত্যিই অবিনশ্বর হয়, তা হলে রমাদার সেই আত্মার প্রতি প্রণাম জানাই।

৯ জানুয়ারি, ২০১১

নতুন ইংরেজি বছর যে কী-কী নিয়ে আসবে, বলতে পারছি না।

তবে নিয়ে যে যাচ্ছে একের পর এক, সেটা দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে। যে-সংখ্যাটা পরম বেদনায় নানা সুধীজনের রচনা সংগ্রহ করে রমাদা'র (রমাপ্রসাদ বণিক) স্মৃতিসংখ্যা হয়ে উঠছিল, তারই 'ফার্স্ট পার্সন' লিখতে গিয়ে আরেক পরম শূন্যতা। সুচিত্রাদি চলে গেলেন।

সুচিত্রাদির সঙ্গে নানা মানুষের নানা সম্পর্ক। আনন্দ, শ্রদ্ধা, বিস্ময়ের। কিন্তু প্রধানত তার সূত্রটা সংগীত।

আমার সঙ্গে সুচিত্রাদির সম্পর্কটা সামান্য আলাদা। যাঁরা 'দহন' দেখেছেন, বুঝতে পারবেন।

আমি বিশেষভাবে ভারাক্রান্ত। নিয়মমাফিক শেষ দেখা করতেও যাইনি। জানতাম, সুচিত্রাদি ভাল নেই। বেশিদিন আর থাকবেন না আমাদের মধ্যে। তা, সে তো বাবা-মা'র বেলায়ও জানতাম। অনুষ্ঠানের অনুশাসন শোককে দার্ঢ্য দেয়।

আমি আমার মতো করেই আমার শোকের সঙ্গে আছি। বাবা, মা, সুচিত্রাদি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে।

খুব ভাল থেকো কৃষ্ণকলি। অনেক আদর নিও।

১৬ জানুয়ারি, ২০১১

চিদানন্দ দাশগুপ্ত চলে গেলেন।

চিদানন্দ দাশগুপ্ত'কে আমরা যে-বয়সে চিনতে শিখেছি, ততদিনে তাঁর কন্যা অপর্ণা সেন আমাদের প্রিয় নায়িকা। এবং সাধারণ বাঙালির কাছে অনেক জনপ্রিয়ও বটে।

অর্থাৎ, চিদানন্দ দাশগুপ্ত-র পরিচয় আমাদের কাছে প্রথমে ছিল অপর্ণ সেনের বাবা। তারপর ধীরে ধীরে জেনেছি যে, তিনি একজন মস্ত পণ্ডিত মানুষ।

এটা নেহাতই কৈশোর ও তারুণ্যের সন্ধিক্ষণে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখনও সত্যজিৎ রায়-কে চিনি 'গুপি গাইন বাঘা বাইন' দিয়েই। মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক কেবল কতগুলো নাম মাত্র।

স্কুল শেষ হওয়ার মুখে ধীরে ধীরে এই নামগুলো নানারকম সাদা-কালো ছবির বিস্তার হয়ে আস্তে আস্তে মনের মধ্যে ঢুকতে আরম্ভ করেছে। যার পাশাপাশি নায়িকা অপর্ণা সেন-এর ধীরে ধীরে ফিকে হওয়ার পালা।

সেই সময় একদিন দূরদর্শন-এর পর্দায় চিদানন্দ দাশগুপ্ত-কে প্রথম দেখলাম—কোনও একটা চলচ্চিত্র-সংক্রান্ত আলোচনায়।

তারপরই দূরদর্শন দেখাল 'বিলেত ফেরৎ'—চিদানন্দ দাশগুপ্ত-র ছবি।

ব্যস। অপর্ণা সেনের বাবা থেকে কখন যেন তিনি আমারও সিনেমাতুতো আত্মীয় হয়ে গেলেন।

দূরদর্শনের পর্দায় চিদানন্দ দাশগুপ্ত-র সঙ্গে চাক্ষুস পরিচয়ের বেশ কয়েক বছর পর রীণাদির (অপর্ণা সেন তখন আর কেবল বাণিজ্যিক নায়িকা নন, বিদগ্ধ মননশীল চলচ্চিত্রকারও বটে) বাড়িতে মেসোমশাইয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হল।

মাসিমা (সুপ্রিয়া দাশগুপ্ত) স্বাভাবিকভাবেই ছিলেন মাতৃসমা, স্নেহপ্রবণা। মেসোমশাইয়ের স্নেহটুকু কোথায় যেন বৈদগ্ধ্যের শক্ত জমির নীচে বহতা ফল্গুধারার মতো স্নিগ্ধভাবে স্পর্শ করা যেত। মেসোমশাইয়ের সঙ্গে আলাপচারিতায় কখনও মনে হয়নি যে একজন পণ্ডিত মানুষের সঙ্গে কথা বলছি—এমনই সহজ, সরল ছিল তাঁর উজ্জ্বল কথোপকথন।

তারপর 'আমোদিনী'। তখন সবে 'উনিশে-এপ্রিল'-এর শুটিং শেষ হয়েছে। মেসোমশাই, মাসিমা এবং দুলালদা (দুলাল দে) বহরমপুরে। আমি এবং বন্ধু দেবব্রত দত্ত গিয়ে পৌঁছলাম মেসোমশাইয়ের সঙ্গে লোকেশন দেখতে।

মেসোমশাই লোকেশন দেখছেন, আর আমি শিখছি কী করে লোকেশন দেখতে হয়।

মেসোমশাই-মাসিমার শান্তিনিকেতনের বাড়িটা ছিল একটা সুসজ্জিত গ্রন্থাগার। একবার গিয়ে তিন-চারদিন ছিলাম ওখানে—রীণাদি তখন বিদেশে, কল্যাণদার কাছে।

ফিরে এসেছিলাম এক অদ্ভুত শান্তির, অনুভূতি নিয়ে। আর কীভাবে যেন এটাও বুঝেছিলাম, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একমাত্র বিশ্বস্ত সঙ্গী কেবল বই-ই হতে পারে।

মেসোমশাইয়ের কাছে কী শিখেছি, জানি না। কিন্তু এক শান্ত সৌম্য প্রসন্নতা দেখেছি মানুষটার মধ্যে, সেটা অধরাই থাক। মেসোমশাই চলে গিয়েছেন—এটা জাগতিক সত্য। মেসোমশাই থেকে যাবেন আজীবন—এটা অন্তর বলছে।

ঠিক যেমন করে বাবা-মা'রা থেকে যান চিরকাল।

৫ জুন, ২০১১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিদম্পতি সুবোধ সরকার আর মল্লিকা সেনগুপ্ত আমাদের কাছে অভিন্ন ছিল। সুবোধ-মল্লিকা থেকে আদরের ঠাট্টায় বন্ধুরা ওদের 'সুবোধ-মল্লিক স্কোয়ার' বলে ডাকতাম।

ওরা জানত সেই ঠাট্টার সোহাগ। ফলে, পরে একটা কবিতার বই বের করেছিল, দু'জনের কবিতা নিয়ে—নাম দিয়েছিল 'সুবোধ-মল্লিকা স্কোয়ার'। ঘটনাচক্রে বইটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কীভাবে যেন আমি জড়িত ছিলাম—এখন আর মনে নেই।

মল্লিকা চলে গেল। দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করেছিল—কিন্তু The Emperor of all Maladies তাকে নিষ্কৃতি দিল না। আশ্চর্য এই যে, মল্লিকা যখন অন্তিম শয্যায়—আমি সে দুঃসংবাদ জানিও না, আমি তারিয়ে-তারিয়ে পড়ছি ওরই সাম্প্রতিক বই 'কবির বউঠান'। বইটি উৎসর্গ করেছিল—রোগশয্যার বন্ধুদের। ফলে কেন যেন ধরেই নিয়েছিলাম, এখন নিশ্চয়ই মল্লিকা কিছুটা সুস্থ।

পরে, সুবোধের সঙ্গে যখন কথা হল ও বলল যে, মল্লিকা চেয়েছিল আমার কাছে বইটির এক কপি পৌঁছে দিতে। সুবোধ, সেই অসহায় সময় আর সেটা পেরে ওঠেনি।

তবে মল্লিকার ইচ্ছেটা কোথাও কোনও অলৌকিকতায় সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল যেন আমার মধ্যে, আমি নিজেই কিনে এনেছিলাম বইটা।

সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার হয়তো এখন একটা ভাঙা ত্রিভুজ। যার একটা খণ্ডে বিরহ আর বেঁচে থাকা নিয়ে সুবোধ লড়াই করছে, তার পুত্রকে সম্বল করে।

আর অন্য ত্রিভুজকে জুড়ে ছড়িয়ে আছে মল্লিকার সুরভিত আঘ্রাণ, বন্ধু এবং কবিতা-পাঠকদের কাছে যা চিরকালীন অমলিন।

১২ জুন, ২০১১

এরকম এক-একটা সময় যায়। এক-এক করে সাধের মানুষগুলো চলে যান আমাদের ছেড়ে, যেন প্রায় চুক্তি করে নিজেদের মধ্যে। আমার 'ফার্স্ট পার্সন'-এর পাতাটা, ভয় হয়, এবার থেকে হয়তো অবিচুয়ারি-র পাতা হয়ে যাবে।

আগেও ঘটেছে কয়েকবার। আবার ঘটল।

চিদানন্দ দাশগুপ্ত, মল্লিকা সেনগুপ্ত আমার সপ্তাহ অধিকার করেছিলেন। এবার মকবুল ফিদা হুসেন।

রবীন্দ্রনাথ নামটা করলেই যেমন শুভ্রকেশ ও দাড়ি এবং ওঁর বিখ্যাত জোব্বাটির কথা মনে পড়ে, যদিও প্রায় অহরহ তাঁর কৃষ্ণকেশ যৌবনের নানা ছবিই আমরা দেখেছি, তেমনই হুসেনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বলতে মনে পড়ে সাদা লম্বা চুল, সাদা দাড়ি, সাদা কুর্তা-পাজামা এবং খালি পা।

হুসেনকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম বলব না। তবে একটা নিবিড় পরিচয়ের বন্ধন ছিল—যতবারই দেখা হয়েছে—ওঁর আমাকে চিনতে ভুল হয়নি কখনও।

চিত্রশিল্পের দেবীও যদি সরস্বতী হন, তবে নিঃসন্দেহে তাঁর অত্যন্ত প্রিয় অধিষ্ঠান-স্থল ছিল হুসেনের আঙুল। হুসেন কোনও চিত্রশিক্ষা বিদ্যালয়ে যাননি কোনওদিন। কিন্তু চিত্রশিল্পের এক মহাবিদ্যালয় ছিলেন তিনি নিজে।

অনেক পটুয়া, মূর্তিকারও সেরুঅর্থে শিল্পের কারিগরি কারখানার ছাড়পত্র পাননি। তবু দিনের পর দিন তাঁরা মূর্তি গড়েন নির্ভুল প্রোপোরশন-এ, পট আঁকেন সাবলীল জীবন্ততায়। এটাকে আমি বলি, একটা সম্মিলিত ক্ষমতা এবং পরিবেশের গুণ। কুমোর পাড়ায় যে-ছেলেটা বড় হয়, তার জীবনটাই কাটে ঠাকুর গড়া দেখতে দেখতে এবং প্রবীণদের নানাভাবে সাহায্য করতে করতে—এবং ধীরে ধীরে সে নিজে হয়ে ওঠে মূর্তিকার।

এই হয়ে ওঠার মধ্যে কেউ কেউ উৎকৃষ্ট, কেউ বা আবার সাধারণভাবে পটু।

হুসেন তাঁর সহজাত শিল্পকে নিজের প্রতিভার পরশমণি দিয়ে এমন জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন, শিল্প-দক্ষতার সেই নমুনা সত্যিই ভারতবর্ষে বিরল।

ফলে যে কোনও কাজে অনস্বীকার্য ভাবে হুসেনের স্বাক্ষরটি ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। এবং এক স্বকীয় বিশিষ্টতায় বিভূষিত হল সবার কাছে।

শিল্প কোনও জাত, ধর্ম মানে না। এবং জাতশিল্পী হিসেবে হুসেনও মানতেন না। ফলে তাঁকে কম দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়নি মৌলবাদীদের হাতে। ফলে শেষ জীবনটা তাঁর কেটেছে নির্বাসনে।

হুসেনের ওপর নির্মিত কোনও একটা তথ্যচিত্র দেখেছিলাম বহুদিন আগে। একটা ইমেজ পরিষ্কার মনে আছে—কাঁধে ইজেলটা নিয়ে নগ্নপদ হুসেন উঠে আসছেন এক পাথুরে পর্বতঢাল বেয়ে। দেখে, ক্রুশ কাঁধে সেই প্রাচীন যুবকের কথাই মনে পড়েছিল অবধারিত ভাবে।

ইহজীবনে হুসেন ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন বারবার। সমালোচক, নিন্দুক, হিংস্র মৌলবাদী—সবার দ্বারা।

এখন মকবুল ফিদা হুসেন সমস্ত জাগতিক লাঞ্ছনার বাইরে কেবল এক পুণ্য শুভ্র-স্মৃতি। যেখান থেকে এক নতুন জীবন শুরু হয়। যে-জীবন মানুষ এবং শিল্পের জন্য উৎসর্গীকৃত।

১৯ জুন, ২০১১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পাগলু'-র পিতৃপুরুষ চলে গেলেন।

যাঁকে বাদ দিয়ে 'পাগলু' বা 'পরাণ যায় জ্বলিয়া রে' হওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি জিৎ গাঙ্গুলি নন, শ্রী ভেঙ্কটেশ ফিল্মস বা সুরিন্দর ফিল্মস নন। এমনকী আমাদের বাংলা সিনেমার আজকের 'হার্টথ্রব' দেব-ও নন।

তাঁর নাম শাম্মী কাপুর। যিনি না-থাকলে, ডান্সিং হিরোদের ভারতীয় পর্দায় আনাটাই অনেক অনিশ্চিত হত। আজকের গ্লোবালাইজেশন-এর যুগে এক উন্মুক্তদ্বার ভারতবর্ষে নানা মাধ্যমের ফাঁক-ফোকর দিয়ে নায়কদের উদ্দাম নাচ ঢুকে পড়াটা হয়তো তেমন দুষ্কর নয়। কিন্তু শাম্মী কাপুর যে-সময় সিনেমার পর্দায় গিটার নিয়ে নাচতে শুরু করলেন, সেই সময়টা সুনিশ্চিভাবে অন্যরকম ছিল।

ভারতবর্ষ তখন স্বাধীনতার শৈশবে। গান্ধী-নেহরু মূল্যবোধ ও সনাতন ভারতীয়ত্ব তখন স্বাধীন ভারতের বাল্য ব্রহ্মচর্য। সিনেমার পর্দাতেও তাই দিলীপকুমার, রাজ কাপুর, দেবানন্দ সেই সাহিত্যগন্ধী রোমান্টিসিজ্‌ম-এর প্রতীক। সিনেমা বলতে আমাদের সামনে একটাই মডেল—হলিউড। তার আলোকচিত্রের মদির আলোছায়া। নায়িকার মুখের diffusion?এর সঙ্গে মিশ্রিত হচ্ছে ভারতের সাহিত্য বা ইতিহাস-সম্ভার। 'মুঘল-ই-আজম' থেকে 'দেবদাস'। আবার রাজ কাপুরের হাতে পড়ে চির অবহেলিত চ্যাপলিন ট্র্যাম্পের ভারতীয়করণ।

দেবানন্দ তখনও যৌবনের প্রতীক হয়ে ওঠার চেষ্টায় মরিয়া নন, কারণ তিনি সত্যিই যুবক এবং সুদর্শন। ফলে রাজু 'গাইড'-এর যাত্রা যতটা না যৌবনোদীপ্ত, তার থেকে অনেক বেশি ট্র্যাজিক বিষণ্ণতায় মাখা।

হলিউড ছাড়া, আমাদের কোনও পথপ্রদর্শক নেই। অথচ মূলধারার সিনেমা তখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতি সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমে পশ্চিমকে যতটা পারা যায়, দূরে সরিয়ে রাখছে। তখনও নায়িকারা শাড়িই পরেন। আর খলনায়িকারা স্কার্ট। প্রাচ্য ভাল, প্রতীচ্য খারাপ—এই সরল সমীকরণ দিয়ে তখন দর্শক ভালমন্দের তাৎক্ষণিক বিচার করতে পারেন।

তারই মধ্যে হঠাৎ খোদ পশ্চিমি আইকন এল্‌ভিস প্রেস্‌লি-র নির্ভেজাল ভারতীয় প্রতিনিধি হয়ে এলেন শাম্মী কাপুর। চকমকে পোশাক, হাতে গিটার, রমণী পরিবেষ্টিত হয়ে আবির্ভূত হলেন শাম্মী কাপুর।

ভারতীয় দর্শক যেন এই উদ্দীপনার জন্যই উসখুস করছিল। নেহাত বড়রা বলে দিয়েছেন বলে সেই গোপন আক্ষেপ প্রকাশ করতে পারছিল না।

শাম্মী কাপুরের ছুঁচলো জুতোর প্রতিটি পদক্ষেপ দর্শককে শেখাল তাদের অন্তর্নিহিত যৌবনের সঙ্গে তাল মেলাতে—ভারতের ইতিহাস আর সাহিত্য সেই তিনঘণ্টার জন্য তাকে তোলা রইল।

আজকের সিনেমায় যৌবনের প্রাধান্যই দেখি আমরা। তার মধ্যে যৌবনের প্রগল্‌ভতা যতটা আছে, প্রাণ ততটা আছে কি না—ভরসা করে বলতে পারি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাম্মী কাপুর যখন পর্দায় আসেন যৌবনের প্রতীক হয়ে, তখন তিনি বয়ঃক্রম অনুসারে যৌবনের মধ্যভাগে—মোটেই বাইশ-তেইশ বছরের নন। কিন্তু সত্যিকারের যৌবন পর্দায় আনলেন তাঁর ঈষৎ পৃথুল চেহারা, আপেল-কোঁদা গাল, এবং একটা বেহিসেবি আনন্দ-তাণ্ডব দিয়ে।

আমরা দেবানন্দ-কে 'চিরযুবক' বলতে শিখেছি, কারণ তিনি তাঁর বয়স লুকিয়েছেন নানা কায়দায় বারবার—হাই কলার, পোলো-গলা, এবং মাফলার-এ।

শাম্মী কাপুর তাঁর বিশালকায় শরীর, রুদ্রাক্ষের মালা নিয়ে দিব্যি অসংকোচে ঘোরফেরা করলেন আমৃত্যু। আর, তাঁর অন্তরের যৌবন নিয়ে 'চিরযুবক' হয়ে থাকলেন যাবজ্জীবন।

জয় চিরযৌবনের।

২৮ আগস্ট, ২০১১

স্পেন যাওয়ার ব্যাপারে সব থেকে বেশি উৎসাহ ছিল রিঙ্কুদি-র (শর্মিলা ঠাকুর)। Hay Literary Festival, সাধারণত যেটা বিলেতেই হয়ে এসেছে এত বছর, তার আন্তর্জাতিক প্রসারণ ঘটছে নানা দেশে। শুনলাম, নভেম্বর মাসে ভারতের কেরলেও আসছে এই উৎসব।

এ বছর স্পেনের Hay Festival? এ মূল বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথ। আর ভারতবর্ষ থেকে আমন্ত্রিত ছিলাম আমরা তিনজন—শর্মিলা ঠাকুর, ইংরেজি ঔপন্যাসিক উপমন্যু চট্টোপাধ্যায় এবং আমি।

উপমন্যু-র সঙ্গে আমার আগে কোনও পরিচয় ছিল না। জানি না, রিঙ্কুদি দিল্লিবাসী, ফলে ওঁর সঙ্গে পরিচয় থাকলেও থাকতে পারে। তবু রিঙ্কুদি মাস তিনেক ধরে বিপুল উৎসাহে আমার সঙ্গেই দল পাকাচ্ছিলেন। তার মধ্যে আবার আমাদের দু'জনেরই বন্ধু সোহিনীকেও নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা চলছিল। সোহিনী বেচারা অধ্যাপক মানুষ—সারাবছর ওঁকে পৃথিবী ঘুরে এই ধরনের সাহিত্যসভায় যোগদান করতে হয়, ও যে রবাহুতের মতো আমাদের সঙ্গে কেবল দল-ভারী করার জন্য নাও যেতে চাইতে পারে, সে-কথা পাত্তাই দিলেন না রিঙ্কুদি। একটাই কথা—She must come। খুব মজা হবে।

রওনা দেওয়ার মাসখানেক আগে টাইগার সাবের অসুখটা বাড়ল—তারপর থেকে হাসপাতালে। এবং সেই সঙ্গে রিঙ্কুদি-ও। সব ফেলে রেখে টাইগারের শিয়রে বসে থাকা। হাসপাতালের ঘরে একটা বসার জায়গা ছিল। রিঙ্কুদি ছোটখাটো মানুষ। তাতেই গুটিয়ে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিতেন। বড়মেয়ে সাবা আসা-যাওয়া করত বাড়ি থেকে। একমাত্র সোহা যখন সময় করে মুম্বই থেকে দিল্লি আসতে পারত, পিতার প্রহরার কাজটা ওর 'আম্মা'র হাত থেকে কেড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিত স্বেচ্ছায়। রিঙ্কুদি-কে জোর করে বাড়ি পাঠানো হত—একটু ভাল করে স্নান আর ঘুমনোর জন্য।

প্রায় তিন সপ্তাহ, বা আরও অল্প বেশি হবে, এই লড়াইটা চলল। পুরো পরিবার প্রায় বুঝতে পারছে যে, এ যাত্রা টাইগার আর বাড়ি ফিরবেন না। সবার আগে এটা বুঝতে পেরে মেনে নিয়েছিলেন রিঙ্কুদি। তবু অতন্দ্র শিয়র-জাগরণের নিয়ম থেকে বিচ্যুত হননি শেষ মুহূর্ত অবধি।

২১ সেপ্টেম্বর সন্ধে ছ'টা থেকে টাইগারকে ধীরে-ধীরে sedation দেওয়া শুরু হল। এবার শুধু মুহূর্ত গোনার পালা। রাত্রের দিকে সোহিনীকে SMS করলেন রিঙ্কুদি—মনে হচ্ছে আজই ও চলে যাবে।

তা হল না। ফুসফুসটা বিকল হয়েছিল বটে, কিন্তু টাইগারের হৃদযন্ত্রটি সরলভাবে কাজ করে চলেছিল। ফলে অন্তিম শ্বাস পড়ল প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার মাথায়। পরের দিন বিকেল পাঁচটায়। সেটা সেপ্টেম্বরের ২২ তারিখ।

আর আমার স্পেন রওনা হওয়ার কথা ২৩শে। রিঙ্কুদি আর সোহার সঙ্গে ফোনে বার্তালাপ হল কিছু-কিছু। তারপর বাক্স-প্যাঁটরা গুছিয়ে গুটি-গুটি রওনা দিলাম দমদম এয়ারপোর্টের দিকে।

আর দিল্লিতে পড়ে রইল আমার যাত্রাসঙ্গিনী। তিন সপ্তাহ গঙ্গারাম হাসপাতালে কাটিয়ে অবশেষে 'বসন্ত-কুঞ্জ'-এ নিজের বাড়ির শূন্য বিছানায়।

দমদম থেকে Emirates-এর প্লেন ছাড়ল রাত আটটায়। একটা বড় stop-over রয়েছে দুবাইতে। প্রায় সাড়ে সাত ঘণ্টার মতো। দুবাইতে নামার কথা রাত সাড়ে বারোটায়। আবার প্লেন ছাড়বে সকাল সাতটা পঞ্চাশে। তারপর সিধে মাদ্রিদ।

এই নিশিযাপনকারী যাত্রীদের জন্য, Emirates-এর সঙ্গে একটা নামী হোটেলের বন্দোবস্ত আছে। অন্তত আরামে রাতটুকু কাটানো যায়।

সেদিকেই রওনা দিয়েছি। Emirates-এর এক কর্মচারী আমার সঙ্গে চলেছেন। এই মধ্যরাত্রেও দুবাই এয়ারপোর্ট-এর সব Duty free দোকান খোলা। যেন আলোঝলমলে এক উৎসব প্রাঙ্গন।

সেখানেই হঠাৎ একটা দোকানে দেখলাম বোরখা, prayer mat ইত্যাদি—মুসলিম ধর্ম-সাংস্কৃতিক নানা উপকরণ। জানি না, কখন যেন আমারই অজান্তে আমার ভিতর থেকে একটা আমি বেরিয়ে দুবাইয়ের Duty-free দোকানের সেই prayer mat?-এ গিয়ে নতজানু হয়ে বসল। মুদ্রিত নয়নে প্রার্থনা করল টাইগারের আত্মার শান্তি। আর মনে-মনে দর্শন করতে চাইল রিঙ্কুদি-র বেদনাতুর অন্তর।

২৩ অক্টবর, ২০১১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন আমি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য বিদেশে। নিয়মিত কলকাতার দৈনন্দিনের সঙ্গে যোগাযোগ নেই।

অনুজপ্রতিম চলচ্চিত্রকার অতনুর (ঘোষ) একটা এসএমএস পৌঁছল অতর্কিতে। আর আমার মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে রইল বাকি বিদেশযাপনের সময়টুকু জুড়ে।

অভিনেতা সুনীল মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হয়েছেন।

সুনীলদা আমার প্রথম ছবির প্রায় প্রধান চরিত্র। তাঁর মৃত্যুর খবরটা পাওয়ার পর, যেন আমার চলচ্চিত্র জীবনের সমস্ত শৈশবস্মৃতি হুড়হুড় করে এসে আমায় ক্রমাগত নানা মেদুর বৃষ্টিধারায় ভেজাতে রইল।

'হীরের আংটি'-র যখন চিত্রনাট্য লিখছি, তখন বড় সাধ ছিল সুনীল মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে কাজ করব।

এর আগে 'নিম অন্নপূর্ণা', 'ফেরা', 'গৃহযুদ্ধ', 'পার' দেখে আমি মনে-মনে সুনীলদাকে বাংলা ছবির শ্রেষ্ঠ অভিনেতার খেতাবটুকু দিয়ে ফেলেছি। আজ আমার ধারণা ও বিশ্বাস সেখান থেকে বড়জোর অল্প সরতে পারে, কিন্তু সেদিনের সেই তরুণ—বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতার সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতার সূত্রে উপলব্ধি করেছে, ছোটবেলায় যেটা সে ভাবত সেটা পুরোপুরি ভুল নয়।

সুনীলদার শক্তি ছিল সেটা দর্শকদের মনে করিয়ে দিতে হবে না। হয়তো যে-বৈশিষ্ট্যটা তাঁর খামতি ছিল, সেটা হচ্ছে চেহারা। এবং তাঁদের নির্ধারিত অগণিত কাস্টিং।

রবি ঘোষ, চিন্ময় রায়—এঁদের স্বর্ণমণ্ডিত প্রতিভাকে যেমন আমরা কৌতুকাভিনেতাতেই আটকে রাখলাম, সুনীলদার ক্ষেত্রেও সেই অবিচার অনেকটা হয়েছে। হয় গরিব না-খেতে-পাওয়া মানুষ, বা, এক ধরনের প্যাংলা ভাঁড়—সুনীলদার প্রতিভার একটা সংক্ষিপ্ত দিগ্বলয় এইভাবেই রচিত হয়েছিল।

তারপর একদিন, কাজ না পেতে-পেতে, কাজ না করতে-করতে সুনীলদা কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

সুনীলদা অনর্গল হাসাতে পারত। কৌতুকাভিনেতাদের এই গুণটুকু বোধহয় আয়ত্ত করে নিতে হয়।

'হীরের আংটি'-র শুটিং-এর সময় আমি নেহাতই তরুণ, আর সুনীলদা যেন অনর্গল কৌতুকের বাতাবরণের মধ্যিখানেতে আমার টালিগঞ্জের প্রথম অভিভাবক—পটলডাঙার টেনিদা কে যেন প্রত্যক্ষ করছে প্যালারাম।

জানি, সুনীলদার শেষ কয়েক বছর বড় অভাবে ও বিষাদে কেটেছে। তবু, সেই আনন্দধারার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বতঃস্ফূর্ত সম্রাটের আত্মার জন্য চিরহাস্যময় আনন্দ কামনা করতে বড় সাধ হয়।

ভাল থেকো সুনীলদা।

১০ জুন, ২০১২

তখনকার বলিউড-এ নায়ক মাত্রেই সুদর্শন আর্যপুত্র। দীর্ঘাবয়ব, বলিষ্ঠ দেহ, গৌরবর্ণ, উন্নতনাসা—উত্তর ভারতীয় রূপবানরা নিজেদের মধ্যেই সাম্রাজ্য-বদল করছেন দর্শকানুকূল্য অনুযায়ী। আর বলিউড-এর অন্দরমহলের অধিশ্বরীরা, হয় লাবণ্য-ঢলঢল বঙ্গললনা, কিংবা নৃত্যপটিয়সী দক্ষিণী-নায়িকা।

তারই মধ্যে প্রায় সকলের অলক্ষ্যে প্রবেশ করলেন এক সাধারণ-দর্শন যুবক। তাঁর উচ্চতায় বা গঠনে বীরত্ব নেই, মুখসৌষ্ঠব বলতে চাপা নাক, ছোট চোখ, ক্যামেরার বাইরে আলাদা করে আকর্ষণীয় নন কোনও বিচারেই।

এসব প্রতিবন্ধকতা নিয়েই রাজত্ব করেছেন রাজেশ খান্না। তখনকার দিনে কস্‌মেটিক সার্জারি তো দূরস্থান, সুস্থ সবল পৌরুষের জন্য নিত্য জিম-চর্চার প্রচলনও শুরু হয়নি। ফলে বিধাতাদত্ত রূপ বা রূপহীনতার কোনও কিছুই বদলে ফেলতে পারেননি রাজেশ খান্না। শুধু বদলেছিলেন পিতৃদত্ত নামটুকু। অমৃতসরের যতীন খান্নাকে চিরতরে বিদায় দিয়ে বলিউডে পা রাখলেন রাজেশ খান্না।

এবং অকস্মাৎ তৎকালীন নায়কের সমস্ত সংজ্ঞাকে বিলুপ্ত করে কেমন করে যেন প্রধান হয়ে উঠলেন বলিউড সাম্রাজ্যে; যে প্রাধান্যের আকাশচুম্বী রহস্য তখনকার চন্দ্রপৃষ্ঠে মনুষ্যাবতরণের চেয়েও গাঢ় ও পরিব্যাপ্ত।

আর, সেই সঙ্গে শুরু হল বলিউডে এক অন্য নায়কের ইতিহাস। যেখানে রূপ, প্রবাদপ্রতিম পৌরুষ, দৃঢ়স্কন্ধ আর্যরক্তের মহিমাকীর্তনের প্রয়োজন নেই। যেন নিজের হাতে উত্তরকালের সেই অন্য 'তথাকথিত সুদর্শন' নন—এমন নায়কদের কানে-কানে ফিসফিস করে উচ্চারণ করলেন সাফল্যের সংকেত। বলিউড-এর নিরীক্ষা-প্রাচীর আর আটকাতে পারল না সাধারণ-দর্শন অমিতাভ বচ্চন, মিঠুন চক্রবর্তী, শাহরুখ এবং আমির খানদের।

রাজের খান্নার আবির্ভাব ঘটেছিল এক অদ্ভুত সময়সন্ধিতে।

তখন নকশালবাড়ি আন্দোলন, তরুণ-রক্তে লোহিত হচ্ছে এই বাংলার মাটি এবং প্রায় কাছাকাছি সময়েই ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধরত হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তি কামনায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আসা পুলিশের গুলির আওয়াজ, বোমার শব্দ, এবং যুদ্ধকালীন নিরাপত্তার কৃষ্ণসন্ধ্যাগুলির প্রেমহীনতার মধ্যে বোধহয় মানুষ খুঁজছেন কোনও প্রেমের জ্যোতিষ্ককে। রাজেশ খান্না ক্ষণিকের জন্য হলেও মানুষকে মুক্তি দিলেন সেই দমবন্ধ করা হিংসার অন্ধকার থেকে। অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহের পর্দায় ভাসমান হয়ে উঠলেন এক প্রেমের অবতার রূপে। ঠিক যেরকম ভাবে ভারতের জরুরি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উত্থান হয়েছিল এক তীব্র বিদ্রোহীসত্তার, যা আকার পেয়েছিল অমিতাভ বচ্চনে। বা, বাবরি মসজিদ দুর্ঘটনার পর প্রায় জাতীয় হৃৎস্পন্দন হয়ে উঠলেন শাহরুখ খান। তখন আমাদের দেশে Liberization-এর প্রথম পদার্পণ। এবং শাহরুখ খান সেই Consumerist ভারতীয়র অমোঘ প্রতীক হয়ে উঠলেন 'রাজু বন গয়া জেন্টলম্যান'-এ।

রাজেশ খান্নাকে তেমন কোনও সামাজিক সত্য গ্রাস করেনি। এবং নিখাদ রোমান্স তখনও বিদায় গ্রহণ করেনি, বা আত্মগোপন করেনি সামাজিক অস্বাচ্ছন্দ্যের প্রেক্ষাপটে।

রাজেশ খান্নার প্রথম সুপারহিট ছবি 'আরাধনা'। তাতে তিনি অভিনয় করেন বিমানচালক অরুণের ভূমিকায়, ছবির মধ্যবিরতির আগেই যাঁর অকালমৃত্যু হয় বিমান-দুর্ঘটনায়।

যে-নায়ক প্রায় তখনকার সমস্ত সামরিক শহিদের প্রতীক হয়ে যাচ্ছেন, এবং ছবির বাকিটা জুড়ে হয়তো বা আমাদের দেখতে হবে তাঁর বিধবা জীবনসঙ্গিনীর বন্দনা-র (শর্মিলা ঠাকুর) বিরহ, ঠিক যেন তখনই দ্বিতীয়ার্ধে পুনরাবির্ভূত হন রাজেশ খান্না—মৃত পিতার পুত্ররূপে, এক অমৃতময় যৌবনের প্রতীক হয়ে।

এই যেন শুরু হল রাজেশ খান্না নামক ফিনিক্স পাখির পুনরুত্থানের ইতিহাস।

'আনন্দ' ছবিটিকে দৃষ্টান্ত ধরলে তারপর ক্রমানুসারে নানা ছবি জুড়ে আমরা দেখেছি তাঁর মৃত্যু-অভিসার। এবং বারবার সেই অভিসার শেষে আরও অনেক বেশি হৃদয়হরণ হয়ে ফিরে এসেছেন মৃত্যুঞ্জয়ী রাজেশ খান্না।

ভাবতে একটু অবাক লাগে যে, গত বিশ বছর ধরে রিপ ভ্যান উইঙ্কল-এর মতো যিনি নিদ্রিত ছিলেন জনচেতনায়, হঠাৎ করে তাঁর তিরোধানে, মুম্বইয়ের আঝোর বৃষ্টি উপেক্ষা করে কেন সমবেত হলেন এই এত মানুষ?

এবার তা হলে একটু পিছনে ফিরতে হয়।

২৯ জুলাই, ২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিরাজ

হঠাৎ-ই ফোন এর অপুর কাছ থেকে। অপু, মানে অপু দে। দে'জ পাবলিশিং-এর কার্যনির্বাহী কর্ণধার।

সুধাংশুবাবুকে আমরা তেমন করে পাইনি। আমাদের কাছে দে'জ বলতে অপু-ই।

অপুই দিল খবরটা।

—সিরাজদা চলে গেলেন ঋতুদা!

সত্যি, আকাশ থেকে পড়ার মতো অবস্থা।

চলে গেলেন? এই সাতদিন আগে অপু আর আমি প্ল্যান করেছি সিরাজদা'র বাড়ি যাব। দেখা করব, কতগুলো আর্জিও ছিল।

ভীষণ ইচ্ছে ছিল সিরাজদা'কে দিয়ে 'রোববার'-এ ধারাবাহিক একটা স্মৃতিচারণ লেখানোর। সিরাজদার পুত্র অভিজিৎ আমাদের সহকর্মী। ওঁকে দিয়েই প্রাথমিক প্রস্তাব পাঠানো। অভিজিৎ বলেই দিয়েছিলেন—বাবার যা শরীরের অবস্থা, মনে হয় না পেরে উঠবেন।

সত্যিই পেরে ওঠেননি সিরাজদা। আমরা অমনিখনের প্রস্তাব অবধি দিয়েছিলাম —রাজি হননি।

তবে, সেই অবকাশে, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সঙ্গে একটা টেলিফোনিক সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল আমার।

একবার 'জোকার' (ক্লাউন) নিয়ে একটা সংখ্যা (২০ ডিসেম্বর, ২০০৯) হয়েছিল 'রোববার'-এ। মনে আছে, 'ফার্স্ট পার্সন'-এ আমি উলু দেওয়াকেও যে 'জোকার' বলা হয় পূর্ববঙ্গে—সেকথার উল্লেখ করেছিলাম। সঙ্গে এটাও লিখেছিলাম যে, কী করে এই শব্দ দু'টো সমার্থক হল, সেটা আমি জানি না।

নির্দিষ্ট রোববারে সংখ্যাটা বেরল। পরের দিন সকালবেলা দপ্তরে গিয়ে পৌঁছতেই মোবাইলে একটা ফোন।

পর্দায় নাম দেখলাম সিরাজদা। কথোপকথনটা হল কিন্তু পুরোটাই 'জোকার' নিয়ে।

বিশেষ করে 'জোকার' কেন হুলুধ্বনির সমশব্দ।

সিরাজদা প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দিলেন—

'জোকার' শব্দটি আসলে 'জয়জয়কার'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। আগেকার দিনের মহিলাদের অন্দর-অভ্যর্থনার 'জয়জয়কার' ঘোষণার অভিব্যক্তি ছিল হুলুধ্বনি, সংক্ষিপ্তভাবে 'জোকার'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই 'মানে'-টা জানার কয়েক বছরের মধ্যেই অজস্র বাঙালি পাঠকের অন্তঃস্থিত জয়জয়কারের শুভেচ্ছা নিয়ে এক অমর্ত্যলোকে চলে গেলেন সিরাজদা।

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১২

অস্কার ওয়াইল্ড না কি একবার বলেছিলেন, I scorn to look at the map that does not include Eutopia.

ভারতবর্ষের মানচিত্র আতিপাতি খানা-তল্লাশি করেও একটা জায়গার নাম খুঁজে পাইনি কখনও। দিকশূন্যপুর।

আরেকটু বড় যখন হলাম, তখন বুঝলাম, সেই নিষিদ্ধ ঠিকানায় কেবল নীললোহিতের সঙ্গেই গিয়ে পৌঁছনো যায়।

পুজোর ছুটিতে ক্লাসের কত বন্ধু বেড়াতে যায় কত নতুন-নতুন জায়গায়। পাহাড়, জঙ্গল, ঝরনার দেশে। কখনও-বা তুষারশৃঙ্গের কাছে। কিংবা সমুদ্রের ধারে। প্রতি পুজোয় নতুন জুতোর মতো নতুন আবিষ্কার।

আর, আমার পুজোর বেড়ানো—হয় এই কলকাতার পথে-পথে, নয় দিকশূন্যপুরে। তাও নীললোহিতের পিছু-পিছু।

খুব ইচ্ছে করে, চলার পথে একবার তার হাতটা ধরি। অমনি ভয় করে, সংকোচ হয়।

নীললোহিতের এক বন্ধু, যত দূর মনে পড়ছে নাম রফিক, একবার বলেছিল, কোনও অচেনা পুরুষের গায়ের গন্ধই সে সহ্য করতে পারে না। তাও জোরে-জোরে বলেছিল—মনে-মনে নয়।

নীললোহিত অতটা নিষ্ঠুর হবে মনে হয় না। কিন্তু, ভয় তো একটা আছেই। আমার এই পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি শরীরের আপাদমস্তক জুড়ে নারীগন্ধ আনব কোথা থেকে? আমার সঙ্গে কি আর পরাশর মুনির দেখা হবে কোনও দিন? আর হলেই বা কী? তিনিও তো কেবল মেয়েদেরই বর দেন!

রফিক থেকে পরাশর মুনি সবাইকেই বড় নিষ্ঠুর লাগে আমার। যেন মেয়ে ছাড়া আর কাউকে ভাল লাগাটা পাপ!

নীললোহিত অতটা ছোট মনের নয়। এবং ভাগ্যিস আমাকে এটা কখনও সাম্বনার ছলে বোঝানোরও চেষ্টা করেনি যে, রফিক আর পরাশর মুনিদের সংখ্যাই বেশি। নইলে আমার বাকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনটার মধ্যে যে একটা শাপমোচনের গল্প আছে, সেটা হয়তো নিজের মতো করে আবিষ্কার করাই হয়ে উঠত না আমার!

নীললোহিত সুন্দরী মেয়েদের পছন্দ করে। ভাগ্যি ভাল, তারাও সবাই নীললোহিত-কে অতটা পছন্দ করে না। অন্তত, আমার তো সেরকমটাই ভাবতে ভাল লাগে।

এতদিনে আমি জেনে গিয়েছি যে, নীললোহিত আমার সঙ্গে একান্তে যত গল্পই করুক না কেন, হঠাৎ বন্দনাদির মতো কোনও সুন্দরী মহিলার কথা মনে পড়লে, আমায় কিচ্ছুটি না-বলে ধাঁ করে সামনের বাসটায় উঠে চলে যাবে গল্পের মাঝপথে।

নীললোহিত ভাবতেই পারে না যে, সুন্দরী মহিলারাও দাঁত মাজে। আমার যেমন বেড়াল দেখলে ভয় করে, নীললোহিতের ঠিক তেমনই আতঙ্ক যে, ও যদি ভুলবশত ওর কোনও সুন্দরী বান্ধবীকে দাঁতন হাতে দেখে ফ্যালে।

ততদিনে আমার সহপাঠীরা আরেকটু বড় হয়েছে। শুধু পুরুষদের জগৎ তাদের আর টানে না। তারা এখন সবাই মিলে 'নীরা' বলে একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছে।

কিন্তু যেভাবে অন্য মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করা যায়—ভালবাসার গোপন চিঠি লিখে, কিংবা কোনও তুতো বোনের মাধ্যমে, নীরা-র সঙ্গে তেমন ভাব জমানোর উপায় নেই।

নীরার ঠিকানা জানে একটাই মানুষ—সে আবার নীরার পাগল এক কবি-প্রেমিক। কিন্তু নীরার জন্য তার যত আকুলিবিকুলি সেটা কেমন যেন অপ্রাপ্তির মনে হয়। সে যত ভালবাসে অকূলসমুদ্দুর, নীরার পাল্টা-ভালবাসা মোটেই তত গভীর নয়। সে কেবল প্রেমিকের কবিতা পড়েই খুশি। ভালবাসার মানুষ যদি কবি হয়, তবে তাকে ঘিরে কোনটা বেশি হয়, প্রেম না জ্বালা, নীরা বোধকরি সেই সংশয়েই আছে।

যে-নারী অন্য কারও সঙ্গে প্রণয়াবদ্ধ নয়, তাকে চাওয়ার অধিকার যে কোনও পুরুষেরই যেন আছে বলে ভাবে আমার বন্ধুরা। ওই 'হেলেন অফ ট্রয়' দেখে- দেখেই—ওরা পেগলে গেল। আরে বাবা, প্যারিস তো তাকে জোর করে তুলে আনেনি। তাতে তো হেলেন-এরও সায় ছিল।

ওরা কেন ধরে নিচ্ছে যে, ওদের বেলায় নীরাও অমন উদার সম্মতি দেবে?

একদিক দিয়ে বেঁচে গিয়েছি। আমি নীললোহিত-কে বিয়ে করতে চাই না। সব ইচ্ছেরই তো একটা পারা, না-পারা থাকে।

ওরা ভাবে, একটু কাঠখড় পোড়ালেই নীরাকে ওরা বিয়ে করতে পারে? যত উজবুকের দল।

ওরা কেন বোঝে না, মেয়ে-পুরুষ হলেই বিয়ে হয় না?

বনলতা সেনকে নিয়ে বাবার কি কম ব্যথা ছিল? তাই বলে কি আমার মামাবাড়ি নাটোরে?

স্কুল শেষ হয়ে গেল সকালের রোদের মতো। তারপর ছায়াঘন দুপুর জুড়ে যাদবপুর-বেলা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্ধুবান্ধবরা ছিটকে কে কোথায় চলে গেল। কেবল সখ্য ভাঙল না কলকাতা শহর। সে-ই যেন আগলে রাখল আমার বিকেলের রং-ধরা পড়ন্ত দিন।

পুজোর সময় ঠাকুর দেখা হয় না। পুজোর সময় নতুন জামা হয় না। পুজোর সময় পুজোসংখ্যাও নিয়ম করে পড়া হয় না।

নীললোহিত এখন সারা বছর পাওয়া যায়। যেমন, স্পেন্সার্সে গরমকালেও পাওয়া যায় শীতের ফুলকপি, কড়াইশুঁটি, বিট, গাজর।

নীললোহিত আর আমার গল্পগুলো এখন বই হয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। নীললোহিত একটা কথা রেখেছে। এতগুলো চন্দ্রভুক অমাবস্যা পার করেও বুড়ো হয়নি ও।

কিন্তু আমি তো একই অঙ্গীকার করিনি ওর কাছে। তাই আমি এখন বয়সের পর্দাগুলো আস্তে-আস্তে টেনে দিচ্ছি পৃথিবীর জানলার বুকে। বাইরের চেঁচামেচি, ধুলোবালি আগে যেমন হইহই করে ঢুকে আসত আমার ঘরে, তারা এখন অনেক সংযত।

দিকশূন্যপুরের কথা মনে পড়ে। কত রাত তারার আকাশের তলায় পাথুরে মাটির ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি নীললোহিতের সঙ্গে। ঘুম না-আসার ভয় কাকে বলে, তাই জানতুম না মোটে।

এখন ঘুমের ওষুধ ফুরিয়ে এলেই কেমন যেন ভয় করে। বেশি করে আনিয়ে রাখি। যদি পুজোর ক'দিন ওষুধের দোকান বন্ধ থাকে।

বাড়ির পাশের পুজো। ঘুমপাড়ানি কাঠির ছোঁয়ায় ঢাক, ঢোল, সন্ধ্যারতি, মাইকের গান, উৎসবের কলরব—আর কিছুই বুঝতে পারি না। কত লোকে জগজ্জননীর কাছে কত কী চায়! আমি চাই শুধু প্রতি রাতের নিশ্ছিদ্র মৃত্যু।

তাই বুঝি অঘোরে ঘুমোই অমন? নীললোহিত যে এসেছে বিদায় নিতে, টেরও পাই না কেন?

অষ্টমীর রাতে, যখন সন্ধিপুজোর একশো আট-টা প্রদীপের ছটা পিছলে যায় গর্জন তেলের মুখখানির ওপর, আমার জানলার কোন পর্দা একটুখানি ফাঁক করে পালিয়ে যায় নীললোহিত!

আমি কিচ্ছু টের পাই না। সকাল হয়। আলো পড়ে রবি ঠাকুরের ছবিতে। রবি ঠাকুর সব জানে। সাধে কি আর মুনি-ঋষিদের ত্রিকালদর্শী বলে?

রবি ঠাকুর জানে, বোঝে, শেখায়, গান গায়—

সে যে পাশে এসে বসেছিল, তবু জাগিনি।

কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী।।

১১ নভেম্বর ২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু দিন হল অভিনেতা হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।

হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় গোটা টালিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রি-র কাছেই ছিলেন 'হারাধনদা'। কেবল কয়েকজন অভিনেতা, যাঁরা তাঁর পুত্র কৌশিকের প্রিয় বন্ধু, তাঁরাই হারাধনবাবুকে 'হারাধন জেঠু-কাকু' ইত্যাদি বলে ডাকতেন।

যদিও হারাধনদা'কে 'দাদু' হিসেবেই সবথেকে মানায়। কেন জানি না, টালিগঞ্জের কনিষ্ঠতম শিল্পীদেরও তাঁকে কখনও 'দাদু' বলে ডাকতে শুনিনি।

অত প্রবীণ একজন অভিনেতা, 'বরযাত্রী' থেকে যাঁর তুমুল জনপ্রিয়তা বাঙালি দর্শক-মনে; এবং পরবর্তী কালে কলকাতার বিশিষ্ট পরিচালকদের প্রায় সবার কাছেই হারাধনদা'র কাস্টিং কখনও-না-কখনও অপরিহার্য হয়েছে।

আমাদের প্রায় আশ্চর্য লাগত যে, সত্যজিতের যুগ থেকে পরে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, অপর্ণা সেন, গৌতম ঘোষ, শেখর দাশ, আমি-আমরা প্রত্যেকেই কোনও-না-কোনও সময়ে দ্বারস্থ হয়েছি হারাধনদা'র কাছে।

আমি আক্ষরিক অর্থে বোধহয় এই পরিচালক তালিকার শেষে ছিলাম।

'খেলা' ছবিতে বাড়ি থেকে পালানো কিশোরের দাদু-র চরিত্রে হারাধনদা অভিনয় করতে এলেন। সে এক বড় মধুর অভিজ্ঞতা।

পরিচালক হিসেবে যাঁদের নাম করলাম, তাঁদের মূলধারার টালিগঞ্জের প্রতিনিধি বলা চলে না সেভাবে। ফলে, এই বৃত্তের বাইরেও, হারাধনদার অগাধ এবং সাবলীল বিচরণ ছিল।

হারাধনদা চলে যাওয়ার পর, তাঁকে প্রধানত সত্যজিৎ রায়ের অভিনেতা বলেই সংবাদমাধ্যম অভিহিত করল। সত্যজিৎ রায় নিঃসন্দেহে বাংলা সিনেমার ঈশ্বর, তাঁর নিকট-সান্নিধ্যের অভিনেতাও নিশ্চয়ই কিছুটা মাহাত্ম্য উপভোগ করেন।

কিন্তু হারাধনদা কেবল সত্যজিৎ-এ সীমাবদ্ধ নন। ফলে বিদেশিরা যে-বাংলা ছবিগুলো দেখেছেন এবং বাহবা দিয়েছেন, কেবল সেটা দিয়েই হারাধনদা'কে মাপা যায় না।

হারাধনদা পরম হাস্যোজ্জ্বল মানুষ ছিলেন। আমরা তাঁর সেই উদ্ভাসিত অভিব্যক্তি-ই মনে রেখে দিলাম।

২০ জানুয়ারি, ২০১৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~